ফুলবউ

আবুল বাশার

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

আমার লেখকতাজীবনের অভিভাবক
অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী
শ্রীচরণেষু

ফুলবউ

জীবনের কতকগুলি অশ্লীল ঘটনার মোকাবিলা করছিল মিল্লাত। আপাতত যে-ঘটনার সামনে তাকে দেখা যাচ্ছে, তার পেছনের মূল ঘটনা তার সম্পূর্ণ চেনা ছিল না। মিল্লাত চিনতে চায়নি। মিল্লাত পালাতে চেয়েছিল। এই শহরে চলে এসে, সীতাহাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পেরেছে ভেবে সে ক্রমশ সুখী হয়ে উঠছিল। বাপ-মা ছেড়ে, ভাইবোনদের দূরে সরিয়ে সে চেয়েছিল নিজস্ব সভ্যতা। জীবন যাপনের জন্য আলাদা বাসভূমি। কিন্তু তার আয়োজনের মধ্যে মস্ত গলদ থেকে গিয়েছিল।

এই বাড়ি ছিল পৈতৃক। এবং সে শুনেছিল, এ-বাড়ি বাবা তাকেই দিয়ে যাবেন, বাপের মৃত্যুর আগে অবধি এই প্রতিশ্রুতি কখনও চিড় খেতে পারে বা সেই অঙ্গীকার মিথ্যা স্তোক মাত্র, ভাবতে পারেনি। এটা কেন সে ভাবতে পারেনি, কেন যে বাপের সদিচ্ছার উপর সংশয় জাগেনি, ভেবে আকুল হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ পিতা আপন জীবনকে যত প্রকার লাঞ্ছিত এবং বিড়ম্বিত করেছেন, তার অনুপুঙ্খ খবর মিল্লাত সহ্য করতে পারেনি বলেই, তার একধারা নিস্পৃহতা ছিল। ফলে আজ তাকে শুনতে হল, এ-বাড়ি তার নয়। ভাইবোনদের অন্য কারো নয়। এ-বাড়ির দলিল হয়েছে এমন একজনের নামে যাকে সে চোখেও দেখেনি। চোখে দেখার কোন সহিষ্ণুতা তার ছিল না। বাপের চার বিয়ে। যখন বাপ চার বারের বেলা সুন্নৎ পুরা করবার জন্য পাগলামি শুরু করলেন, বৈদ্যবাটির এক শিক্ষিতা মেয়েকে টোপে গাঁথতে চেয়েছেন বলে খবর রাষ্ট্র হল, মাবুদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন পিতা, তখনই চিরকালের মতন সীতাহাটি ছেড়ে এল মিল্লাত। বাপ সকলের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। মিল্লাত নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে চলে এসেছে, এমন নয়। নিজেকে সব অশ্লীল ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। অতীতের অসহ্য বিবাহের ঘটনা আজ মিল্লাতকে খুঁজে বার করে ছোঁ মারল। ছুঁয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখ, কেমন ছুঁয়ে দিলাম। মিল্লাতের গা ঘৃণায় শিরশির করে উঠল।

ছোঁ মারল। বা ছুঁয়ে দিল। এটুকু বললে ঘটনা ফুরায় না। বলা ভাল, গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিতে চাইল। মাঠান সম্পত্তির ভাগ সে চায়নি ভাইয়েদের কাছে। নিজের ভাইবোন বা সৎ ভাইবোন·সকলেই আকারে প্রকারে বুঝে গিয়েছিল, তাদের সংসারের একমাত্র লেখাপড়া জানা সত্যিকার সজ্জন মিল্লাত অন্যরকম জীবনের স্বপ্ন দেখেছে গোড়া অবধি। বরাবর। মাঠের সম্পত্তির উপর লোভ নেই। মুখ ফুটে না চাইলেও, শহরের বাড়িখানাই তার নামে দলিল হোক, এইরকম নিঃশব্দ ইঙ্গিত কোথায় যেন আচরণের মধ্যে ফুটে ওঠে। বাপও সেকথা অনুধাবন করে তাকেই শহরের বাড়িখানা লিখে দেবার কথা স্ব-কণ্ঠে গোড়া থেকেই ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চারবারের বার নিকাহের স্বেচ্ছাযাপিত ঘোরের মধ্যে পড়ে নিশ্চয়ই বৃদ্ধের মুণ্ডু ঘুরে গেছে। চতুর্থ বউয়ের দেনমোহর স্বরূপ এই বাড়ি রাজিয়া নাম্নী এক ষোড়শীর দলিলে গোপনে যে রেজিস্টারি হয়ে চলে গেছে সীতাহাটির কাক-পক্ষীও জানতে পারেনি। এই ঘটনা কি অশ্লীল নয় ? যদি তা না-ই হয়, তবে সেই বউকে সে যে কখনও চোখের সামনে দেখতে চায়নি, সহ্য করতে চায়নি, গত পরশু থেকে সকাল বিকাল চব্বিশ ঘণ্টা চোখের ওপরই নড়েচড়ে বেড়াতে দেখছে এবং দেখবে উনিশ কুড়ি কি একুশ বছরের এক বিধবা এই বাড়ির মালকিন। এবং সেই কচি তরুণীর দয়ায় এই বাড়িরই পশ্চিম কোণের ছোট্ট ঘরখানিতে কোণ-ঠাসা হয়ে থেকে আশ্রিতের মতন জীবনকে প্রতি মুহূর্তে অপমান করে যেতে হবে, যদ্দিন না একটা চাকুরি জোটে, কিংবা শহরের অন্যত্র ঘরভাড়া পাওয়া যায়। তবে, সত্যিই এই ঘটনা অশ্লীল হয়ে উঠবে নিতান্তই। নির্ঘাত।

মিল্লাত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বারবার এই নিশ্ছিদ্র অশ্লীল ঘটনার চৌবাচ্চা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিল। কিন্তু সদ্য সেই পথ নিরেট পাষাণে বন্দী। কোথাও সামান্য ছিদ্রও চোখে পড়ে না। চাকুরি কোন বাচ্চার হাতের মোয়া নয়। বাড়িভাড়া পাওয়া লাকট্রাই করার চরকি কম্পাসের খেলা মাত্র। কাঁটা কখন ছুঁয়ে দাঁড়াবে, তারই প্রতীক্ষা। মিল্লাত রাত্রি ৯টার দিকে ঘরে ফিরল। তাবত দিন একখানা বাড়ির, ছোট এককোণা ঘরের তল্লাশ করে ফিরেছে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে শরীর মন সবই। কোথাও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। তার খানিকটা ভদ্রস্থ ঘর চাই। না হলে শহরের ভদ্র পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা নাক কুঁচকে অন্য টিউটরের দরজায় হানা দেবে। টিউশানী করে সম্পূর্ণ পেটের ভাত, পরনের পোশাক পরিচ্ছদ জোগাড় করার হাঙ্গামা বিস্তর। এই ভোগান্তির

কথা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়নি। এই বাড়ির নিচের তলা পুরোটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অফিসের বাবুদের। বেছে বেছে ব্যাচেলর ছেলেগুলোকে সংগ্রহ করেছে। এবং কথা আছে, কেউ বিয়ে করলে অন্যত্র ঘর দেখে নেবে। বিবাহিতকে ভাড়াটে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এবং বারবার ভাড়াটে বদল হলে, ভাড়া বাড়ানোরও সুবিধা। অবিশ্যি ব্যতিক্রম নন্দকিশোর। তিনি বিবাহিত। বউ থাকে দেশের বাড়িতে। তিনি থাকেন হেথা। ভাড়াটেরা সবাই হিন্দু। জায়গাটা হিন্দু অধ্যুষিত। মিল্লাতরা বলা যায় এখানে, অর্থাৎ শহরের এই পাড়ায় একলা মুসলমান। ভাড়াটের প্রশ্নে হাজীর কোন, মিল্লাতের বাবার হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল কিনা বোঝা যায়নি। কারণ, মুসলমান ভাড়াটেরা সহজে এখানে আসতে চায় না। তা প্রায় ছয়শ টাকার মতন ভাড়া ওঠে নিচের চারখানা ঘর থেকে। সবই ঐ রাজিয়ার রোজগারের হিসেবে গত পরশু থেকে জমা হচ্ছে। মিল্লাত রাতারাতি দরিদ্র এবং একপ্রকার পথের ভিখিরি হয়ে গেল। বাপ কবরে শুয়ে একথা টেরও পেলেন না। এমনকি দোতলার ঘরখানিতে থাকবার সুবাদে বউটি, বউটি নয়, বিধবা মহিলাটি ভাড়া নিশ্চয় দাবী করবে এবং সে ভাড়ার টাকা টানতে মিল্লাতের জিভ ঝুলে পড়বে। এ-ঘটনাও কি অশ্লীল নয় ? আপন বাপের বাড়িতে আজ তাকে ভাড়াটে হতে হল।

সারাটা দিন, রাত্রি আটটা পর্যন্ত টো টো করে ঘুরেছে। টিউশানী করেছে। আরো টিউশানী কী করে জোগাড় হয়, তার চেষ্টা করেছে। ঘর খুঁজেছে। চা-মুড়ি, স্বল্প নাস্তা ইত্যাদি খেতে পেয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বাপমায়ের বদান্যতায়। ভাত তরকারি কোথাও চেয়ে খাওয়া যায় না। খেতে হলে হোটেল খোলা ছিল চোখেরই সামনে। ওঠেনি। সীতাহাটি থেকে চলে এসে, যখন থেকে এই বাড়িই তার একমাত্র ঠিকানা হয়ে দাঁড়াল, তখন থেকে হোটেলেই খাচ্ছে। আগে বুড়ী দাদীমা হাত পুড়িয়ে রেঁধে দিতেন। বাঁধা একটি হোটেলও ঠিক করে নিয়েছে। সেই সোলেমান মুফতীর হোটেলে উঠে দুপুরে খেয়ে নেবার লোভও হয়েছিল। সংবরণ করেছে। ভেবেছে, রাত্রে একবারই খাবে। এখন ফেরার পথে সেই হোটেলে উঠতেও মন সায় দিল না। সারাদিন না খেয়ে খিদের অনুভূতিই নষ্ট করে ফেলে অবাক হয়ে ভাবল, বেশ তো কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভয় কি ! এক ঠোঙা মুড়িচানা হাতে দোতলার পশ্চিম কোণের ঘরে এসে যখন পকেটে চাবি হাতড়াচ্ছে, তখন পুব কোণের বরান্দায় রাজিয়া দাঁড়িয়েছিল। এক পা এক পা করে এদিকে এগিয়ে এসে মাঝ ঘরের বাইরে দেয়ালে দরজার কাছে সুইচ বোর্ড হাতড়ে মিল্লাতের মাথার পেছনের বারান্দার বাল্বটা জ্বেলে দিল। সেই আলোর

স্পর্শে মিল্লাত মৃদু চমকে উঠল। পরশু যখন রাজিয়া বাড়ির দখল চাইল, ওর সঙ্গে ছিল, ওরই ফুপাত ভাই আনোয়ার, মিল্লাত যা কথা বলার তখনই বলেছে এবং প্রায় সব কথাই হয়েছে আনোয়ারের সঙ্গে। রাজিয়ার সঙ্গে কী কথা বলেছে, এখন মনে করতেই পারছে না। তবে এই রকম নিঃশব্দ উপকার করার ভদ্রতা দেখে মিল্লাতের ভালই লাগল। সুইচ অন করে দিয়ে আবছা আলোর মধ্যে রাজিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মিল্লাত তালা খুলে ঘরে ঢুকে টেবিলে মুড়ির ঠোঙা রেখে জামা খুলল। গেঞ্জি খুলল। লুঙ্গি পরল। বাথরুমটা ফের ঐদিকে, রাজিয়া যে-ঘরটায় রয়েছে, ওই পুব দিকে, এগিয়ে চলল। বাথরুমে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আগের মতই আলো জ্বলে গেল। এবার এই সুইচটা 'অন' হয়েছে পুবের বড় ঘরের দেওয়াল থেকে। রাজিয়া এখন সেখানেই। তবে তো মেয়েটি বাইরের আলোগুলো জ্বালবার হদিশ চিনে গেছে। বাথরুমে ঢুকে মিল্লাত দেখল, সব কিছু ছিমছাম করে সাজানো। মার্গো সাবানটা নতুন প্যাকেট খুলে রাখা। তোয়ালেটাও কোরা। তাড়াহুড়োয় মুখে ঘাড়ে সাবান ঘষে ফেলার পর খেয়াল হল, এ-গুলো যেন তারই জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছে। এমন ব্যবহার প্রত্যাশাই করেনি সে। বা আশা করেনি। মুখ মুছে, বাইরে বেরিয়ে দেখল, গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেছে। এ কী অবস্থা! লোডশেডিং হয়ে গেল? কিন্তু বাথরুমে তো দু সেকেন্ড আগেও আলো ছিল। অন্ধকারেই অতএব ঘরে পৌঁছতে হবে। পা বাড়িয়ে ছিল। সহসা রান্নাঘরের কপালে বাল্ব জ্বলে উঠল। তবে লোডশেডিং নয়। থমকে দাঁড়াল। খুব দ্বিধায় পড়ে গেল। রান্নাঘরে কেন?

কৌতূহলবশত রান্নাঘরের শেকল খুলে অবাক হয়ে গেল। আসন পেতে যত্ন করে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা। সবই ইংগিতে বোঝানো হয়েছে। তবে কি খেয়ে নেবে? কেনই বা নেবে না? নেবেই বা কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে শেকল তুলে দিল। এমন সময় অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল—খেয়ে নাও। ভাতের ওপর রাগ করছ কেন? ভাত কারো সৎ-মা না। কারো খালাস না দেয়া বিধবাও না। যাও। খেয়ে নিলে আমি আলো দেখাব।

পরশু দুপুর বেলায় ওরা যখন চৈত্রের দাবদাহের ওড়ানো পোড়ানো রোদ মাথায় করে হাওয়ার দোজখী ঝাপটা সহে সহে অত্যন্ত কাহিল অবস্থায়, ধুলোবালিতে ঝাপসা দুটি মানুষ এসে পৌঁছাল, তখন রাজিয়ার নাকের গোড়া রোদের ঝাঁঝে লাল হয়ে উঠেছিল। ফর্সা গালে কালো জরুলের ছায়ার মতন কালচে ছোপ লেগে ঝলসে উঠেছিল। এখন সেই অসহায় বিষণ্ণ চোখদুটি মনে

পড়ল মিল্লাতের । সেই মেয়েটিই তাকে আপন হাতে রান্না করা ভাত তরকারি খেয়ে নেবার জন্য নির্দেশ করছে। কথার সুরে কেমন একটা অধিকারের গন্ধ। খেতে বসে সুস্বাদু রান্না মাছের ঝোল-মাখা ভাতের গ্রাস মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গে খিদের অনুভূতি চাগাড় দিয়ে উঠল। গো-গ্রাসে খেতে শুরু করল। আনোয়াব চলে যাওয়ার পর থেকে রাজিয়াব সঙ্গে একটিও কথা হয়নি। রাজিয়াকে চোখ তুলে চেয়েও দেখেনি। প্রচণ্ড দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও ভাত খেয়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কেবলই মনে হচ্ছিল, মিল্লাত কোথায় যেন হেরে গেল। মেয়েটির অনুরোধ ফের ঠেলে ফেলে দিতেও পারল না। বাপ যে চারবারের বার সাদী করলেন, সেই লুকনো-চোরানো বিয়ের বৃত্তান্ত পরে বিভিন্ন মুখে রটনা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বোন নবীনা চিঠিতে মিল্লাতকে কিছু-কিছু লিখে জানিয়েছিল। বাড়ির চাকর মাবুদ এসে শুনিয়ে গেছে বাপের কীর্তিকলাপের ইতিকথা। সব মনে পড়ে গিয়েছিল পরশুর দুপুরে তৎক্ষণাৎ। তখন এই মেয়েটির উপরও কম রাগ হয়নি। লেখাপড়া জানা এই মেয়েটি বাপের যৌন-সংস্কারের শিকার হয় কী করে, কচি মেয়েটি কেন বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করেনি, সেটাই এক রহস্য। আনোয়ার তার বোনের নামে রেজিস্টারি করা এ-বাড়ির দলিল দেখাতে চাইলে, মিল্লাত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, ওই দলিল আপনারাই বুকে করে রাখুন, আমার দেখার দরকার নেই। বাড়ির দখল চাইছেন, আমি বাড়ি ছেড়ে দেব। উকিল মোক্তার নোটিশ কোন কিছুরই প্রয়োজন দেখি না। এই সম্পত্তির লোভেই তো আপনারা আপনাদের বোনকে আমার বাপের বিবি বানিয়েছেন, সেকথা নিশ্চয় ঐ দলিলে লেখা নেই। আমি কিন্তু সবই বুঝে ফেলেছি। সুতরাং যা চাইছেন, বাড়ির দখল, আমি তা বিনে কথায় ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার বোনকে এখানেই রেখে যাবেন বলছেন, তাই করুন। আমার আপত্তি হবে কেন ? আমি ছিলাম এই বাড়ির আগলদার। মালিক তো আপনারাই।

ভাত খেতে খেতে কথাগুলি মনে পড়ছিল। মিল্লাত ওদের ঘৃণাই করেছে। মাবুদ যেদিন বাপের বিয়ের কেচ্ছা শোনাতে চেয়েছে, মিল্লাত ধৈর্য ধরে সেকথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেনি। নবীনার চিঠি পড়তে পড়তে হাতের মুঠোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মাবুদের অনেক কথাই মাঝপথে থেমে গেছে। নবীনার কত চিঠিই আগাগোড়া পড়া হয়ে ওঠেনি। এখন মনে হচ্ছে, সেসব কথা জেনে রাখলে ক্ষতিই বা কী ছিল ? খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর মুখে কুলকুচি করতে করতে, ঢেকুর তুলতে

তুলতে, শরীর যখন পেটভর্তি রসে আপ্লুত হয়েছে, তখন সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির আয়েস থেকে এক ধরনের গ্লানিও হচ্ছিল, এইভাবে খেয়ে নেওয়া কি ঠিক হল? মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐধারা গ্রাস তুলে নিজেকেই অপমান করেছে। সকাল বেলা বাড়ির সবার বড় বড়ভাই আদিল বিশ্বাসকে একখানা চিঠি লেখার চেষ্টা করেছিল। বড়ভাই অত্যন্ত দয়ালু। সব ঘটনা বিস্তারিত লিখে প্রতি মাসে অন্তত হাতখরচের কিছু টাকা দাবী করবে ভেবেছিল। আজ এই বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে, ভাড়ার টাকার এক পয়সাও সে গ্রহণ করতে পারবে না, বরং তাকে প্রতি মাসে ভাড়া গুনতে হবে। কোথায় পাবে সেই টাকা ? তার দিন চলবে কী করে ? এই অবস্থায় বড়ভাই যদি মুখ তুলে চায়, তবেই এই শহরে মিল্লাত টিকে থাকতে পারে। কথাগুলি চিঠিতে লিখে ফেলেছিল ঝোঁকের মাথায়। তারপর সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে জানালা গলিয়ে বারান্দায় তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারপর গতকালকার মতনই বন্ধু মবিনের ওষুধের দোকানে গিয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল। মবিনের বাড়ি আর দোকান একই প্লটের মধ্যে। দোকানের পেছনে মস্ত একতলা বাড়ি। জৈগুন খালার হাতের রান্নাও মিষ্টি। দিনটা ওখানেই কাবার করা যায়। কিন্তু রোজ রোজ একই বাড়িতে গল্প মেরে ভাত খেয়ে অভাব মোচন হবে না। সমস্যা রোজকার, তাছাড়া, ওরা বাড়ি দখল হয়ে যাওয়ার ঘটনাও জানে না। গতকাল মবিনকে কথাটা বলবে ভেবেও বলতে পারেনি। কারণ তাহলে ঢের ঢের বিশ্রী কথা মবিন তাকে শুনিয়ে দিত। জৈগুন খালা মুখ নেড়ে-চেড়ে বলার মতন কেচ্ছা পেয়ে মেতে উঠতেন। বৈদ্যবাটি ফের জৈগুন খালার শ্বশুর-ঘর। গাঁয়ের বাড়ি সেখানে। সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে ঢের কাল। তথাপি তাঁর সবই নখদর্পণে। মিল্লাত অনুমান করেই, কথা তোলেনি। বাপের কোন কথা কখনও সে সহ্য করতে পারেনি। তাই আজ সারাটা দিন তাকে অন্যমুখো চলে যেতে হয়েছিল। হিন্দু বন্ধুগুলোর ঠেকে গিয়ে আড্ডা মেরেছে। টিউশানী করেছে দুই দুকুনে চারটি। দুই বাড়িতে। এত কম টিউশানীতে চলবে না। এতদিন বাড়ি ভাড়ার টাকায় দিব্যি বাবুগিরি করে অনিয়মিত টিউশানী করা যেন ঠিক শখের কাজ ছিল। এখন থেকে সেই শখ আর শখ রইল না। যাই হোক, জৈগুন খালার ওখানে আজ সে যেতে চায়নি। মবিন বার বার করে যেতে বলেছিল, সেকথা মনে থাকা সত্ত্বেও মবিনকে এড়িয়ে অন্যপথে চলে গিয়েছিল।

সেই ছেঁড়া চিঠির গোল-পাকানো কাগজ রাজিয়া ঝাঁট দিতে দিতে হাতে তুলে নিয়েছিল। জোড়া দিয়ে দিয়ে টুকরো ছেঁড়া লেখাগুলিকে বহু ধৈর্য ধরে মেলাবার চেষ্টা করেছে সারাটা সকাল। তারপর খাটের তোষকের তলায় রেখে দিয়েছে

যত্ন করে গুছিয়ে।

খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে শেকল তুলে দিল মিল্লাত। সশব্দে। সেই শব্দ শুনে রাজিয়া ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় আলো জ্বালল পর পর। পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, তোমার ফিকে হলুদ তোয়ালেটা বড্ড পুরনো হয়ে গিয়েছিল। হেঁটে যেতে যেতে কথা শুনে থমকে দাঁড়াল মিল্লাত। রাজিয়া তখন বাকি কথা শেষ করল—আমি ওই তোয়ালেটা ন্যাতা বানিয়েছি, বদলে একখানা নতুন কিনে আনিয়েছি শফীকে দিয়ে। ওটাই তুমি নিও। কথা শেষ হতেই রাজিয়া ঘরে ঢুকে গেল। মিল্লাত হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিমের ঘরে এসে পৌঁছাল। রাজিয়ার রঙ সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিশেষণ ব্যবহার লক্ষ করে বেশ অবাকই হয়েছিল। সচরাচর গ্রাম্য একটি মেয়ের মুখে বাংলা ভাষা এতখানি আদর পায় না। বিছানায় শুয়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে মিল্লাত দীর্ঘক্ষণ ঘুমাতেই পারল না। রাজিয়া শুয়ে পড়ার আগে কী একখানা বই মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। একসময় বই বন্ধ করে বারান্দার দুটি আলো নিভিয়ে একটি মাত্র মাঝের বাল্ব জ্বেলে রাখল। ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে ফ্যানের শাঁই শাঁই শব্দ শুনতে থাকল। জানালা দিয়ে আকাশে চাইল। চাঁদটা অত্যন্ত ধূসর হয়ে ধুলোয় আচ্ছন্ন। রাজিয়ার ঘুম এল না।

॥ দুই ॥

রাত্রে শুয়ে পড়ার সময় মিল্লাত দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিল শুধু। ভেতরের শেকল তুলে বন্ধ করেনি। এ-ঘরে ফ্যান নেই। সারারাত গুমোট গরমে ছটফট করেছে। রাত্রির শেষাশেষি গাঢ় হয়ে ঘুম এসেছে বলে সকাল সাড়ে সাতটা অবধি ঘুমিয়েই রয়েছে। রাজিয়া বারান্দা ঝাঁট দিয়ে শেষ করে মিল্লাতের ঘরে ঢুকে বহুদিনকার ধুলো সাফ করছে। এত নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে যে মিল্লাতের ঘুম ভাঙার কথা নয়। তবু মানুষের ছায়ারও স্পর্শ থাকে বলে মিল্লাতের ঘুম ভাঙল। ততক্ষণে রাজিয়া চৌকাঠ পার করে ধুলো, কুটো, ছেঁড়া কাগজ, আলপিন ইত্যাদি গোছ করে তুলে ফেলেছে। ঝাড়ুনি থামিয়ে বিছানায় ঘুম জড়ানো অবস্থায় জেগে উঠে বসে থাকা মিল্লাতকে চোখের কোণে দেখে নিয়ে ঝাড়ুনি নেড়ে চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায় চলে এল। মুখে কোন কথা বলল না। মিল্লাত বিছানা ছেড়ে এসে বাথরুমে ঢুকে দেখল তাকের উপর ব্রাশ এবং পেস্ট যথারীতি মজুদ। ব্রাসে পেস্ট লাগিয়ে একটু জল ছুঁইয়ে পুব দিককার খোলা ছাতে চলে এল। বাড়ির নির্মাণের কাজ এদিকটায় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

আর দুখানা ঘর এই ছাতের উপর তোলা যায়। হাজী সেই ঘর তোলার সিমেন্ট শিক ইত্যাদি মাঝের ঘরে জমিয়ে রেখে দিয়েছে। তালাবন্ধ। শিকে মরচে ধরছে। সিমেন্ট জমে পাথর হয়ে গেছে। সেই কাজ আর শুরু হয়নি। থেমে গেছে এবং তা সম্পূর্ণ হওয়ারও কোন তাগিদ নেই। সেই ছাতে এসে ব্রাস ঘষতে ঘষতে 'বাবু-বাগানের' দিকে চেয়ে রইল মিল্লাত। একটা পাখিও চোখে পড়ছে না। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দু-একটি পাখি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কিচকিচ শব্দও শোনা যাচ্ছিল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মুখ ধোয়ার জন্য পা বাড়াল। প্রায় পঁচিশ মিনিট এইভাবে সময় কেটে গেছে। ঘরে এসে দেখল, ঘড়িতে আটটা বাজতে দেরি নেই। টেবিলের উপর চায়ের ট্রেতে চিনি চা দুধ আলাদা করে রাখা। একটা পাত্রে সুজির হালুয়া। খান চার স্লাইস রুটি। ভাজা তরকারি। সঙ্গে সাদা কাগজে লেখা ছোট চিরকুট। ও-গুলো খেয়ে নিও। ঘৃণা করো না। দুপুরে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসার দরকার নেই। দুপুরে বাড়ি ফিরে আসবে। নিচে থেকে সফীকে একটু ডেকে দিও। গতকাল ওকে আমি একটাকা বখশিস দিয়েছি।

খুব পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। চিরকুট পড়ে সুজি আর রুটি খেয়ে চা তৈরি করে নিল মিল্লাত। রাজিয়ার চা চিনি দুধ আলাদা করে চা পরিবেশনের বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হল। চিরকুট লেখার বুদ্ধি আরও বিস্ময়কর। সফীকে বখশিস দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, কখনও মিল্লাত সফীকে বখশিস দিয়ে কাজ করানো যায়, ভেবেও দেখেনি। এমনকি এই ট্রেখানা কখনও ব্যবহৃত হয় না। রাজিয়া যা কখনও হয় না, তাই করছে। কেন করছে ? ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধা বা সমীহ বা ঐ জাতীয় একটা ভাব সৃষ্টি করছে কেন ? তার সঙ্গে এইসব মিষ্টি সম্বন্ধ রচনার চেষ্টারই বা মানে কী ? বড়জোর তার সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্ক হলেই তো স্বস্তি। গৃহমালিক আর ভাড়াটে ! ব্যস ! কিন্তু এইসব আদিখ্যেতা কেন ? কিছু কিছু মানুষ থাকে শত্রুর সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করে। এই মেয়েটি কি সেইরকম ?

ভাবতে ভাবতে প্যান্ট সার্ট গলিয়ে নিল ধীরে সুস্থে। মাথায় চিরুনি চালিয়ে হাতের কব্জিতে ঘড়িটা বাঁধল। নিচে নেমে এল। সফী চায়ের দোকানে কাজ করে। চা ফুটাচ্ছিল। মিল্লাত কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, ওপরে গিয়ে এক ফাঁকে কথা বলে আসবি।

সফী মাথা নেড়ে সায় দিল। মিল্লাত শুধাল, গতকাল বাজার করে দিয়েছিলি ?

সফী বলল, হ্যাঁ। কেন ?

মিল্লাত বলল, দুপুরে আমি ফিরতে পারব না। বলে দিস।

সফী ফের মাথা নেড়ে কাজে মন দিল। মিল্লাত ভেবে পেল না, সফীকে আর কী বলা যায়। আরো এক দণ্ড নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল। দুপুরে কোথাও সে কিছুই খেল না। মবিনের কাছেও গেল না। কেবল চা আর খাস্তা বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিল। এক প্যাকেট প্লেন চারমিনার খরচ করল পথে পথে। মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল, ভদ্রমহিলার সঙ্গে পশ্চিমের ঘরখানার ভাড়া নিয়ে কথা বলা উচিত। ঘরে ফ্যান নেই। গুমোট ঘর। হাওয়া-বাতাসও খেলে না তেমন। অতএব ভাড়া কম হওয়া দরকার। খবরের কাগজে চাকুরির বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে একটা ঠিকানা টুকে নিল। মনে মনে বলল, আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে। চাকুরি করতে হবে। বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হবে।

ম্যাগাজিন স্টল ছেড়ে পথে পা বাড়াতে গিয়েই সাইকেল চালক মবিনের চোখে চোখ পড়ে গেল। মবিন সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে মিল্লাতের চোখের সামনে দাঁড়াল। চোখে কৌতুক। ফাঁকিবাজ। মিথ্যুক। কথা দিয়ে কথা রাখো না, ইত্যাদি। মবিনের চোখে কৌতুক সরে গিযে মুহূর্তে অভিযোগ ফুটে উঠল। খপ করে মিল্লাতের একখানা হাতের কব্জি চেপে ধরে বলল, তুমি মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ। কাল গেলে না কেন?

—যেতাম।

—যেতাম তো যাওয়া হল না কেন?

—বলছি। সব বলছি তোমাকে। আমি বড় সমস্যায় পড়েছি। চলো। কোথাও গিয়ে বসি। তোমার কোন তাড়া নেই তো?

মিল্লাত মনে মনে স্থির করল, মবিনকে কিছু কথা অন্তত শুনিয়ে রাখা ভাল। হাজার হোক, অত্যন্ত কাছের বন্ধু। বন্ধু বন্ধুকে বলবে না তো কাকে বলবে। মুশকিল আসান কিছু না হোক, মন খানিকটা হাল্কা হবে। বড্ড টেনশন হচ্ছে। মবিন বলল, ভাকড়ির ওদিকে একটা রুগী দেখতে গিয়েছিলাম। পেট-ফেলানী কেস্। মুসলমানের জারজ বাচ্চা। খুব কুখ্যাতির কাজ ভাই। তবু এই না করলে পপুলার হওয়া যায় না। শুধুই এই কেস। টাকাও ভাল। মেয়েদের শরীর ঘেঁটে ঘেঁটে সব ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইসব কেস করার পর নামাজ না পড়লে শান্তি পাই না। তা আমি তো ডাক্তারি পড়িনি, ডাক্তারির কিছু বুঝিও না। তবু লোকে ছাড়ে না। মুখে দাড়ি রাখলেই যেমন মোল্লা হওয়া যায় না। ওষুধের দোকান থাকলেই কেউ ডাক্তার হয় না। কিন্তু লোকে সেকথা বুঝবে না।

—তুমি তো ডাক্তার মুন্সীর কাছে কিছুদিন কম্পাউন্ডারি শিখেছিলে।

—সেটা ওই ওষুধের দোকান করব বলে। ড্রাগ-লাইসেন্স পেতে গেলেও ওইটুকু বিদ্যের দরকার। যাই হোক। কোনদিকে যাবে ? আমার কোন তাড়া নেই। আজ হাফ-ডে। বিকালে দোকান বন্ধ।

ওরা কাছেই একটা চায়ের দোকান দেখে ঢুকে পড়ল। এদিকের রাস্তায় ভিড় কম। রিকশা আর দু'চারটে জিপ বা ট্যাক্সি। দুএকখানা লরি। দুপুরে পথচারীর সংখ্যা আরো কমে যায়। চায়ের দোকানে ঢুকে এসে টেবিলের উপর ডাক্তারি ব্যাগটা রাখল মবিন। মুখোমুখি বসল। শুধাল, কিছু খাবে ?

মিল্লাতের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তবু সে না বা হ্যাঁ, কিছুই বলল না। মবিন খুশিমতন অর্ডার করল। মবিনের চোখে মিল্লাতের চোখমুখ অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছিল। এই দোকানে মাংসের কুচি দিয়ে ভাল রোল তৈরি করে। মবিন প্লেটে করে রোল আর লবঙ্গলতিকা দিতে বলল দুজনের জন্য। চা তৈরির জন্য বলল। বাচ্চা ছেলেটি প্লেট দিয়ে চলে গিয়ে চায়ের ফুটন্ত হাঁড়ির ঢাকনা ফাঁক করে খানিক কাঁচা জল ঢেলে দিল। মবিন একখানা লতিকা তুলে মুখের কাছে এনে কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল। প্রশ্ন করল, তোমার সমস্যার কথা শোনাও তাহলে !

—হ্যাঁ।

মিল্লাত খেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না, রাজিয়ার কথা মবিনকে সত্যিই কি বলা যায় ? বলা কি যায়, সে কেন গৃহচ্যুত হয়েছে ? তার এখন কী করা উচিত ? অথবা অন্য কোন প্রশ্ন ? বাপ কেন তাকে পথে বসিয়ে গেল, এই ধরনের জিজ্ঞাসা ? মিল্লাতের মধ্যে কিসের একটা অবরোধ এসে সব প্রশ্নকে বারবার স্তব্ধ করে দিচ্ছিল। মবিন আবার তাড়া লাগিয়ে মিল্লাতের এই মৌনতার কারণ শুধালো। মিল্লাত হঠাৎ-ই মবিনকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখনও সীতাহাটি যাও ?

মবিন বলল, ওখানকার ডিসপেনসারি কবেই আমি তুলে দিয়েছি। তোমায় বলিনি ? তা, সেখানে যাওয়ার কথা শুধোচ্ছ কেন ? হঠাৎ ? মিল্লাত নিজেরই কাছে নিজেকে আড়াল করে উত্তর করল, নবীনা কেমন আছে, কতকাল চিঠিও লেখে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল মিল্লাত। সেই নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনে ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হেসে মবিন খাবার দিকে মনোযোগ দিল। সীতাহাটির সঙ্গে মিল্লাতের বিচ্ছেদ ঘটেছে বাপের বিয়েকে কেন্দ্র করে, মবিন তা স্পষ্ট করেই জানে। এবং তিনমাস আগে হাজীর মৃত্যুতে মবিন সীতাহাটি উপস্থিত ছিল। মৃত্যুর এক হপ্তা আগে থেকে সীতাহাটির বাড়িতে লোক আনাগোনা শুরু

হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন, গুস্টিপাস্টি, কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব, যে যেখানে ছিল হাজী মরে যাচ্ছে শুনে মিছিল করে এসে জড়ো হয়েছিল। তাছাড়া গ্রাম সুদ্ধু প্রতিবেশীর ভিড়। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকেও মণ্ডল মাতব্বরে প্রাঙ্গণ উপচে পড়ছিল। মবিনও গিয়েছিল অতিদূর সম্পর্কের সূত্র ধরে এবং সীতাহাটির হাতুড়ে ডাক্তারের যশ ছিল তার। অবশ্য হাজী মবিনের ওষুধ মুখে দ্যাননি। কবরেজি ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর কফিনে গা ঢেকেছিলেন। সবাই গিয়েছিল। অনেক আগাম খবর পেয়েও একমাত্র মিল্লাত সেই মৃত্যুর দৃশ্যে যোগ দেয়নি। গাঁ থেকে লোক এসেছিল মিল্লাতের কাছে মৃত্যুর খবর বহন করে। মৃত্যুর পরও মিল্লাত উপস্থিত হতে পারে ভেবে মাভাইয়েরা লাশ আগলে বসেছিল। মিল্লাত উপস্থিত হয়নি। মবিন সীতাহাটি থেকে কবরে মাটি ফেলে সরাসরি মিল্লাতের কাছে এসে প্রশ্ন করেছিল, তুমি গেলে না কেন ? যার সঙ্গে আজীবন মামলা মোকদ্দমা করে চির-শত্রুতার সম্পর্ক সেই আখির মোল্লাও এসেছিল। কবরে মাটি দিয়েছে। যানাযা (মৃত্যুর পরই কফিনে শুয়ে মৃতের আত্মার শান্তি কামনার জন্য যে নামাজ) পড়ল। কিন্তু ছেলে হয়েও তুমি শেষ দেখা একবার দেখলে না ? কেমন ছেলে তুমি ?

মিল্লাত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, আমি যাইনি। গিয়ে কী করতাম ? সবাই কাঁদছে দেখেও আমি যে কাঁদতে পারতাম না। সেটা অত্যন্ত বাজে জিনিস হত। সবাই মিলে সমালোচনা করত। বাপের চরিত্র নিয়ে কানাকানি চলত। সেটা কি ঠিক হত ? বল ? তুমিই বল ?

মবিন বলেছিল আশ্চর্য থমথমে গলায়, চরিত্রের কথা উঠবে বলে তুমি গেলে না। কিন্তু রাজিয়া এসে পড়ায়, যা কেউ কল্পনা করেনি, তাই হল। রাজিয়া গরুরগাড়ি করে তোমার বাপের কাছে খালাস চাইতে এসেছিল। চরিত্রের কথা আপনা থেকেই উঠে গেল। বেহদ্দ কানাকানি হয়েছে। তুমি গেলে না, আর রাজিয়া এল, এল খালাস চাইতে, অতএব মুখ নেড়ে বলার মতন কেচ্ছা সীতাহাটির মানুষ জোর উপভোগ করেছে।

—থাক। সীতাহাটি বৈদ্যবাটির কেচ্ছা যেখানে ছিল সেখানেই থাক। আমায় বলো না। মিল্লাত গম্ভীর ভাবে বলে উঠল সেদিন। আর আজ সেই কেচ্ছাই সে শুনতে চাইছিল। রাজিয়া কেন অমন করে খালাস চাইতে এসেছিল ? এমনি করেই তো সব কথা সে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে। শুনতে চায়নি। মবিন আপন মনে খেয়ে যাচ্ছিল। খেতে খেতে আস্তে করে মিল্লাতের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের জবাব দেবার চেষ্টা করল, নবীনা কেন তোমায় চিঠি দিচ্ছে না সেকথা তোমার

তো না-জানা নয়। চিঠি লিখতে হলেই বাপের কথা লিখতে হবে। এবং সেটা তুমি পছন্দ করো না। নবীনা আমায় বলেছিল, ভাইয়াকে চিঠি দিতে ইচ্ছে করে না, কী লিখব ? আমি বলেছিলাম, রাজিয়ার কথাটথা না লেখাই ভাল। লিখো না। তাই তুমি চিঠি পাচ্ছ না। এটাই কি তোমার সমস্যা ? তবে তো তার উত্তরও তুমি পেলে। এবং যে সমস্যাকে এড়িয়ে চলবার পরও সেই সমস্যা যদি তোমায় ভাবাচ্ছে, ঘুম নষ্ট করছে, কষ্ট দিচ্ছে মনে করো, তবে আমি তোমায় একটি আগাম সংবাদ দিয়ে রাখি।

—কী সংবাদ ? কিঞ্চিৎ উৎসুক হল মিল্লাত।

—রাজিয়া তোমার বাপের সম্পত্তির কিছুটা ভাগ চায়। আমি ঐ মৃত্যুর দিনই বুঝেছিলাম। এবং সেকথা সেদিন তোমায় বলতেও চেয়েছিলাম। তুমি শুনতে চাওনি। যাক গে। তুমি আসলে সত্যিই কী মস্ত সমস্যায় পড়েছ, একটু বলবে ? আমার কাছে যেতে না পারার মতন সমস্যা, প্র্যাকটিক্যালি, কী সেটা ?

মিল্লাত এবারও চেপে গেল। বলল, চোখে দেখানোর মতন সমস্যা কিছু নয়। এবং নয় বলেই ভেবো না, আমার কোন গভীর সমস্যা নেই।

মবিন কথা শুনে খাবার মুখে করেই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর ঢক ঢক করে জল খেল। বলল, আরে ভাই যে সমস্যা চোখে দেখা যায় সে তো সহজ সমস্যা। সেটা আর গভীর হল কোথায় ? কিন্তু যেটাকে তুমি সমস্যাই মনে করছ না, অথচ যে জিনিস তোমার নিজেরই খুব গভীরে ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটাই তো আসল সংকট। তুমি চেয়েছিলে বাপের সব অস্তিত্ব তোমার সত্তা থেকে মুছে ফেলে দিতে। এবং যখন থেকে এই ধারা ভাবতে চেয়েছ, তখন থেকেই তোমার সংকটের সূচনা। তুমি ধরতে পারনি।

—কী বলছ তুমি ? মিল্লাত চমকে উঠল যেন বা।

মবিন দোকানের ছেলেটিকে চা আনতে নির্দেশ দেয়। তারপর গলায় জোর দিয়ে বলে, ঠিকই বলেছি আমি। শোন। আমার ধারণা, তুমি বাপের জন্য কষ্ট পাও। বাপকে ক্ষমা করতে না পারার কষ্ট। সেটাই প্রকৃত সংকট তোমার। বাপকে একভাবে তোমায় ক্ষমা করতে হবে।

মিল্লাত ঠোঁট বাঁকা করে হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। পাণ্ডুর একটা ছায়া কোথা থেকে ভেসে এসে চোখের গভীরে ঢুকে গেল। এঁটো জল-ফেলা নাদায় গিয়ে মিল্লাত হাত মুখ ধুয়ে এল। রুমালে রগড়ে আঙুলগুলো মুছে রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলার আগে মুখেও একটু ছুঁইয়ে নিল। মবিন উঠল না। গেলাসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ধোয়াটোয়া করল। মবিন বলল, সিগারেট খাবে

তো ? বাচ্চাটাকে দিয়ে কিনে আনাও, পয়সা দিচ্ছি।

মিল্লাত বলল, আছে। পকেটে এখনও তিনটে চারমিনার খরচ হয়নি। বলে মিল্লাত প্যাকেট খুলল। মবিন সিগারেট খায় না। কাঠি জ্বেলে সিগারেটের ডগায় ছোঁয়াল মিল্লাত। মবিন লক্ষ করল। মবিনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওর কথা শেষ হয়নি। ধোঁয়া গিলে উগরে না দেওয়া পর্যন্ত মবিন অপেক্ষা করল। বলল, হাজী সাহেবকে আমি তোমায় ক্ষমা করতে বলছি, কিন্তু ঘটনা কী দ্যাখ, আমি নিজেই তাঁকে ঠিক সহ্য করতে পারিনি। মিল্লাতের গলায় ধুমো আটকে যাওয়ায় মিল্লাত খুক খুক করে কাশতে লাগল। তার কাশির ধরনে মনে হচ্ছিল, মিল্লাত কথাগুলি শুনতে চাইছে না। মবিন বলল, শুনবে ? তোমাদের বাড়ির চাকর মাবুদ বা তোমার বোন নবীনা যেকথা কখনও বলতে পারেনি, একমাত্র আমিই তোমাকে সেই কথা শোনাতে পারি। আমার মনে সেই ঘটনাটা গেঁথে আছে। ভুলতে পারি না। এইজন্যেই বলেছিলাম। হাজীর মৃত্যুর দিন সীতাহাটি তোমার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। তুমি তোমার বাপকে ক্ষমাও করতে পার না, আবার ঠিক ঘৃণাও করতে পার না। কিন্তু ঐ ঘটনাটা দেখলে, তোমার মনে খুব জোর একটা ধাক্কা লাগত। আমার ধারণা।

মিল্লাত এবার মুখ খুলল। বলল, আমার সমস্যা যদি ক্ষমা করা বা ঘৃণা করার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হত, তাহলে সেটা আমার কাছে কী বলব, সমস্যাই ছিল না। আমি খুব সহজেই মুক্ত হতে পারতাম। আমার প্রবলেম ক্ষমা করা বা ঘৃণা করার নয়। অত সাদামাটা ব্যাপার তো নয়। আমাকে সব সময় মনে মনে সভ্যতার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কেন ? নিজেকে মুসলমান বলতে আমার খুবই কষ্ট হয়। কারণ, প্রশ্নটা তো আমি নিজেকেই করি, আমার বাপ কি আইডিয়াল ছিল ? আদর্শ মুসলমান ছিল ?

মবিন বলল, হ্যাঁ। অনেকখানিই ছিলেন। হজ্ব করেছেন। নিঃখুঁত হিসেব করে জাকাত দিয়েছেন। দানখয়রাত করেছেন। হসপিটাল করবে জনগণ। মাটি দিয়েছেন। স্কুলের বিল্ডিং প্রয়োজন। সেটাও তিনি পুরো নিজের দায়িত্বে আপন গ্যাট থেকে কড়ি খসিয়ে করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়ক্ত বাঁধী নামাজ পড়তেন।

মিল্লাত মবিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত গলায় বলল, ঠিকই। অবশ্যই ঠিক কথা। শরিয়ত মেনে চলত বাপজান। আমার দ্বিমত নেই। শরিয়তের বিধান যাকে বলে, তারই কড়া নিয়ামক ছিল ওঁর জীবন। দেশের মজলিসে বিচার-আচ্ছা সবই তাকে ধর্মের নির্দেশ মেনে যথাসাধ্য করতে দেখেছি। অন্যায় সে করেনি। অন্তত জ্ঞানত করেনি। এবং নবীর সুন্নৎ পুরা

করতে গিয়েই তাঁকে চার চারটে শাদী করতে হয়েছে। এটা ছিল তারও দাবী। দেশের লোককে বাপজান একথা বলত। কিন্তু এসবই ছিল বাইরের চিহ্ন। ওর কথা ছিল, একজন মানুষ বাহ্যত মুসলমান না হলে ভেতরেও মুসলমান হতে পারে না। কিন্তু ঐ চতুর্থ বিয়ের বেলা বাপজান গোড়ার দিকেই এমন মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছিল, যা মুখে আনতেও কেমন লাগে। ঘেন্নাই লাগে। দম পাই না। শুনবে ? কখনও মাবুদও তোমায় বলতে পারেনি। নবীনাও না। যদি শোন, তোমার মনেও খুব জোর একটা ধাক্কা লাগবে। আমার ধারণা। বলেই মিল্লাত পানসে করে ঠোঁটের কোণে হাসল। দুজনেই ম্লান করে হেসে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মিল্লাতের বুকটা ভার ভার ঠেকছিল। মবিন দোকানদার বুড়োকে লক্ষ করছিল। বুড়ো ঢুলছে বলে মনে হল। আবার ঠিক যে ঢুলছে তারই বা ঠিক কি ? ওদের কথা মন পেতে শুনতেও তো পারে। মবিন হঠাৎ বলে উঠল, চলো। ওঠা যাক। পথে যেতে যেতে কথা হবে।

মবিন আসন ছেড়ে উঠে দোকানদারকে দাম মিটিয়ে দিল এবং সাইকেলে ব্যাগ ঝুলিয়ে পথে নেমে এল। মিল্লাত বলল, চলো গঙ্গার ধারের সড়ক ধরে এগোই। বেশ নিরিবিলি। তুমি বলছিলে, রাজিয়া সম্পত্তির ভাগ চায়। ব্যাপারটা তখন শোনা হয়নি।

মবিন সাইকেল গড়াতে গড়াতে বলল. আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছিলুম। সম্পত্তির ভাগ চায় বলেই তোমার বাপের কাছে খালাস চাইতে এসেছিল। যে-ঘটনা তোমায় ধাক্কা দেবে বলছিলাম, এটা তার বাইরের দিক। সাধারণ পাঁচজন সেই মন্তব্যই করেছিল। রাজিয়া খালাস চাইছে, নিজেকে হাজীর বউ বলে পাঁচজনের কাছে গণ্য করানোর জন্য।

মিল্লাত অবাক হয়ে শুধাল, কেন, সে কি হাজীর বউ ছিল না নাকি ? আমার বাপজানের চার নং স্ত্রী। কলমা-সিদ্ধ সহধর্মিণী। মুখের কথা নয়। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। খুলে বলো।

মবিন বলল, খুলে বলতে হলে, আমাকে গুছিয়ে বলতে হবে। তোমার শোনার ধৈর্য থাকবে না। বরং তুমি বিয়ের ঐ গোড়ার ঘটনাটা বল। শুনি।

মিল্লাত বলল, আগে তোমার কথাই আমি শুনব। কারণ, তোমারও বোধহয় অভিযোগ, আমি কেন বাপের মৃত্যুতে উপস্থিত ছিলাম না। এবং বাপকে আমার ক্ষমা করলেই ভাল হয়। যদিও সেই বাপকে মানুষ ঠিক সহ্য করতে পারে না। এমনকি তোমার মতো মানুষও পারে না। আগাগোড়া তোমার সমস্ত কথার মধ্যে আমি কেমন একটা রহস্যই দেখতে পাই। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

মবিন বলল, কারণ তুমি তোমার বাপকে ঠিক কখনও বুঝতে পারনি। সব সময়ই মনে করেছ, ঐ মানষটির মধ্যে বোঝার কিছু নেই।

মিল্লাত হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ। ঠিকই। বুঝিনি। নইলে আজ আমাকে এই রকম একটা উচ্ছন্ন অবস্থায় পড়তে হয় না। কোথায় আছি আর কোথায় থাকব, কিছুই জানি না।

—ঠিকই থাকবে। মনকে অত কষ্ট দিও না। নাও। চলো। দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ? মিল্লাত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মবিন তাগিদ দিয়ে আবার ওকে চালু করে দিল।

মিল্লাত হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বলে উঠল খুবই অস্ফুট—হায়! কিছুই তুমি জানো না মবিন! আমার বাপকে তুমিও চেননি!

মিল্লাত আগে আগে আগের চেয়ে দ্রুত হেঁটে গঙ্গার সড়কে ঝটিতি পৌঁছতে চাইছিল। পথে বিকালের আলো নামার পূর্বাভাস। হাওয়ার ঝাপটা কমেনি। মবিনের চুল উড়ছে। পিঠের পাঞ্জাবি হাওয়ায় কাঁপছে। আলুথালু হয়ে যাচ্ছে মবিন। মিল্লাতও বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মবিনের মতন ঠিক ততখানি আলুথালু ছিল না। চোখের সামনে মবিন দেখছিল, হাজী মরে যাচ্ছে। রাজিয়া গরুর গাড়ি থেকে নামল। পোশাকে-আশাকে কোথাও মৃত্যুর ছায়া লাগেনি। চোখে মুখে থমথমে ভাবখানিও মৃত্যুর জন্য নয়। তবু দুই চোখে কেমন এক মিষ্টি চাপা বিষণ্ণতার মধ্যে একটা কেমন ছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। কিসের ছায়া, মবিন বুঝতে পারছিল না। অবাক হয়ে চেয়েছিল পলক পড়ছিল না। রাজিয়া মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। দুটি চোখ আর দেখা গেল না। রাজিয়া পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। খাটের দিকে। হাজী যেখানে শুয়ে আছেন। মৃত্যুর এমন সমারোহ কখনও দেখেনি মবিন।

গঙ্গার ধারে পাড়ের উপর সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চ আছে এদিকটায়। মবিন সিমেন্টের বেঞ্চির একপাশে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখল। পায়ের চটি নিচে ফেলে পা তুলে গুছিয়ে বসল। ওর দেখে মিল্লাতও পা তুলে নিল। মুখোমুখি ওরা। মবিনের মুখে চোখে বিদায়ী সূর্যের আলো গঙ্গার জলে পিছলে এসে লাগছে। লাল রঙের মধ্যে কালো রেখা ঝিলমিল করছে। যেন তারই ভাবনার তরঙ্গ চোখের উপর ঝাপটাচ্ছে। স্মৃতির এক আশ্চর্য মেদুরতা নড়েচড়ে যাচ্ছে কেবলই। মবিন মুখ খুলল। বলল, তুমি কখনও রাজিয়াকে দ্যাখোনি। নিশ্চিত গলায় কথাটা পেশ করল মবিন। মিল্লাত ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল। কোন

জবাব করল না। মবিন বলল, আমি সেই প্রথম দেখি। সেই শেষ। তা-ও দেখেছি ঘোমটার আড়ালে। দুটি চোখ ছাড়া কিছুই তেমন দেখা হয়নি। অবিশ্যি ঐ দুটি চোখ দেখেই ওর ভেতরের কিছু খবর আমার জানা হয়ে গেছিল।

মিল্লাত ঈষৎ উৎসুক হয়ে মবিনের ভাবনার তরঙ্গের দিকে দৃষ্টি ছোঁয়াল। মবিন শুধাল, তুমি সিগারেট খাবে না?

মিল্লাত মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে 'না' করল। মবিন তখন এক সেকেন্ড চোখ বুঁজে নিজেকে সীতাহাটি নিয়ে গেল। বলল, ঐ ঘটনার আগে পরে রাজিয়া সম্পর্কে এত বিচিত্র কথা কানে এসেছে যে আমার ঐ মেয়েটিকে নিয়ে একটা দিশেহারা ভাব আছে। কখনও ঘৃণা হয়েছে। কখনও কী বলব, মায়াও হয়েছে। তুমি কখনও শুনতে চাওনি।

মিল্লাত নরম বিরক্তিতে বলে উঠল, কতবার আর বলবে আমি শুনতে চাইনি। আমি আজ শুনতেই চাই। রাজিয়া সম্পত্তির ভাগ চাইবে, এ তো জানা কথা। কেন চাইবে না? এমন হতে পারে, শহরের এই বাড়িখানাই সে দখল নিয়ে নিল, হতে পারে না? আমার বাপ কাকে কী দিয়ে গেছে, কিছুই জানি না।

মিল্লাত এটুকু বলে ফেলে নিজেকে খানিক হালকা মনে করল। মবিন শুধাল, তুমি খুব ভয় পাচ্ছ? তাই না? তোমার বাপের সম্পত্তির দলিল, তোমার দেখা উচিত।

—কী হবে? ঐসব দেখে? যাকে যা দিয়ে গেছে, সে তাই পাবে। নিজের সম্পত্তি মানুষ যাকে খুশি দিতে পারে। আমাদের বলবার কী আছে। ইচ্ছে করলে, কারুকে পথে বসাতে পারে। মিল্লাত সামান্য তপ্ত হয়ে উঠল।

মবিন বলল ক্ষীণ হেসে, পথে বসানোর হলে রাজিয়াই বসবে। তুমি ছেলে, তুমি বঞ্চিত হও, কোন বাপ চাইবেন না। বিশেষ করে, তোমার বেলা, হাজী সাহেব ভীষণ 'উইক' ছিলেন। তুমি মানতে চাইবে না, কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যা নয়। দেখে নিও, ফাঁকি পড়লে, রাজিয়াই পড়বে। আমি সেই কথাই বলতে চাইছিলাম।

মিল্লাত বলল, তোমার ধারণার মধ্যে কোন গলদ কি থাকতে পারে না মবিন? রাজিয়া পথে বসবে বলছ, এটা কি কোন অনুমান করে বলছ, নাকি কোন প্রমাণ পেয়েছ তুমি? আর আমাদের কোন ভাই বা আমি যে পথে বসব না, তার কী সবুদ তোমার জানা আছে?

মবিন নরম করে বলল, প্রমাণ কিছু নেই। তবে মেয়েদের চোখের পানিতে কত কথাই যে লেখা থাকে, সে তুমি বুঝবে না। মেয়েরা যখন কাঁদে, তখন তবু

সহ্য হয়, কিন্তু মেয়েরা যখন কাঁদতে পারে না, তখন সেই শুকনো চোখ দেখে…

—থাক। তুমি বড্ড হিউম্যানিস্ট দেখছি! মেয়েদের চোখের শুকনো কান্নার রহস্য তুমিই বোঝ। আমি মনে করি, বাপের সম্পত্তির ওপর আমার অরুচি হওয়া উচিত। প্রচুর গরিব দুঃখীকে ঠকিয়ে বাবা ঐ সম্পত্তি করেছে।

—তবে ভয় পাচ্ছ কেন? রাজিয়া বাড়ি দখল করলে, তোমার তো দুঃখ পাওয়া উচিত না। তবু ফের বলছি, তুমি বঞ্চিত হবে না। ফাঁকি মেকি চালাকির ফরমূলা মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজিয়া বোল্ড আউট হলে চোখের পানি ফেলার লোকও সীতাহাটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—বলছ?

—নিশ্চয়ই বলছি। মেয়েদের ব্যাপারে তোমার বাপের কিছু নিকৃষ্ট অনুভূতি ছিল। খালাসের ঘটনাটার মধ্যে আমি সেটা দেখেছি। প্রত্যক্ষ করেছি বলতে পারো। সেটা একটা প্রমাণ বলতে পার। অবশ্য তোমার বাপ যে রাজিয়াকে খুব মারাত্মক ভালবেসেছিলেন, ঐ ঘটনায় বাস্তবিক তা অস্বীকার করার জো নেই। তথাপি…

এই কথায় হঠাৎ কেন যেন মিল্লাত চুপ করে গেল। নিচু গলায় শুধাল, কী সেটা?

মবিন এক ফোঁটা দম নিয়ে বলল, খালাস আর তালাক, এই টার্ম দুটি কিন্তু আলাদা। অনেকে এই দুটি কথাকে এক মনে করে। আমিও তাই করতাম। তুমি কিছু জানো?

মিল্লাত বলল, মুসলমানদের কত কথাই আমি বুঝি না মবিন। তালাকটা বুঝি। ওটা না বোঝার কিছু নেই। অহরহ দেখতে শুনতে পাই। কিন্তু খালাস কথাটা শুনেছি। পার্থক্য বুঝি না। শুনে তো একই কথা মনে হয়।

মবিন বলল, না। একদম না। পার্থক্য প্রচুর। দুটিই মুক্তি। কিন্তু দুই মুক্তি দু'রকমের। গভীর পার্থক্য আছে। তালাক হল, বিচ্ছিন্ন হওয়া। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া। আর খালাস হল, সম্পর্ককে মেনে নিয়েই মুক্তি দাবী করা। আমি সেই দিনের ঘটনায় বুঝেছিলাম। মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর উচিত স্ত্রীকে খালাস দেওয়া।

মবিন নিঃশব্দ হাসল। বলল, আমিই কি জানতাম? লোকে শুনেছিল, আমিও শুনেছিলাম, রাজিয়া খালাস চাইছে। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম, তাতে করে এখনও আমার মনে হয়, রাজিয়া বুড়োর কাছে তালাকই চাইছিল। তুমি সিগারেট খাবে না?

অবসন্নতার সময় মানুষ সিগারেট খায়। মবিন কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মবিন নিজে সিগারেট খায় না বলে মিল্লাতকে যেন বা অনুরোধ করছিল। মিল্লাত মবিনের মনোভাব বুঝে হেসে ফেলে পকেট থেকে প্যাকেট বার করে ধরিয়ে নিল। মবিন উড়ন্ত ধোঁয়ার জটলার দিকে চোখ রেখে কথা বলে চলল, বলছিলাম দুটি জিনিস আলাদা। খালাস হলে ইহলৌকিক মুক্তি। পারলৌকিক বিচ্ছেদ নয়। তালাক কিন্তু ইহলোক পরলোক সবখান থেকে বিচ্ছেদ। চির-বিচ্ছেদ।

—ও! মিল্লাতের গলায় অস্ফুট শব্দ হল।

মবিন বলল, হিন্দু-বিধবার সঙ্গে মুসলমান বিধবার এখানেই তফাত করেছে ইসলাম। কিন্তু ব্রেকটা খুব সামান্য। সেখানেও মস্ত জটিলতা আছে। রাজিয়ার ঘটনার মধ্যে সেই জটিলতা ছিল।

মিল্লাত বলল, রাজিয়া কিন্তু খালাসের কথাই বলছিল!

মবিন বলল, হ্যাঁ, ও তো সেই কথাই বলবে। কিন্তু আসলে সে তালাকই চাইছিল। বারবার খালাস খালাস করছি ঠিকই। তার চাওয়ার আকৃতি ছিল অন্যরকম। তুমি শুনলে বুঝতে পারতে। ও যেরকম করে কেঁদে কেঁদে তোমার বাপের পায়ে লুটিয়ে যাচ্ছিল, বারবার বলছিল, তুমি চলে যাচ্ছ, কিছুই এই দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারছ না। আমায় ফেলে রেখে যাচ্ছ। আমায় খালাস দিয়ে যাও। আমি আর কিচ্ছু চাই না।...

একটু থামল মবিন। ঢোক গিলে ঠোঁটের উপর আলতো করে হাত চাপা দিল। কপালে ওর দুতিনটি ভাঁজ পড়েছে এখন। চোখের কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাঁকা হয়ে সীতাহাটির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। রাজিয়া হাজীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আছে। মবিন বলল, এই যে আমি আর কিচ্ছু চাই না, এই আর্তনাদ তুমি শোননি। কী মর্মান্তিক! আমার তক্ষুনি মনে হল, মেয়েটা বিচ্ছেদ চাইছে। মনের সম্পূর্ণ বাঁধন কেটে দিতে চাইছে। কেমন? একদিন গোপনে টিপছাপ করে, যদিও হাজী সই দিতে পারতেন, তবে বোধহয়, হাত কাঁপত বলে শুনেছি, সেই টিপছাপ করে ওদের তালাক হয়েছিল। বুড়োর ওপর জোর জবরদস্তির তালাক। রাজিয়ার ভাইয়েরা করিয়েছিল বলে শোনা। কী রহস্য জানি না। একটা বিপাক মতন ছিল, গণ্ডগোল হয়েছিল। সমাজে সেটার, ঐ ঘটনার, তুমি যে বললে সবুদ, সেটা ছিল না।

—সে কি! মিল্লাত অস্ফুট আর্ত শব্দ করল।

—হ্যাঁ। সেই রকমই শুনেছিলাম। তা, সেই টিপছাপের গোপন তালাককে

রাজিয়া সেদিন ঐ অবস্থায়, তোমার বাপের মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল।

—অদ্ভুত! মন্তব্য করে উঠল মিল্লাতের কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ! খুবই আশ্চর্যের! রাজিয়ার মধ্যে কী হচ্ছিল, কী রকম কান্নাকাটি চলছিল, মানুষ কী বুঝবে? কেবল বিশ্বাসজী, তোমার বাবা ধরতে পেরেছিলেন। সেটা তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর একেবারে কোলে মাথা রেখে ফুঁসে উঠলেন তোমার বাপ। খালাস নাই। দিব না মুই। না রে নাঃ দিব না। সেই রাতে যা দিলি নে মালকিন, সেই ভুখ নিয়ে মরলাম, আল্লাজী তোর কসুর যেন মাফ না দ্যান, এই মোনাজাত। পুলসেরাত তোকে কে পার করে, দেখব একবার। তুই খালাস পাবি না।

ঘটনা বলা শেষ হয়েছিল কি মবিনের? মিল্লাত সিগারেট টানা বন্ধ করে মবিনের চোখে চেয়েছিল। এবার আস্তে করে একটু টেনে মাটিতে ফেলে দিল। মবিন তখন বলে উঠল, বুঝলে ব্যাপারখানা? রাজিয়ার সঙ্গে তোমার বাপের কোনই সম্পর্ক ছিল না। ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। সীতাহাটি বৈদ্যবাটির সমস্ত মানুষ মনে মনে একথা জানে। কিন্তু তবুও ওরা স্বামী-স্ত্রী।

—কেন? মিল্লাত প্রশ্ন করল।

মবিন বলল, কারণ সেই মানুষই আবার তাদের স্বামী-স্ত্রী মনে করে।

—কেন? আবার প্রশ্ন মিল্লাতের।

মবিন বলে, আমার যে দিশেহারা ভাব, সেটা এই কথা ভেবে যে, শুধু একটা কালমার কী জোর! কোরানের আয়াত কী অসম্ভব শক্তিশালী! এইজন্যই ধর্মের ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা হয়, জানো! ভয় করি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মবিন বেঞ্চ থেকে নেমে পড়ল। পায়ে চটি গলিয়ে সাইকেল উঠিয়ে নিল। তারপর বলল, তুমি কোনদিনই বাপের ঘটনা জানতে চাওনি। তোমার এখন সেকথা জানার সময় হয়েছে। তোমার হয়ত শুনে খুব খারাপ লাগবে, সবার তাই লেগেছিল, রাজিয়া তোমার বাপের মৃত্যুর দিন, খুব সুন্দর করে সেজেছিল কেন? সবাই মেয়েটাকে থুতু দিচ্ছিল, আমার কিন্তু ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। কাঁচা বয়েস, কিন্তু মেয়েটি হিন্দু বিধবার মতন দুঃখী।

মিল্লাত মবিনের একখানা হাত খপ্ করে মুঠিতে চেপে ধরল অসহায়ের মতো। ভীষণ একটা দরদ-ভরা স্পর্শ মবিনকে ছুঁয়ে গেল। মবিন শুধাল, গোড়ায় তুমি কী একটা কথা বলতে চেয়েছিলে?

না। থাক। পরে বলব, পরে একদিন বলব তোমাকে। বলেই মিল্লাত

মবিনের হাত ছেড়ে পথের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মবিনের সাইকেলের ঘণ্টি বেজে উঠল পথে।

॥ তিন ॥

খালাস হয়নি। ফের ওরা স্বামী-স্তরী ছিল না, আবার স্বামী-স্ত্রীও বটে। অন্তত লোকে তাই মনে করে। ভাববার মতন কথা। খালাস আর তালাক এক কথা নয়। হিন্দু বিধবা মুসলমান বিধবা এক নয়। এই দুই বৈধব্যের মাঝে ছেদ আছে। খালাস হল ইহলৌকিক মুক্তি, পারলৌকিক বিচ্ছেদ নয়। সত্যিই চিন্তার কথা। রাজিয়া খালাস নয়, তালাক চেয়েছিল। কৌতূহল হচ্ছে, সেই মেয়ের মনের অবস্থাটা আজ কেমন আছে। মিল্লাত ভেবেছে সারারাত একপ্রকার। ভাল মতন ঘুমাতে পারেনি। ঘুম চটে চটে গেছে চিন্তার গোপন ফল্গু আঘাতে। সকালেও মনে হচ্ছিল, রাজিয়াকে কিঞ্চিৎ ক্ষমা ও করুণা করা উচিত। ফের রাজিয়ার লোভকে ঘৃণায় বিদ্ধ করাও সমীচীন। রাত্রে কিছু খায়নি মিল্লাত এ-বাড়ির। হোটেলে খেয়ে বাড়ি ঢুকেছিল। বাড়ি ঢুকে সোজা বিছানায়। বাইরে রাজিয়া বারবার তাকে ডেকেছে। খেয়ে নেওয়ার জন্যে বেশ কবার পীড়িত করেছে। মিল্লাত সাড়া দেয়নি।

আজ ভোরে দরজা খুলে দিল মিল্লাত। ট্রে হাতে করে রাজিয়া খুব সহজ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে এল। টেবিলে রাখল প্লেট আর কাপ সাজানো পাত্রখানি। এত ভোরেই স্নান করে নিয়েছে রাজিয়া। ভেজা চুলে বাসি জবা কুসুমের গন্ধ, মুখে কোন ভারতীয় স্নো বা ক্রীমের মিষ্টি সুরভি। কপালে লাল বড় গোলাকার টিপ। পরনে তাঁতের শাড়ি। গলায় কলারের ব্লাউজ, কনুই অব্দি লম্বা হাত। লক্ষ করবার ব্যাপার, রাজিয়া সব সময় কনুই অব্দি ঢাকা হাত ব্লাউজ পরে। হাফ হাত বা হাত-কাটা ব্লাউজ তার নেই। হাত-কাটা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কনুই অব্দি ঢাকা ব্লাউজও তার এক ভব্যতার পরিচয়। রাজিয়া রুটি আর হালুয়ার প্লেট নামিয়ে দিয়ে বলল, চট করে মুখ ধুয়ে এসো। চা জুড়িয়ে যাবে। স্নান করার সময় ভাল করে দাঁত মেজে নিও। অল্প করে খাও। দুখানা পাতলা রুটি খেতে অসুবিধা হবে না। নইলে পেটে পিত্তি পড়বে। রাত্রে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লে, কত ডাকলাম সাড়া দিলে না। এভাবে দুজনে শত্রুতা করে একই বাড়িতে থাকা যায় কিনা তোমাকে ভেবে দেখতে হবে।

কথা শুনে মিল্লাতের শিরদাঁড়া শক্ত আর সটান হয়ে গেল মুহূর্তে। কথা শেষ করেই রাজিয়া ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল মিল্লাত। এই

ভোর বেলাতেই তার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। বাথরুমে এসে ব্রাশ-পেস্ট ঠিক করে আনমনা দাঁত ঘষতে থাকল। মনে মনে ভাবল, আজই যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়, তবে কোথায় গিয়ে উঠবে সে ? খেতে দিযে এভাবে অপমান ? এত বড় অশ্লীল ঘটনার নিরসন কীভাবে সম্ভব ? একটু বাদেই রাজিয়ার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, তখন যে বললাম অল্প করে মুখ ধুযে এসো, কতক্ষণ ঐভাবে দাঁত ঘষবে, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !

মিল্লাত সচেতন হয। মুখ ধুয়ে ফেলে বাথরুমে ছেড়ে আসে। তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে স্থির করে নেয়, রাজিয়াব সঙ্গে কথা কিছু বলে নেবে কিনা। হ্যাঁ নেবে। ডাক দেয়, শোন এদিকে। শুনে যাও।

রাজিয়া এসে সামনে দাঁড়ায়। শুধায়, তুমি এখনও শুরু করনি ?

মিল্লাত বলে, না। শুরু করা যাচ্ছে না। তোমার সঙ্গে পস্টাপস্টি দুটি কথা হওয়া দরকার।

রাজিয়া বলল, আগে খেয়ে নাও, তাবপর কথা হবে। নাও, শুরু কর। দেরি করো না।

রাজিয়া তার স্পষ্ট করে দুটি চোখ মেলে মিল্লাতের মুখে চাইল। মিল্লাত আজ এই মুহূর্তে প্রথমবার বেশ মনোযোগ দিয়ে রাজিয়াকে চেয়ে দেখে। বাস্তবিক সুন্দরী রাজিয়া। ভেজা চুলে বেশি মাত্রায় স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। কানে এক জোড়া সোনার দুল, নাকে আছে সাদা পাথর। গলায় সুবর্ণ চেন। হাতে দুটি করে চারটি সোনার চুড়ি। নাকে পাথর থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাধুনিক গ্রাম্য মনে হয় না। বরং আরো আলোকিত দেখায়। মিল্লাত ভেবে পায় না, নাকের পাথরখানি এত দৃষ্টি-নন্দিত হয়ে ওঠে চেহারার কোন্ সামঞ্জস্যে ? পাথরগত কারণেই কি রাজিয়াকে বেশি ভারিক্কি আর গভীর মনে হচ্ছে ? হঠাৎ মনে হল, ইনি আমার বাপের বউ। এবং সঙ্গে সঙ্গে মিল্লাতের দুই চোখ রাজিয়ার চোখ থেকে খাবারের ট্রেতে নিবদ্ধ হয়। মিল্লাত সচেতন হয়ে ওঠে। বলে, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পরশুর আগের দিন যখন এলে তোমরা, খুব উত্তেজিত অবস্থা আমারও, ফলে বলা হয়নি, আমায় দিনকতক সময় দিতে হবে। যদ্দিন একটা বাড়িভাড়া না পাচ্ছি, আমি কোথায় যাব ? সমস্ত বাড়িখানাই ছেড়ে দিয়েছি বলা মাত্র। আমি সত্যিই খারাপ লোক নই, তুমি মবিনকে শুধিয়ে দেখতে পারো, মবিন আমার বন্ধু। তাছাড়া আমরা তো আত্মীয় বটে। আচ্ছা, সেকথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ আজকাল আত্মীয়রাই বেশি ক্ষতি করে, অন্তত বিধবাদের আত্মীয়রাই ঠকায়। তাই তোমার আমার রিলেশন ছেড়েই দিচ্ছি। আ:সলে স্বার্থের বেলা সৎ

মা শত্রুই হয়, সৎ ছেলেও দুশমনি করে। গাঁ-ঘরের সেটা একটা রেওয়াজ। আমি তাই অন্যকথা বলছিলাম।

বলতে বলতে চেয়ারে বসে পড়ে মিল্লাত রুটি ছেঁড়ে। দু আঙুলে ভাঁজ করে ভাঁজের মধ্যে হালুয়া ঠেসে নিয়ে মুখে ফেলে বারকতক নাড়াচাড়া করে গিলে ফেলে বলল, দ্যাখ, আমার একটা বদনাম আছে। আমি মিষ্টি করে কথা বলতে পারি না। খুব চাঁছাচোলা কথা বলতেই আরাম পাই। এখানে আমি থাকব না। থাকা যায় না। খুব কড়া করেই বলছি, তোমার বাড়ি, তোমাদের বাড়িতে, আমি থাকতে পারব না। অতএব তোমার ভয় নেই। আমার নিজস্ব কিছু নিষ্ঠুরতা আছে, সেই নিষ্ঠুরতাই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। একটা বাড়ি খুঁজে পেতে যা দেরি।

রাজিয়া শুধাল, এটা আমার বাড়ি আজ সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এ-বাড়ি তো আর কারো নয়। তোমাদের বাড়ি মানে কী ? আমার ভাইয়েরা তোমায় কোন উপদ্রব করবে না,একথা তাদের সঙ্গে কবুল করে নিয়েছি। আমার লোভ আছে, কিন্তু লোভের হ্যাংলামি পছন্দ করি না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি খুঁজতে পারো, আমি খোঁটা দেব না। তুমি নির্মম সেকথা আমারও কিঞ্চিৎ জানা আছে। নাও। খেয়ে নাও।

রাজিয়ার কথায় অপূর্ব গভীরতা আর গাম্ভীর্য লক্ষ করে মিল্লাত থমকে যায়। রুটির শেষ খণ্ডটুকু হাতে ধরে থাকে। পরে মুখে ফেলে দিয়ে চিবিয়ে নেয়। জল খায় গেলাস থেকে। একটুখানি করে গেলাসের মধ্যেই হাত ধুয়ে ফেলে। রাজিয়া চিনি চা দুধ মিশিয়ে কাপটা একটু ঠেলে দেয় মিল্লাতের হাতের কাছে। মিল্লাত চায়ে চুমুক দিয়ে পাতলা হেসে নিয়ে বলে, আমি যে নির্মম সেকথা তুমি কিঞ্চিতই জানো, নইলে কথা ধরতে পারতে। আমার বলার অনেক কথাই আছে, সেসব তোমার ভাল লাগবে না। এই বাড়িখানা একজন হাজী সাহেবের, তাই 'তোমাদের' করে বলেছি, সেখানে থাকা মানে, তোমাদের সম্পর্ক মেনে নেওয়া। আমি এই সম্পর্ক মানি না। আাই হেট দিস ম্যারেজ। আর তুমি হ্যাংলা কিনা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে। তুমি মুমূর্ষু বাপের কাছে খালাস চাইতে গিয়েছিলে, তুমি নিজেই গতকাল বলেছ, তুমি খালাস পাওনি। আর পাওনি বলেই এই বাড়িখানা তোমার দরকার। হ্যাঁ এটা যুক্তি বটে। কিন্তু খালাস পেলেও এ-বাড়ি তুমি চাইতে। শহরে এরকম একখানা বাড়ির প্রচুর দাম। চা খাওয়া শেষ করে দ্রুত ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে ওঠে মিল্লাত। সহসা রাজিয়া মিল্লাতের একখানা হাত চেপে ধরে বলে, দাঁড়াও। যেতে পাবে না। কথা এখনও পস্টাপস্টি কিছুই

হয়নি। চৌকিতে বসে থাকো। এ-ঘরখানার ভাড়া কত দেবে? কারা এখানকার ভাড়াটে কিছুই জানি না।

মিল্লাত চৌকিতে বসে পড়ে বলল, তোমার বাড়ি। সবই জানতে পারবে। আমি ভাড়াটেদের বলে দেব। আর এটা গুমোট ঘর। ফ্যান নেই। চল্লিশ টাকা ভাড়া দেব এবার আমি যেতে পারি?

—কোথায় যাবে? রাজিয়া প্রশ্ন করে। মিল্লাত হেসে ফেলল নিঃশব্দে। বলল, কৈফিয়ত চাইছ মনে হচ্ছে? রাজিয়া উত্তর করল, না। কৈফিয়ৎ চাওয়ার কোন অধিকার আমার নেই। সেটা তুমি স্বীকারও করলে না। ভালই হয়েছে। তার জন্য আমি দুঃখিতও নই। কিন্তু জানি না কেন, বাইরে গিয়ে খেয়ে আসছ, এটা আমার ভাল লাগছে না। মেয়েদের কিছু হ্যাংলামী তো থাকেই। আমার এটা হ্যাংলামী। লোক-দেখানো একটা আত্মীয়তা তো আছেই আমাদের। সেটা না হয় বাদই দিলাম। তথাপি একটা হ্যাংলামীর সুযোগ আমি চাইছি। দেবে না? দু'দুবার খেয়ে ফেলেছ, অপমান যা হবার হয়ে গেছে তোমার। এখন, আমারও একটু অন্য কথা আছে। তোমার একটা অন্য কথা বলার ছিল। সেটা কী?

মিল্লাত বলল, সেকথা হয়ে গেছে। ভাড়ার কথা। আমি চাইছিলাম, আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া ভাল। যেমন টাকা-পয়সার সম্পর্ক। মালিক আর ভাড়াটের সম্পর্ক। স্বাভাবিক এবং ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাদের নির্লজ্জ হওয়াই ভাল, সেইটে হলেই এখানে আমার থাকা চলে। কোন হ্যাংলামীই এই অবস্থায় সুন্দর নয়।

রাজিয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল, তাই হবে। তুমি আমার পেয়িংগেস্ট। তোমার আমার সম্পর্কের মতোই পেয়িংগেস্ট কথাটাও অশ্লীল। কিন্তু এই অবস্থায় ভাল মানায়। তবে এই মুহূর্তে আরো একটি অশ্লীল কথা আমার মনে পড়ছে মিল্লাত। শুনবে? ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে রাজিয়া থেমে পড়ে বলল, তোমার বাপ আমায় আচমকা একদিন বিয়ে করল। বদনা হাতে মাঠ সারতে গিয়ে মাঠ পেরিয়ে আমাদের গাঁয়ে এল সকালবেলায়। রাত্রে বিয়ে হল। তার আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কথা উঠেছিল। তুলেছিল, তোমার দাদী। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এসে আমার থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে ভারি পছন্দ করে বলত, এটা আমার মিল্লাতের গিন্নি। তোমার দাদীর মতন হ্যাংলা মেয়ে দু'চোখে দেখিনি কখনও।

রাজিয়া একবার অপাঙ্গে মিল্লাতকে চেয়ে দেখে দ্রুত অন্যদিকে চলে গেল।

মিল্লাতের চোখে মুখে কে যেন এক দোয়াত কালো কালি নিংড়ে ঢেলে দিয়ে গেল। মিল্লাত অস্ফুট ইংরাজিতে উচ্চারণ করল, কী বিস্ময়কর! কী অদ্ভুত!

বদনা হাতে করে মাঠ সারতে গিয়েছিল বাবা। হাজী নিসার হোসেন। অদ্ভুত সেই সকালবেলা। বিস্ময়কর তার সেই বিবাহ-যাত্রা। পরে একদিন মাবুদ সেই সংবাদ বহন করে এই শহরের বাড়িতে এসেছিল। পাঠিয়ে ছিল নবীনা। মনে পড়ছে।...

মনে পড়ছে। কী উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল মাবুদকে। সুখী। ভার-মুক্ত। শুধু তাই নয়। বিপদ বালাই মুক্ত, পরম প্রসন্ন; একটা ভাল কথা, মজার কথা শোনাতে পারার শান্ত আলোক চোখে মুখে মৃদু মৃদু চমকাচ্ছিল। মিল্লাত গুমোট-ঘর ছেড়ে দোতলার মাঝের ঘর, যেখানে এতদিন বাস করেছে সে, এখন যে-ঘর রাজিয়ার দখলে, সেই ঘরের কেন্দ্রে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। দু'চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মনে মনে বলল, এখানে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিল মাবুদ।

ঘরখানি তেমনি সাজানো আছে। দেয়ালের গা-আলমারিতে বইগুলি আগের মতনই সুসজ্জিত। কেবল খাটের মাঝখানে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাগুলি। রাজিয়া পড়াশুনা করেছে বোঝা যায়, শিক্ষিতা মেয়ে। বাংলা ভাষা খুব সুন্দর বলতে পারে। কিন্তু কতখানি শিক্ষার আলো পেয়েছে কে জানে! গাঁয়ে-ঘরে স্কুলফাইনাল পাশ মেয়েদের মুসলমান পরিবারে যথেষ্ট শিক্ষিত ধরা হয়। বাপের বিয়ের সময় রাজিয়া কি স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল? তা যদি করে থাকে, তবে তো ঘটনা স্বাভাবিক ছিল না। একজন বৃদ্ধকে কেন বিয়ে করতে রাজী হল? রাজিয়ার অভিভাবক কারা? তারা কি সব বেকুফ বান্দা? মেয়েটিই বা এত কচি কাজ করেছিল কিসের ধন্দে? তারপর টিপছাপই বা হল কেন? হলই যদি তবে ফের খালাস চাওয়ার চড়া নাটক সেদিন মৃত্যুলগ্নে কেন অভিনয়? দেওয়ালের ক্যালেন্ডারে চাইল মিল্লাত। খাজুরাহোর ভাস্কর্যের মিথুন মূর্তির নগ্নতা। দেওয়ালে কাবাঘরের মুসলমানী ফোটো নেই। আছে সরস্বতীর বীণাবাদিনী রূপে অধিষ্ঠান। এ-ঘর নামাজ পড়ার উপযুক্ত নয়। রাজিয়া কি নামাজ পড়ে? রাজিয়া কি রোজা রাখে? এই ঘরখানিকে কি তার সুন্দর মনে হয়? অসুন্দর মনে হয়? এই যে বলা হল, সম্পর্ক অশ্লীল, এ-কথা তার চৈতন্যে কী ছায়া ফেলেছে? দেওয়ালে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে দেখে তার কী মনে হয়েছে? তাকে যে হ্যাংলা বলা হল, তার কী

প্রতিক্রিয়া ? প্রতিক্রিয়া যে হয়েছে, সেই উচ্চারণও ধন্দময় । দাদী যে আল্হাদ করেছিল, সেখানে হ্যাংলামীর পরিচয় কী ছিল ? দাদীর সাধ ও আকাঙ্ক্ষা কি আজ রাজিয়ার কাছে বিষম বিদ্রূপ ? পেয়িংগেস্ট । জবাব হয় না কথাটার । হায় ! জবাব হয় না । এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল মাবুদ ।

—বাপজী মিলাত । বাপধন গো ! নেসার ভাইজান সাদী করেছে বৈদ্যবাটির পছিম পাড়ায় । মেয়্যা সুন্দরী । উপবতী (রূপবতী) । নেকাপড়ায় দুরন্ত । সব্বোনাশের থৈ থাকল না বাপজী । মিনি ম্যাঘে বাজ পড়ল পছিম পাড়ায় । আমার সংসার বেঁচে গেল বাবা রে ! খেতে দিতে না পারি, তবো আপন বউরে মনিবের হাতে তুলে দেয়া যায়, হাজেরাকে তালাক দিতে পারি ? কহেন বাপজী !

মিল্লাত গম্ভীর গলায় জবাব করল, ঐসব কেচ্ছা শুনাতেই কি শহরে এসেছ ? হাজেরা ফুপু পাঠিয়েছে ? ফিরে যাও ।

মাবুদ এই মেঝের মধ্যবিন্দুতে এসে থমকে গেল । তারপর মিল্লাতের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে শিশুর মতন শুকনো চোখে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল । মাবুদ অমন করে কেঁদে ফেলল কেন ? অত খুশিখুশি অবস্থার পর হঠাৎ কথা বলতে বলতে মুখ কালো করে কেঁদে ফেলা কেন ? এই কান্নাও কি সুখের ছিল তখন ? নাকি পছিম পাড়া পুড়ে গেল বলে তার বাস্তবিক কান্না পেয়েছিল ?

নবীনা চিঠিতে লিখেছিল । এক পক্ষে রাজিয়াকে বিয়ে করে আব্বাজী ভালই করলেন । একটা সংসার বেঁচে গেল । হাজেরা ফুপু ঘোড়াপীরের থানে মানত করেছিল । খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন ।

অসহ্য ! এই চিঠিও সওয়া যায় না । নবীনা লিখেছিল, আমরা কী করতে পারি ? তুমি গাঁয়ে থাকলেই কি এই বিয়ে রোখা যেত ? পারতে না । বিয়ের আগেই যে তুমি পালিয়ে গেলে, সেটা এক প্রকার ভালই হয়েছে । আমি বলব, তুমি কখনও আর গাঁয়ে ফিরে এসো না । রাজিয়া বিয়ের পর, আমাদের এখানে তিনদিন ছিল । তখনকার কথা চিঠিতে লেখা চলে না । শুধু শুনে রাখো, আব্বাজী কয়লার আগুনে ওর কনুই পুড়িয়ে দিয়েছে, ফোস্কা হয়েছিল, দাগ পড়ে গেছে । ছিঃ !

অসহ্য ! এ-চিঠি পড়া যায় না । মাবুদের ন্যাকামী শোনা যায় না । শকুনের মতন শুকনো গলায় কাঁদে কেন লোকটা ? একটা কেঁচো !

নিসার হোসেন বলেছিলেন, হাজেরাকে তুই তালাক দে মাবুদ । খেতে দিতে পারিস না, মুই তারে শাদী বসাই । তালাক দিলে তোকে দু'বিঘা ধানী জমি দিব ।

পরে অবস্থা ফিরলে, একটা কচিমতন নিকে করিস, আমি ব্যবস্থা করব। দ্যাখ্ বেকুফ, গত দুই সন অজন্মা, এ-বছরও শুখা শুখা। বালবাচ্চা মাটি চেটে থাকবে, বছর-বিয়োনী মেয়ে, দাঁড়াস সাপ। তোকে গিলে খাবে মাবুদ।

মাবুদ নিসার হোসেনের জোত-জমির আগলদার, বাঁধা কিষেন। মাসিক দরমাহা (বেতন) একটা ছিল, কিন্তু সেই হিসাব মনিব আর আগলদার ছাড়া কেউ জানত না। মাঠের ফসল পাহারা দেওয়ার সুবাদে কিছু কিছু ধান পাট গম হাত-তোলা পেত মাবুদ। সবজি তরকারিও ভুঁই থেকে তুলে নিত বিবেচনা মতো। কখনও এমন সাহস তার ছিল না যে গোপনে ফসল সবজি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেকে 'বড়লোক' করে তুলতে পারে। বেল কলা পুকুরের মাছ ইত্যাদিরও তদারকি তার। শোনা যেত, কলা বেল মাছের একটা নির্দিষ্ট ভাগ মাবুদের প্রাপ্য। মাবুদ জাল ফেলে মাছ ধরত। কলার গাছ লাগান করত। মুনিশ জোগাড় করত। সবই তার তদারকি। মাছের পোনা, নিসার হোসেনের অনুমতি নামমাত্র, টাকা কত লাগে না লাগে মাবুদই হিসাব রাখত, আর পাঁচটা কেনাকাটার বেলা যেমন হয় তেমনি, পণ পণ পোনা কিনে নিত রসিপুরের সেখেদের কাছে। পুকুরে ছাড়ত। তা সত্ত্বেও তার ভাগ কখনও আসলে নির্দিষ্ট ছিল না। সবই ছিল নিসার হোসেনের ইচ্ছামত হাততোলা। যা পেত, তাতেই সন্তুষ্ট ছিল মাবুদ। মাবুদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত খাটো। বোধহয় সে কখনও 'বড়লোক' হওয়ার স্বপ্নই দেখেনি। কিছু মানুষ কখনও 'বড়লোক' হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। নিসারের প্রতি বিশ্বস্ততা তার দারিদ্র্যের মতনই স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে সে কাঁচি সিগারেট আনতে যেত শহর থেকে এককালে। মনিব অন্য সিগারেট খেতেন না। মনিব মাবুদকেও মাঝে মিশেলে বিড়ির সাথে দু' পাঁচটা কাঁচি খেতে দিতেন। সেই সময় মাবুদের চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাত। মনিবের সঙ্গে মাবুদের সম্পর্ক ছিল খোদার সঙ্গে বান্দার অতিপ্রাকৃত সম্পর্কের মতন নিবিড়। আপাতচোখে সেটাকে বন্ধুত্ব বলে মনে হত। বাড়ির লোক ভাবত, ওরা দু'জন বন্ধু। অবিশ্যি বন্ধুত্বই বটে। খোদার সঙ্গে হজরত নবীর যেমন বন্ধুত্ব। পূর্ণ সমর্পণের সম্পর্ক-সিদ্ধ বন্ধুত্ব। আল্লাহ্ হজরতের দোস্ত। নবীই বলেছিলেন, খোদা তাঁর দোস্ত। অতএব দোস্তের কাছে সব কিছুই সম্পূর্ণ সমর্পণ করা যায়। সেই সমর্পণের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তেমনি এক বন্ধুত্বই কি গড়ে উঠেছিল মাবুদ আর নিসারের ? মিল্লাত জানত, নিসারের কাছে মাবুদের অদেয় কিছু নেই। অদেয় কিছু নেই বলেই কি সব কেড়ে নিতে হবে। নিসার হোসেন এমন করে চাইবেন মাবুদ কি ভাবতে পেরেছিল ?

ভাল করে কোন কথাই জানা হয়নি। দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিল নবীনা আর মিল্লাত। সেই হিসেবে তাবৎ পরিবার একটি সিদ্ধান্তের নিকটবর্তী হচ্ছিল ক্রমশ। কী হবে ? ধীরে ধীরে ঘটনার গতিধারা এমন হয়ে উঠল যে, নিসার হোসেনের চাহিদাকে মেনে না নিলে মাবুদের কপাল ভাঙে। নিসার হোসেন প্রথম মাবুদকে দিয়ে বড়গিন্নির কাছে তাঁর চতুর্থ বিবাহের সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ আরো দুটি বিবাহ তিনি এই ভাবেই প্রথমা পত্নীর স্বীকৃতি নিয়েই সম্পন্ন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে না-করার মতন সাহস প্রথমা পত্নীর নেই। কখনও কোন পত্নীরই কি থাকে ? নবীর সুন্নতে হস্তক্ষেপ করার ধর্ম-বিরুদ্ধ মনস্কামনা থাকতে নেই কুত্রাপি। সেকথা নিসার হোসেন জানতেন। তথাপি যেন তিনি প্রথমা পত্নীর কাছে প্রশ্রয় চাইছেন এমন একটা নিরীহ ভাব করতেন। প্রথমা পত্নী সকলকে ডেকে হাজী সাহেবের সদিচ্ছার কথা জানালেন। সকলেই শুনল। কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। তখন সবাইকে উঠে চলে যেতে দেখে কুলশম বিবি বললেন, তোমরা কেউ কোন কথা বলছ না, এরপর কেউ কোন অশান্তি করো না। নতুন বউ যখন আসবে, তার মান্যতা তোমাদেরই। মিল্লাত নেই, ওর মতামত জানা গেল না। আদিল ওকে বুঝিয়ে বলবে, যার যা ধর্ম যদি সয়, তবে তাকে মেনে নেওয়াই মানুষের পরহেজগারী। মিল্লাত গোল করলে হাজী সাহেবের অসম্মান হয়, খানদানেরও বেইজ্জতী হবে। ওকে বুঝ দেওয়ার দায়িত্ব আদিল নেবে।

আদিল কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে বাটার ঢাকনা তুলে পান সাজতে বসলেন। লুঙ্গির কোমরে তিনটে পান গুঁজে, একটা পান গালে ফেলে দাউলি হাতে মাথায় মাথাল বসিয়ে নিয়ে খেত-খামারের দিকে নিঃশব্দে চলে যেতে লাগলেন। নবীনা এক বুকের দুধ বাচ্চাকে পান করতে দিয়ে অন্যমনস্ক বসেছিল। বাচ্চাটা সহসা মৃদু দংশন করতেই 'আহ্' করে মুখে শব্দ করে নবীনা বাচ্চাকে টেনে বুক থেকে ছাড়িয়ে ফেলে দুম্ দুম্ করে পিঠে গোটাকতক কিল বসিয়ে দিয়ে বাচ্চার গাল দুটি আঙুলে খামচে ধরল। শুধু মুখে চাপা ক্রুদ্ধ আর্তনাদ, শয়তানটা খালি বদমায়েসী করে।

তারপর ফের মার দেয়। মুখ খামচায়। কুলশম বিবি চোখের কোণে দৃষ্টি হেনে লক্ষ করলেন, নবীনার চোখমুখ চাপা ক্রোধে স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। ঐ ধারা কিল মারার মতন যন্ত্রণাদায়ক বেয়াদপি শিশু করেনি। 'আঃ' উচ্চারণেই দাঁতের দংশানির চোট বোঝা যায়।...

তারপর মাবুদ একদিন জানিয়ে গেল—কনে দেখা হয়্যাছে বড় ভাবী। বৈদ্যবাটির পছিম পাড়ার মেয়্যা, নানী মায়ের সংসারে জ্বালাপুড়ার দুঃখী অভাবী জিন্দেগী। নেকাপড়ায় তেজি মাথা। কিন্তুক কপালে হাড় না গোস্ত বুঝা যায় না। নসীব।

বাড়ির মধ্যে এইসব আন্দোলন চলতে থাকে। মিল্লাতের কানে তখনও সেই রব স্পষ্ট হয়ে পৌঁছায় না। বাপ যে ফের বিয়ে করতে পারেন, মিল্লাত ভাবতে পারেনি, চিন্তাটা মাথায় কখনও সামান্যও ধাক্কা দেয়নি। ফলে সে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু সব খবর যখন চূড়ান্ত মুহূর্তে তার কানে তৈরি হয়ে এল, তখন সমগ্র বিষয় রীতিমত জটিল, ভয়ংকর। কলেজে ছুটির মাস চলছে তখন।

নবীনা একা। ঠিক যেভাবে সে ক্রুদ্ধ অপমানিত এবং একলা একলা তার সঠিক মরমী কেউ নেই। ক্লাস নাইন অব্দি পড়াশুনা করলে কী হয়, তার চেতনার স্তর এ-সংসারে বেমানান। কেবল দ্বিতীয় পক্ষের ভাই মিল্লাতই তার অসহায়তা বুঝতে পারে। বাকিরা সকলেই অশিক্ষিত, সত্যিকার চাষী। বাপের বহুবিবাহ বিষয়ে তাদের যথার্থ কোন যন্ত্রণা আছে বলে মনে হয় না। তাদের ভয় সংসার বৃদ্ধি আর জমি ভাগের সংকটে সীমাবদ্ধ। বাড়তি কোন মানসিক বেদনা নেই। একটা শিক্ষিতা মেয়ে একজন বৃদ্ধের সংসারে কীভাবে জীবন কাটাবে বলতে বড়জোড় একখানি যোড়শী দেহকে বুঝায়, ভেতরের মনকে গণ্য করা হয় না। ফলে ওরা বিমর্ষ হয় স্বার্থবোধের চাপে। পশ্চিম পাড়ার কী হচ্ছে, সেটা আদৌ ভাববার বিষয় ছিল না।

কিন্তু কথা তোলার সময় নবীনার যুক্তিই কমবেশি তাদের কাছে বেশ গ্রাহ্য হল। নবীনা বাপকে বলল, আপনি এভাবে বিয়ে করতে চাইছেন কেন ? নবীর সব সুন্নৎই কি আপনি পালন করেছেন ?

নিসার হোসেন গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন, করেছি বৈকি। তোমার কি সন্দেহ হয় ?

নবীনা বলল, শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার কথা। হজরতের নির্দেশ। আপনি তা করেছেন ?

—নিশ্চয়। ঘাম ঝরে পড়ার আগেও অনেকে মজুরি পেয়েছে। অজস্র উদাহরণ আছে।

—আপনি মাবুদের তাবৎ জিন্দেগির মেহনতের হিসাবই করেননি। তার কত পাওনা আর কত দিয়েছেন, বলতে পারেন ? ওর ফুটো টিনের চালায় বর্ষায় পানি পড়ে কেন ? প্রতিবেশী উপোসে থাকলে হাদিসে আছে নামাজ কায়েম হয় না,

মাবুদ তো পর নয়। প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক নিকট। ওষুধের অভাবে তার ছানাপোনা চোখের সামনেই মরছে বছর বছর। কফিনের দামটুকু দিলেই কি সুন্নত হয়?

নিসার হোসেন আরো গম্ভীর ভারি হয়ে উঠলেন। নিচু খাদে কড়া করে বললেন, তুমি তর্ক করো না। মা ফতেমা কখনও রছুলের সঙ্গে এভাবে তর্ক করতেন না। আমি মাবুদকে যা দিয়েছি, বাদশা হারুন-অর-রসিদও কারুকে দেয়নি। আমি মাবুদকে দু'বিঘে জমি লিখে দেব স্থির করেছি। বেশি তর্ক করলে আরো দু'বিঘে লিখে দেব।

নবীনা বলেছিল, বেশ তাই দিন, আমরা চাই। কিন্তু একটি শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করা রীতিমতো ভয়ের কথা। তাবৎ বাড়িতে আগুন জ্বলবে। আপনি কোন্ যুক্তিতে বিয়ে করতে চাইছেন?

নিসার হোসেন শুধালেন, তোমরাই বা কোন্ যুক্তিতে বাধা দাও? আগে সেই কথা শুনতে চাই। তোমার যুক্তিদাতা ব্রাহ্মণটি কে?

নবীনা বলেছিল, আমি কারো কাছে যুক্তি শিখে আসিনি। আমি নিজেই জানি, এ-যুগে চার চারটি বিয়ে কিছুতেই চলে না। একা একটি মানুষ চার চারটি মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সেটা অসম্ভব।

নিসার হোসেন ক্ষীণ হেসে বললেন, ও, তাই বল। তুমি মন নিয়ে কথা তুলেছ। তাহলে তো তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে হয়। কতটুকু লেখাপড়া শিখেছ? আমি মুই মুই করে কথা বলতে ভালবাসি বলে ভেবো না, আমি রিয়েল চাষা। নট দ্যাট। আমি ইংরাজ আমলের ইন্টারমিডিয়েট। আমি এককালে বড় চাকুরি করতাম। জীবনে বহুবিচিত্র সমাজকে দেখেছি। আজও তিব্বতে দ্রৌপদী-বিবাহ খুব মান্যতার প্রথা। বড় ভাই বিয়ে করলেই সেই মেয়ে বাকি পাঁচ ভাইয়ের বউ হয়ে যায়। ইংরাজরা একাধিক বিয়ে করে। ছাড়ে আর করে। সাহেবরা ছোটজাত নয়। উঁচু সোসাইটিতে চার বিয়ে তেমন হয় না। কিন্তু বিয়ে না করেই বহু বিয়ের স্বাদ পেতে পারে যে কেউ। সেটা হয়ত কলঙ্ক। কিন্তু সেটাই সমাজ। চল অচলের সীমারেখা কোথায়? আরো আছে। মন নিয়ে কথা তুলেছ তুমি। আমার মন তো চারটে বিয়েই চায়। সেই বিয়েতে যে-মেয়ের কষ্ট হয় না, নবীর কৃপায় তেমন মেয়ের আকাল হয়নি। শিক্ষিত মেয়ে মানেই সব মন তোমাদের মতন কাঁদুনি-করা ছোট মন নয়। মন ভরানোর চেয়ে আমার সমাজে পেট ভরানোর ক্রাইসিসটাই বেশি ভয়ানক। আমি সিদ্ধান্ত করেছি অনেক ভেবেচিন্তে। কথা দিচ্ছি, জোর করে কিছু করব না। যাও। নিশ্চিন্ত থাকো।

নবীনা বলল, যাব নিশ্চয় । ফতেমা তর্ক করেননি, আমরাও করব না । ঠিক আছে । কিন্তু নবীও তাঁর মেয়ে ফতেমার কাছে যুক্তি চাইতেন । আপনি পাঁচরকম সমাজের কথা বলছেন, সে-সমাজে এত চাষা বাস করে না, সে-সমাজ আমার নয় । আমার সমাজের কথা বলুন । আপনি ইন্টারমিডিয়েট, ফার্সীতে এককালে কবিতা লিখতেন, কিন্তু আপনার ঘরে একটি জাহানারা নেই । ছেলেরা সবাই মূর্খ । গরুর দোস্ত । সেই সমাজে মন বলে কোন বস্তু আছে নাকি ? ভেবেছিলাম আছে । ইংরাজীর ধমকি খেয়ে চাষা হটে, কিন্তু ফতেমা যায় না । যুক্তি আপনাকে নিতেই হবে । আমার সমাজে যা চলে না, তাই চালাতে যাবেন না । আপনি আমার বর্তমান তিন মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছেন কখনও ?

নিসার বললেন, দেখেছি । মন বলে কোন বস্তু সত্যিই নেই । তাই মন নিয়ে বিড়ম্বনাও কম । ওদের সুখ দেহে, সেটার তলব জানতে এই সমাজের সত্যকার পরিচয়, অবস্থা, সংকট বিচার করতে হবে । তোমার ছোট মাথায় তত বুদ্ধি নেই মা । আমার সমাজ মুসলমানের সমাজ । হিন্দুর নয় । সেই সমাজ নবীর সমাজ । শিক্ষিত ছেলেরা সব মুর্দা । ডেডবডি । হিন্দু রাজার আশীর্বাদে দেশটা শ্মশান হয়ে গিয়েছে জননী । ওহুদ আর বদরের যুদ্ধে নবীর দেশ এমনই বিরান হয়েছিল কাফেরের দোষে । বিয়ে যে করবে ঔরৎ পুরুষ কোথা ? সবই যে মুর্দা । কবর ভরে গিয়েছে । তখন চার বিয়ে তো বাধ্য হয়েই চালু হয় । চার কেন, চৌদ্দ বিয়েতেও কোন আপত্তি ছিল না । শিক্ষিত ছেলে চাকুরি পায় না । বেকার । ওয়াগন ব্রেক করে । মুনিশ খাটতেও পারে না । পকেট মেরে খায় । সবই তো মুর্দা মাগো । আমার সাধ্য আছে ভরণের পোষণের । শক্তি সামর্থ্য আছে । আমাকে ভ্যাসাকটমি করাতে হয় না । আমি কেন নারাজ হই নবীর সুন্নতে ? কও হে আনোয়ার ! আমি কোথাও রাজিয়াকে জোর করছি নাকি ?

বৈঠকখানায় তখনই রাজিয়ার ফুপাতভাই আনোয়ার বৈদ্যবাটি থেকে হনহনিয়ে ছুটে এসে হাজির । আনোয়ার একধারে ঘটক ও অভিভাবক । দাঁত বার করে হেসে বললে, ছিঃ ছিঃ জোর কিসের ! সবই খুদার ইচ্ছা, রাজিয়ার নসীব । কপালের লিখন । খুদার কালাম রদ করে মানুষের সাধ্যি কি বুলেন !

নবীনা আর বাপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না । তবু নিশ্চল ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে । একসময় চৌকির একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসে যায় । ঘটক আর ভাবী বরের সঙ্গে আলাপ শুরু হয় ।

এবং ঠিক সাতদিন বাদে এই বৈঠকেই ওই দুই ব্যক্তির কথাবর্তার মুহূর্তে নবীনা ও-পাড়া থেকে এসে (ও-পাড়ায় তার স্বামীর ঘর) উপস্থিত হয় । সেদিন

আনোয়ারের মুখ শুকনো দেখায়। বাপ হয়ে ওঠেন বিশেষ গম্ভীর। বলেন, তুমি এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন নবীনা? যাও আনোয়ারকে নাড়ুমুড়ি এনে দাও। না পারো, স্বামীর ঘরে গিয়ে মোনাজাত করো, নিকের আগেই যেন আমি এন্তেকাল করি। আর আমি মরতে মরতে মোনাজাত করব যেন সাদিক আর এক দফা নিকে করে।

সাদিক শিক্ষিত ছেলে, গাঁয়ের পাঠশালার শিক্ষক। নবীনার বর। নবীনা বাপের কথায় চমকে ওঠে। দুটি চোখ তার সরু আর বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

ভাল করে কোন কথাই জানা হয়নি মিল্লাতের। দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিল নবীনা আর সে। সেই হিসেবে তাবৎ পরিবার একটি সিদ্ধান্তের নিকটবর্তী হচ্ছিল ক্রমশ। কী হবে? ধীরে ধীরে ঘটনার গতিধারা এমন হয়ে উঠল যে নিসার হোসেনের চাহিদাকে মেনে না নিলে হাজেরার কপাল পুড়ে যায়।

সেদিন বৈঠকের আলাপ জমল না। মুড়ি দিতে গিয়ে নবীনা বুঝেছিল, ওদের কথাবার্তা ঠিক মতন সরছে না। মুড়িগুলো কোঁচড়ে বেঁধে নিল আনোয়ার। খেল না। খেতে গেলে অনেক সময় লাগত। ততক্ষণ বসে থাকার মতন আনন্দদায়ক কথার জোগান ছিল না। অগত্যা বিমর্ষ বদনে মুড়ি বেঁধে নিয়ে আনোয়ার চলে গেল। সেইদিন রাতে নিসার নবীনাকে বৈঠকখানায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি কারুকে জোর করব না বলেছিলাম। সেই কথাই বহাল রাখলাম।

বৈদ্যবাটির বিয়ে ভেঙে দিচ্ছি, বাড়িতে খবর দিও। আনোয়ার অভিসন্ধির সওদাগর। বৈদ্যবাটির মাঠানের ১২ বিঘের দাগ ভাগচাষ করবার আর্জি নিয়ে এসেছিল। পরে ফাঁক বুঝে ঐ জমি নিয়ে লেঠেলি করবে আমার সঙ্গে। বোনটাকে টোপ করেছে, আমিও সেই সখের বোয়াল। আমি ঐ বিয়েতে থুঃ করে দিলাম। এই ঘটনার এক মাস পর শহর থেকে মিল্লাত ছুটিতে বাড়ি এল। নবীনা সব কথা অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে গেল ভাইয়ের সামনে। তখন রাত আটটা। ওরা এই ভেবে খুশি হয়ে উঠেছিল যে বাপ তাহলে আর বিয়ে করছেন না। সব কেমন নীরব হয়ে গিয়েছে। রাত আটটার সময় মিল্লাতের ঘরে হাজেরা এসে দাঁড়াল। সেদিনও এক তীব্র উত্তেজনার বশে মন যে কি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, সব কথা ভাল করে শোনাই হল না। মাবুদও সেদিন সন্ধ্যার মুখে বেশ কয়েকবার মিল্লাতের ঘরে কী যেন বলতে এসে উশখুশ করে ফিরে গেছে। তারপর এসেছে হাজেরা। নবীনা তখনও ভাইয়ের কাছে বসে আছে। উঠে

যেতে মন চাইছিল না। হাজেরা ঘরে ঢুকেই, 'বাপজী এস্যাছ সোনা' বলে চাপা গলায় ডুকরে কেঁদে ফেলল। নবীনাও স্তম্ভিত। টেবিলে ভীষণ উজ্জ্বল সাদা ল্যাম্পের শিখা টলটল করছে। হাজেরা বলল, আজ দু'পহরে রেজিস্টারি আপিসে মরদের নামে দু'বিঘে জমি দলিল করল হাজী। হায় বাপ! বাপ রে, আমার কী হবে? তুই একবার বিচার কর সুনা! নারী লোকের কপাল সুনা তেঁতলের (স্থাননাম) হাঁড়ি। তাপে ফাটে না। দাপে ফাটে। তোর বাপের দাপ সামলায় কে বাছা!

মিল্লাত হাজেরার কথা শুনে পরম বিস্মিত গলায় বলল, জমি লিখে দেয়ার কথা তো ছিলই ফুফু। নবীনা বলছিল, আমরা বেশি তর্ক করলে আরো দু'বিঘে জমি তোমরা পাবে। আমরা চেষ্টা করব, আরো দু'বিঘে দলিল হোক। তুমি কাঁদছ কেন?

হাজেরা বলল, কাঁদি কি সাধে বাছা! মরদ যে রাতে শুয়ে বুকের কাছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কাঁদে গো! জমি তো মাগ্‌না লয় মিলাত বাপজী! খুদার সাত তবক আসমান কাঁপছে, তুমার বাপের সখ মিটায় কে? আমাকে সাদী করবে তুমার বাপ। মরদকে তালাক দিবার জন্যি চাপ দেয় হামেশা। মরদ আমার রাতভর ঘুমায় না, খালি ডুকরায়। তুমি বুঝমান ছেলে, বাপের সুমতি যাতে হয়, সেই বেবস্থা কর এই বেলা। তা বাদে শহর যেও ধন!

মিল্লাত কথা শুনে নির্বাক হয়ে যায়। দুই চোখ দেখতে দেখতে ক্রোধে ঘৃণায় ঝাপসা হয়ে আসে। সহসা আসন ছেড়ে একপ্রকার লাফিয়ে চলে আসে নিসার হোসেনের বৈঠকখানায়। তখনই তিনি এশার নামাজ শেষ করে তসবি গুণ-ছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মিল্লাত। পেছনে নবীনাও এসেছে। নবীনা বলে, আমাকে আগে কথা বলতে দাও। উনি বলেছেন, জোর করে কিছু করবেন না। কথাটা কানে যায় নিসার হোসেনের। তসবি বন্ধ করে জায়নামাজ গুটিয়ে ফেলেন। মাথার টুপি খুলে ফেলেন। দেখতে দেখতে বাড়ির অন্যরাও সেখানে জড়ো হয়। তিন বউ। প্রায় সমগ্র সন্তান-মণ্ডলী। সন্তানদের যারা বিবাহিত তাদের ছানাপোনাও বধূরা। তাবৎ ঘর ভরে যায়। নিসার হোসেন ঠাণ্ডা গলায় বলেন, আমি কারুকে জোর করিনি নবীনা। মাবুদ স্বেচ্ছায় হাজেরাকে ত্যাগ না করলে আমি গ্রহণ করব কেন? শুকনো মুখে মাবুদ চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, দেখি তো! টের পাই, ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু হাজেরাকে খেতে দিতেও পারে না। তাই দু'বিঘে জমি লিখে দিয়েছি। তুমি বলেছিলে, আমি কিছুই দিই না। ওকে ঠকিয়েছি। তোমাদের মুখ আমি ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেব।

নিসার হোসেন জায়নামাজখানি ঘরের কোণে রেখে চেয়ারে বসলেন। বললেন, আমার সমাজে দুইধারা গরিব আছে। এক গরিব বড় দরদী। গরিব বলেই মায়া দয়া বেশি। আর একদল গরিব বলেই নিষ্ঠুর। মাবুদ দরদী লোক, খেতে না পেলেও বউ তালাক দেবে না। কিন্তু কখনও যদি দেয়, জানবে বেটাছেলে বড়লোক হয়েছে। জমি পেয়েছে। সুখে আছে। সংসারে সুখ না পেলে কিছু মানুষ নিষ্ঠুর হতে পারে না। গরিবের নিষ্ঠুরতা ওর নেই। আমি তাহাজুদের নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছিলাম গতকাল। নবী আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। বলেছিলাম, হায় নবী, আমি এখন কী করব ? বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু কারুকে সুখী না করে কারুকে দুঃখ দিতে নেই। স্বপ্ন দেখে সেই চৈতন্য হয়েছে আমার। মাবুদকে দিয়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটা পাকা করতে চাই। সেটা একটা পরীক্ষা নবীনা। আমায় বাধা দিও না।

মিল্লাত বলল, আপনার কথা বুঝতে পারি না কেন ? আপনি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন না ?

নিসার হোসেন ভিড়ের মধ্যে চাইলেন। মিল্লাতকে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে দেখে বললেন, কে তুমি ? মিল্লাত ? কখন এলে ? মা কেমন আছেন ? আমার মা ? তোমার দাদী ?

শহরের বাড়িতে দাদীমাকে নিয়ে স্কুলজীবনের শেষ দিকে মিল্লাত চলে গিয়েছে। দাদীমা নাতীকে এতই পছন্দ করেন, আর মিল্লাতের লেখাপড়ায় তাঁর এত উৎসাহ যে এই বৃদ্ধ বয়সে নাতীকে যেন কোলছাড়া করতে চান না, তাই শহরেই থাকেন। মাঝে মধ্যে গাঁয়ে আসেন। আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি। ছেলের চেয়ে নাতীই তোফা। জীবনের আশ্চর্য পুরস্কার যেন। মিল্লাত জানে, দাদীমাকে এই লোকটি ভয় পায়। বলল, আপনার পরীক্ষার কথা দাদীমাকে নিশ্চয় জানাব। নবীর স্বপ্নের কথাও। কিন্তু কথাটা আমার একটু বোঝা দরকার। শহর থেকে বাড়ি আসার পথে দেশের লোক কতজন বৈদ্যবাটির বিয়ের কথা আমাকে জানতে চেয়েছে, আমি কোন জবাব করতে পারিনি। এখন মাবুদের ঘটনার কী জবাব দেব বলুন।

নিসার বললেন, দেবে। মাবুদ আমার দোস্ত। ওকে আমি একটু বড়লোক করছি মাত্র। কথা কেন বোঝো না, বড়লোক হলে মাবুদ যা পারে, গরিব থাকলে মাবুদ তা পারে না।

অসহ্য ! মিল্লাত বিরক্ত হয়।

নিসার বলেন, হ্যাঁ অসহ্য ! অবশ্যই অসহ্য ! হেলাফেলা করে বুঝলে তো

বোঝা যায় না মিল্লাত। সমাজতত্ত্ব বলে কথা। যে-মানুষ ঢের কাল জন্মাবধি বড়লোক, টাকা পয়সার মালিক তার চাহিদার দোষ যা, যে কিনা গরিব থেকে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করছে, তার দোষ আরো ভয়ংকর। মাবুদকে বড়লোক হতেই হবে। সেটা সে বুঝতে শিখেছে। এতকাল বেচারি নির্বোধ ছিল। বেকুফ কি সহজে সেয়ানা হয়? যাক গে। মেয়ে আর মাটির যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনও শেষ হবে না। আমি চাই না, মাবুদ তার কৃতকর্মের জন্য আমায় দোষ দিক। যা করবে নিজের থেকে করুক। আমি কেবল তাকে কিঞ্চিৎ বড়লোক করে দেব। ব্যস। ফেকায় আছে পরস্ত্রীকে বিবাহ-করা হারাম। জানি সেই লোভের ক্ষমা খোদা করতে পারেন না। তা নিয়ে গল্প আছে। শুনেছ? অতএব…

নিসার চুপ করে যান। মিল্লাত বলে, তবু শুনে রাখুন আব্বাজী, মাবুদ ক্ষমা করলেও, আমরা করব না। মানুষের লোভ যে নিরাকার বস্তু। ধরা যায় না। যারা কবরে শুয়ে কাঁদবার জন্য দুনিয়ায় এসেছে, তারা কখনও জীবদ্দশায় কাঁদে না। নইলে মাবুদকে এত লোভী করে তুলতেন না. আপনার কষ্ট হত। চল্ নবীনা। আমি কালই পালাব। এখানে তিষ্ঠনো যায় না।

মিল্লাত পরের দিনই চলে যেতে পারে না। বাড়ির সবাই চাইছিল, মিল্লাত একটা ব্যবস্থা করুক। হাজী সাহেবের কথা শুনে সকলেরই মনে হয়েছে, মানুষটি ভয় পাচ্ছে। লোভের ভয়। লালসার আতংক। মাবুদের কাছে ক্ষমা না পাওয়ার ভয়। তাই সে চাইছে মাবুদ যেন দোস্তকে নিরাপরাধ ভাবতে পারে। গল্প একটা ছিল হাদীসের বর্ণনায়। পরস্ত্রীকে জোর করে দখল করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। বঞ্চিত মানুষটি প্রবঞ্চককে কবরে শুয়েও ক্ষমা করেনি। খোদা বলেছিলেন, এই গুনাহের ক্ষমা আমার হাতে নেই। মানুষই পারে ক্ষমা করতে। এই লোভের ক্ষমা ঈশ্বর পারে না। তুমি ঐ বঞ্চিতের কাছে ক্ষমা চাও। তুমি অনেক পুণ্য করেছ। তুমি হৃদয়বান, দয়ালু। তুমি প্রখ্যাত আত্মা। কবরে যে শুয়ে আছে বঞ্চিত অসহায় স্বামীটি, করুণ প্রেমিকটি, তার কাছে যাও। এত প্রসিদ্ধি তোমার, তবু তুমি ঐ লোকের স্ত্রীকে জবরদখল করেছ। ধনসম্পদে পরিপূর্ণ জীবন তোমার। তবু তুমি বঞ্চিতের কাছে পাপী ও নিঃস্ব। খোদা তোমাকে ক্ষমা দিতে অক্ষম। মানুষের কাছে যাও।

কবর নিশ্চুপ। কোন সাড়া দিল না। কবর সমস্ত কথার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু লোকটি যখন স্বীকারোক্তি করে বলল, আমি জবরদখল করেছি, তোমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় আসেনি, আমি সেই পাপে দগ্ধ হচ্ছি, ক্ষমা করো। কবর সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। হাদীসে গল্প আছে। 'অতএব' বলে হাজী থেমে

গিয়েছিলেন। অতএব মাবুদ নিজেই তৈরি হোক। তার মধ্যে লোভ সঞ্চারিত হোক। বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখুক। মাটিতে আসক্তি জন্মাক। নারীতে বহুগমনের লালসা জেগে উঠুক। পাপী হোক দরিদ্র আগলদার।

মিল্লাত নবীনাকে সঙ্গে করে মাবুদের কাছে গেল। মাবুদ বলল, আমি কী করব কহেন! খুদার ইচ্ছেয় আসল। দু'মুঠি ভাতের জন্যি মানুষ পাপ করে মিলাত বাপজী! এ-সংসারে দয়ার অন্নে গুনাহ্ নিবাস করে আব্বাজী! আমি তেনার দাস! দয়ায় জব্দ মুনিশ। কী করব জানি না।

মিল্লাত আর কোন কথা বলতে পারে না। নবীনা ছটফট করে ওঠে। বলে, ভাইজান, আব্বাজীকে বলে দাও, বৈদ্যবাটিতেই সাদী হোক। আমি কাল আনোয়ারকে ডেকে পাঠাব।

কিন্তু একটি কথা কেউই কখনও মুখে প্রকাশ করছিল না, নবীনাও না। দাদীমা মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ের কথা এই কিছুদিন আগেও আপনমনে চর্চা করেছেন। সকলকে শুনিয়ে বলেছেন। কেউ কেন সেকথা তুলছে না। সেটা তোলাই যেন যায় না। নবীনাও ভাবছিল, কথাটা এখন তুলতেও ভয়ানক ঘেন্না হয়। ভাইয়া সেকথা জানে না। থাক। একদিন যখন শুনবে, তখন ? থাক তবু।

নবীনার কষ্ট হচ্ছিল। মাবুদ বলল, আনোয়ার আসবে না। মেয়্যা বুঝিন নারাজ। তেবে লোক বেজায় দালাল, সব পারে। হাজীর সঙ্গে টাকা পয়সার গরমিল আছে। এইসব কথার ফাঁকে ঘর থেকে হাজেরার ফোঁপানি ভেসে আসে। হাজেরা বুঝতে পারছে, মরদ ধীরে ধীরে একদিন তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আর কাঁদবে না। বরং কান্নার ছদ্মবেশে হাসতে শুরু করবে। কিন্তু সেই হাসি চেনা যাবে না। মিল্লাত সেই কান্না সহ্য করতে না পেরে লাফিয়ে উঠে পড়ে বাঁশের মোড়া ছেড়ে। নবীনাকে বলে, দাদীমাকে সব কথা বলতে হবে নবীনা। আমি কালই চলে যাচ্ছি।

যাবার দিন মিল্লাত তার তিন মায়ের চোখে মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেয়ে দেখল। সব কেমন উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেই উদ্বেগের মধ্যে কোথাও ধার নেই। তবে সকলেই চাইছে, হাজেরা যেন এই খানদানে বসত না করে। যেন তার দুঃখের ঝুপড়ি ছাই হয়ে না যায়। বড় বউ অবস্থাশালী ঘরের মেয়ে। অন্য বউরাও দরিদ্র বাপের অনাদরের সন্তান নয়। তাদের সবারই বিয়ে হয়েছে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সমস্যা থেকে এমন নয়। কিন্তু হাজেরা দুঃখিনী। তাছাড়া অনেক সন্ততির মা। হাজীর খানদানীতে হাজেরা মানায় না। যদিও আগের মতন ধন সম্পদের প্রাচুর্য

আর নেই। পুরনো জোশ নিঃশেষ হয়ে আসছে দিনে দিনে। তথাপি মাবুদের বউ হাজেরাকে তারা এই খানদানের ঘরণীরূপে কল্পনা করতে কষ্ট পাচ্ছিল। আবার মাবুদের অসহায়তাও তাদের কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছিল বৈকি! অবশ্য সেকথা মিল্লাত অনুমান করছিল মায়েদের মুখপানে চেয়ে। বুঝতে চাইছিল, এরা সব সত্যকার জড়পিণ্ড কিনা, নাকি এদের বুকেও সত্যি কোন পরিতাপ আছে মাবুদের জন্য! বাড়ির চাকর মাবুদকে এরা কোন্ চোখে দেখে? স্বামীর দোস্ত কথাটির উপলব্ধি শুধুই কি করুণা নিষিক্ত? চাকর স্বামীর সঙ্গে থাকে। সিগারেট খায়। স্বামীকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে দূর গ্রামে জলসা (ধর্মসভা) শুনতে যায়। মিল্লাত ভাবতে চেষ্টা করছিল, স্বামীর সব আচরণ দেখে তারা সত্যিই কিছু ভাবে কিনা! স্বামীর মানুষ নিয়ে, বাড়ির চাকরকে নিয়ে অদ্ভুত পরীক্ষানিরীক্ষা দেখে তারা কী মনে করে?

নবীনা বলল, ওরা কিছুই ভাবে না। ওরা ভাবে আপন আপন সন্তানের কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে কী হবে, সেই কথা। জমির হিসাবনিকাশ করে। এতগুলি ছেলেপুলে, ভাগাভাগি হলে কতটুকু দাঁড়াবে। হাজেরাকে চায় না, কারণ ওর অনেক ছানাপোনা। বাচ্চারাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পিলপিল করে এ-বাড়িতে ঢুকে যাবে। সেই কারণে ওদের মৌন আপত্তি আছে। তোমাকে দিয়ে আব্বাজীকে তাই ওরা নিরস্ত করাতে চায়। বৈদ্যবাটির বিয়েতে ওদের কোন আপত্তি নেই। ওরা এখন বৈদ্যবাটির বিয়ের কথাই বলছে। আমি শুধিয়ে দেখেছি। প্রথমে ওরা শিক্ষিত মেয়ের কথা তুলেছিল। যাতে বিয়েটা আটকায়। এখন তার উপায় নেই। তুমি কী করবে? আব্বাজীকে বলবে?

মিল্লাত বলল, আমি কিছুই বলব না। আমি চলে যাব নবীনা। পালিয়ে যাব। মাবুদ দিনে দিনে কেমন লোভী হয়ে উঠছে, দেখবার জন্য বসে থাকার সহ্যশক্তি আমার নেই। এখানে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসে। বেটি আর মাটির লড়াই করতে করতে হাদীস কোরান এখানে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চামড়ার স্যুটকেসে মিল্লাত জামাকাপড় সাজাতে থাকে। নবীনার চোখ ছলছল করে ওঠে। নবীনা বলে, এ-বাড়িতে ভাইবোনেরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, লক্ষ করেছ? এক একজন মাকে ঘিরে এক একটা গোষ্ঠী, এক একটা বংশ। পরস্পর শত্রুর মতন তাকায়। কেবল বড় ভাই একটু আলাদা। বউগুলি পিটিয়ে কাজ করে যন্ত্রের মতন।

মিল্লাত মনে মনে বলল, এবং যন্ত্রের মতনই যৌন-ক্রিয়া করে, সন্তান প্রসব করে। দেখেছি, যার যেদিন রাত, সেই বউ সেদিন দিনের বেলা থেকে বৈঠকে

গিয়ে নিসার হোসেনকে সেবা দেয় আর পাহারা রাখে। অন্যজন ছুঁতে পায় না। একদিন অন্যজন এক বদনা পানি এগিয়ে দিয়েছিল বলে, যার রাত তার সঙ্গে ঝগড়া বেধে গিয়েছিল, তখন দু'জনের চোখে তীব্র যৌন-ঈর্ষা দেখেছি। তৃতীয়জন সেই ঈর্ষার কচালি উপভোগ করেছিল। এই অবস্থাই আব্বার পক্ষে সুখকর। আব্বা তখন পরম তৃপ্তিতে মুখের দাড়িতে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল।

মুখে বলল মিল্লাত, ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে আমি সব চিনি না নবীনা। উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় খেলা করে। ধুলো ছেটায়। চিনতে পারি না। ভাবি, এরা কোন্ বাড়ির ছেলেমেয়ে। একদিন খুব ছোট একটা বাচ্চাকে, বোধহয় ছোটমায়ের পাউলি, কাছে ডাকলাম, কিছুতেই এল না। এদেরই কেউ একজন বড় হয়ে বিয়ে হল, ধর, কোন একটা বোন, বিয়ের পর কোন একটা অচেনা পথে গরুরগাড়ি করে শ্বশুর-ঘর যাচ্ছে, টাপুরে পর্দা ফাঁক করে আমায় ভাইয়া বলে ডাকল। আমি চিনতে না পেরে চলে যাওয়া গাড়ির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম, কোন কথাই বলা হল না। এই ধারা ভাবনা হয় রে! কষ্ট হয় আমার! আমি আর এ-বাড়িতে ফিরব না কখনও।

নবীনা শুধাল হাসতে হাসতে, আমায় তুমি চিনতে পারবে তো? ভুলে যাবে না তো! তুমি আসবে না, চলে যাচ্ছ, আমি বড় একলা হয়ে গেলাম। ভুলেই যেও, আমি তো তোমার আপন বোন নই!

মিল্লাত ছলছলানো চোখে হাত উঁচিয়ে নবীনাকে তাড়া করে বলল, যা হট্! পাগলামী করিস না। চিঠি দিস্!

—তুমি দেবে?

—আমার যে ভারি আলস্য নবীনা। তবু দেব।

—আব্বাকে সত্যিই কিছু না বলেই চলে যাবে?

মিল্লাত হাতে সুটকেস উঠিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে নামল। বলল, বলব। আয়।

চলতে চলতে কিছুক্ষণ নিঃশব্দ আসার পর মিল্লাত বলে উঠল, তবু মায়া হয় নবীনা, কেন হয়, বলতে পারি না। আব্বার জন্য মায়াই হয়।

আবার ওরা চুপচাপ হাঁটতে থাকে। নিসার হোসেন বাগানে মাবুদকে সঙ্গে করে আম নামাচ্ছেন গাছ থেকে। সেইদিকে এগিয়ে চলল দুই ভাইবোন। বাগানে পৌঁছে মিল্লাত যা বলবে ভেবেছিল, কোন কথাই তার মনে থাকল না। তর্ক করার তার প্রবৃত্তি ছিল না। শহর চলে যাচ্ছে সে। কখনও ফিরবে না। কথাটা স্বকণ্ঠে ঘোষণা করতে ইচ্ছে হয়েছিল নিসার হোসেনের সামনে। কিংবা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বৈদ্যবাটিতে বিয়ে করাই বরং ভাল। বা পরস্ত্রীকে বিয়ে

করা হারাম যদি হয়ই, তার যে-কোন কৌশলই হাদীস ফেকায় নিন্দনীয় না-ও হতে পারে। কিন্তু মানুষের কাছে তারও কোন ক্ষমা নেই। মানুষের দারিদ্র্যকে নিয়ে সুখী সম্পদশালী ব্যক্তিরা রাজনীতি বা ধর্মের নামে চিরকালই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে, ইতিহাসে সেই চর্চা বহুযুগ ধরে চলছে। কারো হাতে গান্ধীর কেতাব, কারো হাতে মার্ক্স সাহেবের গ্রন্থ, কারো বা খোদায়ী পুস্তক, নবীর হাদীস। কিন্তু এ-তর্ক বৃথা। ভাবলেই মন ধূ ধূ করে। বিষণ্ণ হয়। চলতে চলতে ভেবেছিল, মিল্লাত অতএব কোন কথাই বলবে না। নবীনা বোকা মেয়ে, তাই এখনও বাপের সঙ্গে কথা বলার পক্ষপাতী। আমি নই। আমি আর কোন কিছুই জানতে চাই না। আমি ভুলে যেতে চাই এই জন্ম ও জীবনের সব ক্ষতচিহ্ন। সব যন্ত্রণা।

দেখল, বাপ মাচায় বসে কীসব একমনে লিখছেন। কাছে এগিয়ে এসে দেখল, মনি অর্ডার ফরমে টাকার অঙ্ক লিখছেন। কোথায় যাচ্ছে টাকা ? খাজা মুইনুদ্দিন চিশতীর নাম লেখা খামের মধ্য থেকে মনিঅর্ডার ফরমগুলি বার করেছেন তিনি। চিশতীর কবরের খাদেম বাবার ঠিকানায় ঐগুলি পাঠিয়ে অর্থ সাহায্য চেয়েছে। বাবা বললেন, তোমায় দু'শোটি টাকা দিচ্ছি, শহর যাবার পথে কুদবাপুকুরে নেমে হাসর সেখের হাতে টাকাটা দিও। ওর ছেলের অভাব। কলেজের মাইনে আটকে গেছে। নাও। তুমি তাহলে চলে যাচ্ছ ? মাকে একবার পাঠিয়ে দিও, এসে রেখে যেও। মনে থাকবে ?

মিল্লাত কোন উত্তর করল না। টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখল। বাগানের মাটিতে চাদরে ক'গণ্ডা বোম্বাই আম বেঁধেছে লোকটা। সেই বোঝা আগলে চুপচাপ বসে আছে। বাপ আর ছেলের কথাবার্তা লক্ষ করছে। বাবা আমগুলি লোকটিকে দান করেছেন। নবীনা ভাইয়ের পাশে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। নিচু গলায় জানাল, কালো লোকটি আনোয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে মিল্লাতের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে গেল। ঠিক এইসময় গাছের ডাল ভেঙে ডালসহ মড়াৎ করে গাছ থেকে নিচে পড়ে গেল মাবুদ। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কষে রক্তের ছোপ। সবাই হৈ হৈ করে মাবুদের কাছে ছুটে গেল। দুজন পানি আনতে ছুটল বালতি বদনা হাতে। মিল্লাত আর দাঁড়াল না। বাস ধরবার জন্য পীরতলার স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে নিজেকেই শুধাল, আশ্চর্য মিল্লাত! তুমি এইভাবে চলে আসতে পারলে ?

বাড়ি এসে দেখল ঘরের ভেতর থেকে দাদীমায়ের ছিটকিনি আঁটা। ধাক্কা দিয়ে দাদীমাকে ডাকতে শুরু করল সে। দাদীমা সাড়া দিচ্ছেন না। তিনি মরে

গিয়েছেন।

ঘর ভেঙে ঘরে ঢুকল বাসাড়েরা, নিচের চা-অলা দোকানদার। সফী ও মিল্লাত। দাদী নেই। কখন চলে গিয়েছেন কেউ জানে না।

শবের কিছুটা দুর্গন্ধ উঠছে।

দাদীমায়ের মৃত্যুর খবর একমাস পর নবীনাকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছিল মিল্লাত। লিখেছিল, প্রায় মাসখানেক হল বোধহয় দাদীমা মারা গিয়েছেন। তোমাদের জানাতে দেরি হয়ে গেল। মার্জনা করবে। পূর্বের চেয়ে আমি অধিক আলস্য বোধ করি। ইতি তোমার ভাইয়া মিল্লাত।

রাজিয়া রান্নাঘর থেকে ঘরে ঢুকে মিল্লাতকে চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হল। বলল, সাদিক এসেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমার ঘরে যাও। আমি আসছি।

মিল্লাতের স্মৃতিধারা থেমে যায়। মিল্লাত সচকিত হয়ে বেরিয়ে আসে। সাদিককে দেখে তেমন উৎসাহিত হয় না। বলে, এত ভোরে কী ব্যাপার? নবীনা কেমন আছে?

সাদিক মাথা নেড়ে নবীনার কুশল প্রকাশ করে। তারপর বলে, আমি তোমার কাছে ঠিক আসিনি। গিয়েছিলাম বৈদ্যবাটি, সেখানে গিয়ে শুনলাম, রাজিয়া এখানে, তাই আসা।

—ও। রাজিয়া আসছে। কী কথা ওর সঙ্গে? প্রশ্ন করল মিল্লাত। সাদিক বলল—ওকে কাল পরশু একবার বৈদ্যবাটি যেতে হবে। আমার এক মামাত বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে। দেখতে বেশ কালো। সেই ব্যাপারে র‍্যাজিয়ার সঙ্গে কথা আছে, তোমাকে বলতে লজ্জা করছে। পরে জেনে নিও। আমি ওর সঙ্গে বরং ঐ-ঘরেই কথা বলি। বলেই সাদিক উঠে দ্রুত রাজিয়ার কাছে চলে গেল। এবং দশ মিনিট পর সাদিক ফের মিল্লাতের কাছে এসে ঘরে না ঢুকে বারান্দা থেকে বিদায় নিল। বলল, পরে আসব, আজ খুব তাড়া আছে ভাইজান। চলি।

মিল্লাত এই ঘটনায় চমৎকৃত ও ঈষৎ বিরক্ত হয়। সাদিকের আচরণ ও রাজিয়ার সঙ্গে গোপন কথা বলা তার ভাল লাগে না। বরাবরই ছেলেটা বেশি মাত্রায় চালাক। নবীনা বোধহয় সুখী নয়। তাই বা কেন, খানিকটা প্রেম হয়েই ওদের বিয়ে হয়েছে। নবীনার সঙ্গে এই ছেলের প্রেম হওয়া খুব অবাক লাগে। কথাটা বোধহয় ঠিক নয়।

॥ চার ॥

অবাক লাগে রাজিয়ার সঙ্গে সাদিকের জানাশোনার সম্পর্ক। দুপুরবেলা খেতে বসে ঘটনা কী জানতে ইচ্ছে হয় মিল্লাতের। শুধায়, সাদিক তোমাকে কী বলতে এসেছিল ? কার যেন বিয়ে ?

রাজিয়া বলল, হ্যাঁ। ওর মামাতো বোনের মুখ দেখানি হবে সামনে বেহস্পতিবার, তারই নেমন্তন্ন করে গেল। পরে সব ঘটনা বলব তোমাকে। ঘণ্টাখানেকের মতন একবার এক্সচেঞ্জে যাব। ফিরে এসে সব বলছি। তুমি কোথাও যেও না।

এক্সচেঞ্জ মানে চাকুরির এক্সচেঞ্জ ? ঠিক আছে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একটা কার্ড করে রাখি। চাকুরি ভীষণ দরকার আমার। ভেবেছিলাম, এম-এ পড়ব, সেটা আর হবে না। কোন ইস্কুল-টিস্কুলে যদি একটা জোটে।

মিল্লাত আপন মনে ভাত খেতে খেতে কথা শেষ করে রাজিয়ার চোখে চাইল। রাজিয়া একটু তফাতে বসে মিল্লাতকে পরিবেশন করছিল। যেন বা পাহারা দিয়ে খাওয়াচ্ছে। রাজিয়ার এই ভঙ্গিমা দেখে মিল্লাত বুঝে পাচ্ছিল না, মেয়েটা এমন করছে কেন ?

রাজিয়া বলল, এক্সচেঞ্জে তৃণা নস্কর কাজ করে। আমার বন্ধু মতন। ভয়ানক ভীড় হয়। আমি ওর বাড়িতে গিয়ে নতুন কার্ড করানোর জন্য মার্কস-সীটের কপি ইত্যাদি রেখে এসেছিলাম। পরে অফিসে গিয়ে ফরম ফিল-আপ করি। তোমারটাও ঐভাবেই করাবো। তোমাকে যেতে হবে না। শুধু দরকারী কাগজপত্রগুলো দাও, আমি নকল করে নিচ্ছি। পরে দরকার হলে তোমাকে অফিসে নিয়ে যাব।

মিল্লাত বলল, এক্সচেঞ্জে আজকাল খুব ঘুষ খাচ্ছে। বা জানাশোনা না থাকলে কল্ হয় না। তুমি তোমার বন্ধুকে একটু বলবে ?

রাজিয়া বলল, বলব বৈকি ! খেয়ে উঠে কাগজপত্রগুলো ঠিক করে দাও। আমি বার তিনচার কল্ পেয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি, হয় বড় রকমের ঘুষ, নয় পার্টির ব্যাকিং। নইলে চাকুরি হওয়া মুশকিল। আমার কোনটাই নেই। লোকাল এম এল এ-কে বলতে গিয়েছিলাম। উনি কানই করলেন না। উল্টে অপমান করলেন। হাজী সাহেবের অত সম্পত্তি, চাকুরি কী হবে ? তৃণা নস্করও একই প্রশ্ন করেছিল, আমি কি খুব গরিব ? আমার বর কী করে ? বলেছিলাম, আমার বর খুব বুড়ো। রিটায়ার করেছেন। শুনে মেয়েটা বিশ্বাসই করল না। প্রথমে না

করলেও পরে করেছে। সত্যিই যে আমার স্বামী বুড়ো ওকে বোঝানই যেত না। এখনও সব কথা ও জানে না। বলে কী লাভ ?

মিল্লাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজিয়া বলল, ও কি! উঠলে কেন ? রান্না বোধহয় ভাল হয়নি।

মিল্লাত বেসিনে হাত ধুয়ে এসে বলল, রান্না চমৎকার হয়েছে। অনেক খেয়েছি। এসো। তোমাকে কাগজপত্রগুলো দিই। জানি না কী কী লাগে ? রাজিয়া হঠাৎ মনে পড়ায় বলে উঠল, তোমার রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট লাগবে কিন্তু, আছে তো ?

মিল্লাত বলল, না। সেটা তো নেই! তা কি খুবই জরুরি ? গাঁয়ে থেকে প্রধানী সার্টিফিকেট কে এনে দেবে ? ওটা যদি না হয়, তবে কি এক্সচেঞ্জে নাম-ভুক্তি হবে না ? তুমি বন্ধুকে দিয়ে একটা যা হয় ম্যানেজ করবে। পারবে না ?

রাজিয়া আমতা আমতা করল। বলল, দুদিন বাদেই না হয় হবে। নবীনাকে চিঠি লিখে একটা সার্টিফিকেট আনিয়ে নাও। নাকি তাতেও খুব আলস্য তোমার ?

মিল্লাত চুপচাপ ক্ষীণ হাসল। বলল, আচ্ছা বেশ। লিখব। তুমি তবে যাবে আর আসবে। দেরি করবে না। আমি বিকালে ছেলে পড়াতে বেরব।

রাজিয়া মাথা নেড়ে কাপড় বদলাতে ঢুকল। নিজের ঘর থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রাজিয়ার ঘরের সম্মুখের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল মিল্লাত। রাজিয়াকে আরো একটু গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে, আজই যেন সে তার বন্ধুকে আমার কথাটা বলে। ভাবছিল মিল্লাত। তাই সে রাজিয়ার রেলিঙে সিগারেট টানতে টানতে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোন কিছুতে যখন মনোযোগ হয়, মিল্লাত তখন তাতেই সব ভাবনা ঢেলে দেয়। এখন শুধু চাকুরির কথাই মাথায় ঘুরছে। কারণ চাকুরি না হলে সব পথই যেন রুদ্ধ মনে হচ্ছে। একটু বাদেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাজিয়া। কাপড় বদলেছে। কিন্তু ব্লাউজ বাইরে রেলিঙ বরাবর দীর্ঘ তারে ঝুলন্ত। শুকোতে দিয়েছিল। ওঠায়নি। সেটা নেবার জন্য বেরিয়ে এল। ডান হাতের কনুইয়ে চোখ পড়ল মিল্লাতের। মিল্লাত চমকে উঠল। নগ্ন কনুই কেন দীর্ঘহাত ব্লাউজে ঢাকা থাকে মিল্লাত বুঝতে পারে। পোড়া দাগ। সেটা যেন সুন্দর হাতখানিকে কলংকিত করেছে। রাজিয়া ব্লাউজ টেনে নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। দশ মিনিট পর বেরিয়ে এল ফের। এবারের চিত্র আরো অদ্ভুত। হাত গলা নাক কান খালি। অলংকারগুলি নেই। রাজিয়া বলল, আমি তাহলে

যাচ্ছি।

হ্যাঁ। শোন? চলে যেতে উদ্যত রাজিয়াকে থামিয়ে দেয়। রাজিয়া কাছে সরে আসে। মিল্লাত তখন শুধায়, তোমার গহনাগুলো দেখছি না কেন? ও-গুলো একটু আগেই তো গায়ে ছিল। খুলে ফেললে কেন?

রাজিয়া পাতলা হেসে বলল, এগুলো যে আমার নয়। যার জিনিস তাকে দিতে যাচ্ছি। একটু থেমে রাজিয়া বলল, তৃণা ঠিক বন্ধু ছিল না। আমিই ওর কাছে এসেছি ঘনঘন। চাকুরির জন্য ওকে ঘুষ দেবার সাধ্য তো নেই। অবিশ্যি থাকলেও বোধহয় নিত না তৃণা। তাই আসতে হয়েছে। মাঝে মাঝেই। বোঝাতে হয়েছে আমি সত্যিই গরিব। আমার স্বামী রিটায়ার্ড। বুড়ো মানুষ।... একটু থামে রাজিয়া। বলে, ওর সঙ্গে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময় ভাব হয়। পাশাপাশি সিট হয়েছিল। ওকে সাহায্যও করেছিলাম পরীক্ষার সময়। সেই কৃতজ্ঞতা আজও ওরে মনে আছে। পরে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চাকুরি হল এক্সচেঞ্জে। নাম লেখাতে এসে দেখা। ও আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে গেল। এখন ও দাদার কাছে থাকে। ওর দাদাও ভাল লোক। আমার জন্য দুঃখ করেন। শহরে এলে ওর সঙ্গে দেখা করি।... ফের একটু থেমে শ্বাস ফেলে ক্ষীণ হেসে রাজিয়া বলল, গয়নাগুলো তৃণাই আমাকে জোর করে পরিয়ে দিয়েছিল সেদিন। বলেছিল, বিধবার মতন থাকিস কেন? ওকে বলতে পারিনি আমি সত্যিই বিধবা। খালাস পাইনি।... আবার থেমে বলে, তা পরশু তৃণারা দীঘা যাচ্ছে হঠাৎ মনে পড়ল। যাই দিয়ে আসি। তুমি চলে যেও না। আমি তোমার কথা তৃণাকে বলব। কী বলব তাই ভাবছি। বলব, তুমি আমার বন্ধু। আমার তো হল না, আমার বন্ধুর যেন একটা চাকুরি হয়।... সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল রাজিয়া। যেতে যেতে বলল, তৃণার ক্ষমতাই বা কতটুকু!

মিল্লাত আশ্চর্য হচ্ছিল। রাজিয়া তাকে শত্রু মনে করছে না। পর মনে করছে না। ভাড়াটে তো নয়ই। মিল্লাতের চোখে হঠাৎ রাজিয়ার চেহারা ছবি বদলে যায়। চোখের সামনে সে যথার্থ বিধবা হয়ে ওঠে। কনুই পোড়া দাগে বিশুদ্ধ করুণ দেখায়। মিল্লাতের আজ অন্য রকম লাগে। মনে হয়, রাজিয়া কি তাকেই বরং নিসার হোসেনের পুত্র বলে ঘৃণা করতে পারে না? রাজিয়ার তরফে কোন ক্ষোভ কি নেই? এক ঘণ্টা সময় ভাবতে ভাবতে মিল্লাত সিদ্ধান্ত করে, রাজিয়ার সবখানি তার চেনা উচিত। শুধু তৃণার কাছেই নয়, জগতের কাছেই একটি মেয়ে কী নিরুপায় ভাবে রহস্য-ঘেরা, কেমন অচেনা যেন বা। ঘণ্টা দুই বাদে হন্তদন্ত

হয়ে রাজিয়া ফিরল। বলল, তোমার দেরি করে দিলাম।

মিল্লাত বলল, না। ঠিক আছে। আজ টিউশানী যাচ্ছি না। মন ভাল নেই। বারবার দাদীমায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর একমাস পর বাড়ির সবাই এই বাড়িতে কাঁদতে এসেছিল। সবচেয়ে বিরক্তিকর কান্না কেঁদেছিল আব্বা।

রাজিয়া বলল, তৃণা দীঘা থেকে ফিরে আমার এখানে আসবে। একটা মস্ত ভুল হয়ে গেল। অবশ্য তৃণার কথার ঠিক নেই। ভুলে যাবে। ভুলে গেলেই বাঁচি। বলেই রাজিয়া কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে বেরিয়ে এসে মিল্লাতকে ডাক দিল, এসো। ঘরে এসে বসবে। একটু সংসারী কথা বলব।

মিল্লাত ঘরে ঢুকে চেয়ারে বস্‌ল। পড়ার টেবিলের কাছে রাজিয়া। রাজিয়া খাটে বসে বলল, মস্ত ভুল করলাম। তোমার কোন কিছুতে বিরক্তি আসুক আমি চাই না। আমার আত্মীয়স্বজন এসে, বন্ধুরা এসে এ-বাড়িতে দাপিয়ে যাক, আমি চাইব না। সেকথা বলেছি আগেই। তুমি যদ্দিন আছো, একটা বোঝাপড়া করেই চলতে হবে। আসলে আমার জীবনটা এত বাজে, কী বলব, খুব নোংরা। ধাঁধার মতন, গোলকধাঁধার মতন শুধুই জটিল। পথ নেই। বাধ্য হয়েই তোমাকে উপদ্রব করছি। কোথাও আমি পৌঁছতে পারছি না। কখন কোথায় কাকে কী বলছি, মাথার ঠিক নেই। জেদ বড় খারাপ জিনিস। কেন যে এখানে এলাম? যাক গে। শোনো। তা তোমার আব্বা কেঁদেছিলেন কেন?

রাজিয়াকে হঠাৎ কেমন অস্থির দেখাচ্ছিল। কথাগুলো কেমন অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। মিল্লাত হেসে ফেলে বলল, তুমি সাদিকের কথা বলবে বলছিলে।

—ও হ্যাঁ। তাই বটে। আমারই দোষ। সাদিক তো আসবেই।

রাজিয়া কেমন নীরব হয়ে যায়। তারপর ঝরঝর করে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ এভাবে রাজিয়া কাঁদতে পারে, মিল্লাত ভাবতে পারেনি। খানিকটা অপ্রস্তুত হয় মিল্লাত। চুপচাপ উঠে বাইরে চলে আসে। সহসা অত্যন্ত আকূতি মিশে যায় রাজিয়ার কণ্ঠে, তুমি চলে যেও না মিল্লাত। আমি সব বলছি।

রাজিয়া তারপরই ভাবে, না, এভাবে নয়। কার কাছে কী বলতে চাইছে সে। অত কান্নাই বা কেন? এ-জীবন কারো করুণা চায় না। সৎপুত্র শত্রুই। গাঁয়ের রেওয়াজ সৎ-মাকে ঘেন্না করা। সৎমা কি সৎপুত্রের মুখে বিষ তুলে দেয় না? দেয় বৈকি! এ-বাড়ি আমার, এখানে আমিই থাকব। যা খুশি করব। যেমন খুশি চলব। অত তোয়াজ কিসের? ভাবতে ভাবতে দৃঢ় হয়ে ওঠে রাজিয়ার

মেরুদণ্ড। মিল্লাত আবার ফেরে। আবার চেয়ারে বসে। বলে, তৃণার সঙ্গে কী কথা হল তোমার ? রাজিয়া বলল, তোমার বাপের কাছে আমি কিন্তু তালাকই চেয়েছিলাম। খালাস নয়। তোমার মায়েরা "ওমা সেকি কথা !" বলে ঢঙ করছিল। "তালাক কিসের চাস, খালাস নে ! ওগো শুনছ, রাজিয়া তোমার কাছে খালাস চাইছে।" এক মা হাজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে "খালাস দাও" বলে বিড়বিড় করছিল। আমি তালাকই চেয়েছিলাম। বুড়ো খালাসটুকুও দেয়নি। তাহলে এই বাড়ির অধিকার আমি ছাড়ব কেন ?

মিল্লাত লজ্জিত হয়ে বলল, অলরাইট।

তবে তৃণাকে ঠিকই বলেছি আমি। আমরা এখন শহরের বাড়িতে আছি। আমরা মানে, আমি আর তোমার মরহুম পিতা। তুমি যে বলেছিলে 'তোমাদের বাড়ি'। সেটার মানে হল, আমি আমার মৃত স্বামীকে নিয়ে একটি ধূসর বাড়িতে থাকি। তার কান্না শুনতে পাই। কী বলে কেঁদেছিল তোমার বাপ ? বল বল। শুনি একবার। ইটস্ লাইক এ পোয়েট্রি।

রাজিয়া পাগলের মতন কঁকিয়ে উঠল। বলল, এইরকম সুখের মুহূর্তে মানুষের উপকার করা ভাল। আমি সাদিকের উপকার করব। আমার গাঁয়ে আমার কিছু সোস্যাল ওয়ার্ক আছে। সেটা শুনতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। আগে একটু চা করা যাক। রাজিয়া খাট থেকে লাফিয়ে নামল। রান্নাঘরে চলে গেল দ্রুত। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসে। তারপর সন্ধ্যা হয়। টুকিটাকি কাজ শেষে চা করে রাজিয়া চায়ের কাপ মিল্লাতের কাছের টেবিলে রাখল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের কাপে চুমুক দিল। তারপর চুমুক দিতে দিতেই খাটের কাছে সরে এসে একদণ্ড দাঁড়িয়ে ফের চুমুক দিয়ে খাটে বসল। কাপটা পাশে রেখে বলল, মাথার ঠিক নেই। তোমাকে ঠিকমতো সব কথা বোঝাতে পারব না। কিন্তু তোমার কাছে, মনে মনে একটা ধারণা থেকে মনে হচ্ছে, বললে বোধহয় তুমি বুঝতেও পার। আচ্ছা, বল ত, তুমি তোমার বাপের মৃত্যুর সময় সীতাহাটি যাওনি কেন ? তুমি যাওনি বলে অনেক সমালোচনা কানে আসছিল। বুঝেছিলাম তুমি যে যাওনি, সেটা একটা মস্ত ব্যাপার সংসারে। তখন তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম, তোমাকে একবার দেখি। সেটা যে এইধারা ছন্নছাড়া দুশমনী করে করতে হবে, সত্যিই বলছি ভাবতে পারিনি।

মিল্লাত তখনও চা মুখে তোলেনি। বলল, তুমি সাদিকের কথা বলতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই ছেলেটি ভাল নয়। তোমার আশ্রয়ে থাকছি বলে আমারও একটা কৃতজ্ঞতা আছে। তাছাড়া বাপের

জন্য আমি নিজে তোমার কাছে খুব লজ্জিত। আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হলে খুশিই হই।

রাজিয়া বলল, দ্যাখ, হঠাৎ আমার উপরটা জেনে অনেকেই পয়লা যেচে সাহায্য করতে আসে। পরে যখন ভেতরটা দেখতে পায়, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আমি যে লোভী, সেকথা ঠিক। সামান্য কিছু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যেমন তৃণাকে আমি সত্য বলিনি। বলতে পারিনি সব কথা। আমি স্বাভাবিক নই। আমি বিকৃত। বায়ুগ্রস্ত। পাগলও বলতে পারো।

অল্প শব্দ করে রাজিয়া হাসতে লাগল। চায়ে চুমুক দিল। আবার পাশে রাখল কাপ। মিল্লাত প্রথম কাপ ওঠালো ঠোঁটে। একবার টেনে চুমুক দিয়ে ঘনঘন চোখ চলে যেতে লাগল রাজিয়ার দুঃখিত নিরাভরণ সৌন্দর্যের দিকে। মায়া হচ্ছিল। বুকের ভেতরটা আচমকা শিরশির করে উঠছিল। বলল, গাঁয়ে লেখাপড়া শেখা মেয়েদের অনেক কেচ্ছা থাকে। তোমারও নিশ্চয় আছে। সেইসব বলছ? তোমাকে সবাই খারাপ বলে, ইত্যাদি। জানি। মবিন এইধারা কীসব ইংগিত করছিল সেদিন। এইভাবে যেসব মেয়ে নিজেদের বিতর্কিত করে তোলে খানিকটা, আমি তাদের ভেতরটাকেই ভালবাসি। মানে শ্রদ্ধাই করি, তুমি আমাকেও কিছু মিথ্যা বলতে পারো, তা দিয়ে তোমার আসলটুকু তো ঢাকা পড়ে না। তোমার স্বামী মরেই যাক আর রিটায়ারই করুক, কথা যাই হোক, তুমি যে খুব একা, এ কথা তৃণা না বুঝলেও আমি বুঝেছি।

এমন স্নেহ জীবনে খুব কমই পেয়েছে রাজিয়া। মিল্লাতের কথায় অত্যধিক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। সমস্ত শরীর ভেতরের দিকে থরথরিয়ে কেঁপে যাচ্ছিল মৃদুমৃদু। হাতের কাপ কাঁপতে শুরু করেছিল।

রাজিয়া চায়ের শেষ দফা গলায় নিংড়ে কাপটা খাটের তলায় চালান করে দিয়ে বলল—ক্লাশ নাইনে যখন পড়ি তখন আমার বিয়ে হয়। আমার মা তালাক হয়েছিল যখন আমি শিশু। তালাকের পর মা অন্য গাঁয়ে ফের নিকে করে চলে যায়। আব্বাও বিয়ে করে সেই একই বছর। আমি নানীর কাছে মানুষ। একটু দম নিয়ে ফের বলতে থাকে রাজিয়া—নানীর কিছু সামান্য জমি জিরাত ছিল। নিজের ছেলে ছিল না। মা-ই একমাত্র সন্তান। তা জমিজায়গা যা ছিল, তাতে করে ভাগ-ফসলে সংসার চলত না। নানী মাঝে মাঝেই গেরস্ত ঘরে সাহায্য চাইত, সেটা একপ্রকার ভিক্ষে বলা যায়। নানীর খবরদারি করত আমার সৎ ভাইয়েরা, মামাত ফুপাত সৎ যারা ছিল। নানীর মতন ভিখিরী বড় একটা হয় না। আমি সুন্দরী বলে গর্ব করত। আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে যাচ্ছিল, গেরস্ত

ঘরে আমার লেখাপড়ার নাম করে সাহায্য চাইত। গাঁয়ের মানুষ নানীর এই ধারা সাহায্য চাওয়ার ভাষা শুনে নানীকে বিশ্বাস করত না। ভাবত নানী নাতনীর পড়াশুনার নাম করে আসলে পেটের ভাত জোগাড় করে বেড়ায়। ক্লাশ নাইনে যখন উঠলাম, গাঁয়ের মানুষ শঙ্কিত হয়ে পড়ল পাছে একটা ভিখিরির মেয়ে না সত্যি সত্যিই হাকিম হয়ে যায়। তবু নানী নিরস্ত হয়নি। ভাইয়েরা দল বেঁধে চাপ দিচ্ছিল বিয়ের জন্য। গাঁয়ের প্রতিবেশী জ্ঞাতিকুটুম্বরা চাপ দিচ্ছিল। অন্য সবাই চাপ দিচ্ছিল। আনোয়ার সব কিছুর হোতা, তারই উদ্যোগে তোমার বাপের প্রস্তাব এসেছিল। বলতে বলতে একদণ্ড থামে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই বলে—তার আগে গাঁয়ের পাঁচটা অশিক্ষিত জোয়ান বা স্বল্প লেখাপড়া জানা সুখী গেরস্ত ঘরের দানোরা আমাকে শাদী করতে চেয়েছে। স্কুল যাওয়ার পথে হামলে বসে থাকত। ভিন্ন গাঁ থেকে কিছুটা ভাল বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু নানীরও একসময় মনে হল, আনোয়ারের প্রস্তাবই সবচেয়ে আক্রা। কারণ হাজী মস্ত লোক, অবস্থা বিরাট। সুখে থাকবে নাতনী। আমি প্রবল আপত্তি করি। গোল বাধাই। আমার কথা ঘরের ন্যাতার সমান মূল্য দেয় না ওরা। মিল্লাত বলল—বুঝতে পারছি আত্মীয়রা কীভাবে সব করছিল। তোমার আপত্তি টেঁকেনি। আর হঠাৎ করে রাতারাতি একপ্রকার ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে আব্বার সঙ্গে কলমা পড়িয়ে একটা জুলুম করল ওরা। সেটা আদতে বিয়েই ছিল না। তুমি বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলে। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু সাদিকের উদ্দেশ্য কী?

রাজিয়া বলল—সেটাই বলছি এবার। তুমি দেওয়ালে হাত দাও। ওখানে সুইচ আছে। আলো জ্বালো। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ঘরে আলো জ্বলে। রাজিয়া বলতে শুরু করে—না। সাদিক তো অনেক পরের কথা। আগে আমার চারপাশের পড়শী, জ্ঞাতিকুটুম্ব, যারা সব ঘিরে ছিল আমাকে। তাদের পরিচয় না হলে বুঝবে না, কী থেকে কী হয়েছে। সবাই নিম্নবিত্ত, চাষীবাসী, ক্ষেত-মজুর। বৈদ্যবাটির পশ্চিম পাড়া হল আসলে পাড়া হিসেবে কাহারপাড়া নাম। কেউ অবিশ্যি কাহার নয়। পালকি নেই কারো। আমার মা স্বরূপপুরের মেয়ে। মা তার মাকে সঙ্গে করে, বিয়ের পর কাহারপাড়ায় আসে। নানী তার স্বরূপপুরের সম্পত্তি বেচে কাহারপাড়ায় কিনে নেয়। বৈদ্যবাটির সম্পত্তির দাম স্বরূপপুরের তুলনায় আধাআধি। ফলে নানীর সম্পত্তি কমে যায়। নানী গরিব হয়। কিন্তু কাহারপাড়ার পরিচয় দেওয়া হল না।

কথার মাঝে বাধা দিয়ে মিল্লাত বলে—দাঁড়াও ! একটা সিগারেট খাব। ও ঘরে প্যাকেট পড়ে আছে। নিয়ে আসি।

মিল্লাত তার গুমোট ঘরে এসে প্যাকেট নেয়। প্যাকেট আর দিয়াশলাই নিয়ে ফিরতেই রাজিয়া বলে—তোমার কাঠিটা দিও। একটা ধূপবাতি জ্বালব।

ঘরে ধূপবাতি জ্বলে। রাজিয়া টেবিলে ধূপবাতিদানে কাঠি গুঁজে দিয়ে খাটে এসে বসে। শুরু করে কাহারপাড়ার পরিচয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো !

—না। বল তুমি।

—হ্যাঁ এ্যাঁ ! হচ্ছ না তো ! তবে শোন। কাহারপাড়ার সবাই ওরা চৌধুরী। বিহারের চৌধুরী। চৌধুরী আর চৌধ্‌রী এখানে বোধহয় আলাদা। ওখানকার কেউ ওরা ওরিজিনাল বাঙালি নয়। লোকে বলে, ওরা যাঁতাপাটা বিক্রি করতে এসে কাহারপাড়ায় বসতি করে। সবাই ভীষণ কালো। কোন বাড়িতে ফর্সা মানুষ পাবে না।

মিল্লাত আশ্চর্য হয়—তাই নাকি !

রাজিয়া বলে—হ্যাঁ। সবাই রীতিমতো কালো। আমি সমাজবিজ্ঞানী হলে, নৃতত্ত্ব জানলে তোমাকে বলতে পারতাম, কেন ওরা এত কালো। আমি স্কুলের হেমন্তস্যারের কাছে প্রায়ই শুনতাম, সমাজবিজ্ঞানে এই কালোত্বর একটা ব্যাখ্যা আছে। স্যার জানতেন কিছুটা। ঐ পাড়াটাকে নিয়ে স্যারের একটা মারাত্মক কৌতূহল ছিল। মাঝেমধ্যেই আমাদের পাড়ায় ঘুরতে যেতেন। তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারে আমাকে একটা বিপদের মাঝখানে ঠেলে দিয়েছিলেন। এই অধ্যায়টা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

মিল্লাত বলল—সবই তো মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মেলাতে পারছি না, তুমি কেন হাজীকে বিয়ে করলে, এত জেনেশুনেও তুমি ভুল করলে কেন ?

রাজিয়া বলল—ভুল ছাড়া কী করে ট্রাজেডি হয় মিল্লাত ! আর আমি কতটুকু জানি। যা শুনছ, সবই হেমন্ত মাস্টারের কথা, তখন এসব কিছুই বুঝিনি। মাস্টারমশাই ক্লাশে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার ফর্সা রঙের, সৌন্দর্যের একটা অহেতুক তুলনা করতেন। প্রায় রোজই একবার দুবার কী যে হত তাঁর, একেকদিন একেক প্রসঙ্গে কথা উঠত, আমি কেন ফর্সা হলাম। ওরা কেন কালো। তাছাড়া ওরা এত ডালমেরিট কেন ইত্যাদি। এই আলোচনার প্রতিক্রিয়া আমার জীবনে ট্রাজেডি ঘটিয়েছে।

রাজিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দণ্ডভর চুপ করে থাকে।

মিল্লাত বলে—বুঝতে পারছি।

—তোমার পড়শীর ছেলেমেয়ের সঙ্গে তোমার রঙ আর বুদ্ধির তফাত নিয়ে একটি মানসিক ব্যবধান তৈরি হল। একটা বিদ্বেষ বলা যায়। সবাই তোমাকে আলাদা করে দিয়ে ফের তোমাকে...

—হ্যাঁ। আমাকে ওরা সহ্য করতে পারছিল না। আমার মধ্যেও কমপ্লেক্স তৈরি হল। যারা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি, পরে তাদেরই ভেতরকার পড়া ছেড়ে দেওয়া চাষার ছেলে আমাকে তীব্রভাবে কামনা করেছে। ফলে, তাদের অভিভাবকরা কখনও আমার কল্যাণ চায়নি। আনোয়ার তাদেরই একজন। ও আমার আপন ফুপাত ভাই নয়, জোড়াতালির সম্পর্ক। কিন্তু ঘটনা আরো জটিল হল অন্যভাবে। বলছি।

রাজিয়া থেমে গেল। শুধাল, তুমি কি ঘন ঘন চা খাও ?

—কেন ?

—না। খেলে পর আর একবার করতাম।

—তোমার ইচ্ছে হচ্ছে ?

—না। তা নয়। ভাবছি, আমার কেচ্ছা বোরিং কিনা। তোমাকে তাই সাদিককে নিয়ে একটা সাসপেন্সে রেখেছি। নইলে এত কথা শোনা যায় না। যাক গে, শোন। এবার আসল কথা বলি। আবার থামল রাজিয়া। বলল, আমি কোনভাবেই মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নই। কারণ আমি একটা অদ্ভুত কমপ্লেক্স থেকে জীবনের ট্রাজেডির দিকে গেছি। ওরা আমার কল্যাণ চাইত না। কিন্তু আমাকে ব্যবহার করতে চাইত। মেয়েরা সব কালো, বাইরে বিয়ে দিতে গিয়ে ওদের বেশ সমস্যা হত। অধিকাংশ বিয়ে হত নিজেদের মধ্যে। যখনই বাইরে বিয়ে দিতে গেছে আমাকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছে। আমার রূপ, আমার সৌন্দর্য। আমার মেধাও বুঝি বা। কারণ কনে দেখলেই তো বিয়ে হয় না। কালো মেয়ে। সমস্যা। নিচু ক্লাসে যখন পড়ছি, তখন থেকেই শুরু। মুখ দেখাই আমি। বিয়ে হয় অন্যের। এই যে চাতুরি, সেটা একটা কী বলব, দোষের কিছু নয়। গায়ের লোক ভাবত।

রাজিয়া বলল, মেয়ের অভিভাবক এইভাবে অনেক মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছে বাইরে কোথাও। তা নিয়ে পরে অশান্তি হয়েছে কতক। বর এসে অষ্টমঙ্গলায় আমাকে ডেকে গল্প করত। দেখেছি জামাইয়ের চোখে সুপ্ত আগুন। লালসা। কিন্তু এটাই আমার সোসাল ওয়ার্ক। হাজীর ঘরে তিনদিন ছিলাম। পরে চলে

এসে আবার মুখ দেখানি হয়েছে আমার। পাশের গ্রামগুলোয় একটা ছড়া চালু আছে।

পাব্ খাটো লম্বা দাড়ি
তার দ্যাখ গে হুদোয় বাড়ি
চামড়া কালো বৈদ্যবাটি
রূপের বাহার দাঁতকপাটি।

রাজিয়া মিষ্টি করে হেসে বলল, সেসব ব্যঙ্গের কথা। পাব্ বোঝো তো?

মিল্লাত হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ, বুঝি। হাতপায়ের এক ভাঁজ মানে গ্রন্থি থেকে আর এক ভাঁজ, সেই দূরত্বকে পাব্ বলে। জানি। যেমন কিনা বাঁশের পাব্। আচ্ছা, তাহলে এইজন্যই সাদিক এসেছিল?

রাজিয়া ভারি গলায় জবাব দেয়, হ্যাঁ। এসেছিল। আমাকে যেতেই হবে। পালিয়ে এলাম। আমার রূপ আমাকে মুক্তি দিল না। এই রূপের দিকে চেয়ে তোমার দাদীমা মজেছিল। তোমার বাপও। কারণ হাদীসে হজরত নবী কি বলেছেন জানো? তিনি তিনটি জিনিস নিজের জন্য আর নিজের উম্মতের জন্য সবচেয়ে পছন্দ করতেন। সুন্দরী নারী নামাজ আর আতর। আমাকে পরশুই যেতে হবে। নৈলে ভবিষ্যতে আমাকে খুন করতেও পারে।

কথা শেষ করে রাজিয়া রান্নাঘরে একলা চুপচাপ চলে এল। মিল্লাতের সব অনুভূতি কেমন ক্লান্ত আর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সে চুপিচুপি রান্নাঘরে এসে উঁকি দিয়ে দেখল, রাজিয়া আঁচল দিয়ে নিজের চোখ বার বার মুছে ফেলছে। চোখের জল আটকাতে পারছে না। চকিতে মিল্লাত সেখান থেকে সরে চলে আসে। রাজিয়ার ঘরেই ফিরে আসে। খাটে আধ-শোয়া হয়। একটা ম্যাগাজিন চোখের ওপর টেনে নেয়। চোখ বুলিয়ে যায়। মন বসে না। রাজিয়ার কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে থাকে। তোমার দাদীমা মজেছিল। তোমার বাপও। ভাবনার মধ্যে চমকে ওঠে মিল্লাত। সটান উঠে বসে। ম্যাগাজিনখানা বিছানায় ফেলে দেয়। বাপ রাজিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। রাজিয়ার কনুই পুড়িয়েছিলেন। তারপর এলেন মায়ের মৃত্যুর কান্না কাঁদতে। বললেন, আমায় তুমি খবর অবধি দাওনি মিল্লাত। দাদীমা শুধু তোমার একার ছিল না। মা বেঁচে থাকলে আমি এই বিয়ে করতাম না। মা এই বিয়ে রুখে দিতেন। আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁরই ছিল। তিনি চলে গেলেন, আমি একফোঁটা সাড় পাইনি। মা। মা গো!...

নিসার হোসেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন, বড় পাপ করেছি খোদা। মাবুদ

আমাকে মাফ করিস ভাই।

গলা থরথর করে কাঁপে। শুকনো গলায় ডুকরে ওঠেন নিসার হোসেন। বলেন, মা অত্যন্ত বুড়ো হয়েছিলেন। চোখে দেখতে পেতেন না, তবু নাতীকে রেঁধে খাওয়াতেন। সেই পরিশ্রম মায়ের সইল না। ছোটলোক ছেলে মাকে সীতাহাটি পৌঁছে দেয়নি। মা নিশ্চয় আমার কাছে যেতে চেয়েছিলেন। মা গেলে পর এই সখের বিয়ে কস্মিনকালেও হত না। আমি পাপী মা গো! এরা সব পর। আত্মার কেউ না। দুশমন!

॥ পাঁচ ॥

—মেয়েটি আমার কেউ না। পড়শীর মেয়ে। লতাপাতায় সম্পর্ক কিছু থাকতেও পারে। সাদিকের মামাত বোন। বেশ বয়স হয়েছে। বিয়ে হচ্ছে না। কাল বাদ পরশু ফিরব। সাবধানে থেকো। পারো তো হাত পুড়িয়ে রেঁধে নিও। হোটেলে অযথা খরচ হয়। কিছু চাল আর সবজি এনে রেখো। ড্রয়ারে টাকা রইল। চাবিটা তাকে রেখেছি।

মিল্লাত বলল, যাচ্ছ যাও। কিন্তু কাজটা ঠিক নয়। খুব ছোট কাজ।

রাজিয়া বলল, জানি। সব বলেছি তোমাকে। আমি নিরুপায়। ওরা ছাড়বে না। সাদিক একটা বদ ছেলে। আনোয়ার চামার। তবু যেতে হবে। তবে এইই শেষ। আর না।

রাজিয়া চলে গেল বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি এসে দেখল, মুখ-দেখানির প্রস্তুতি তেমন কিছুই নয়। কালো মেয়ে রুহানীর গয়না পরে বসতে হল পরের দিন বাহারপুরেব লোকগুলোর সামনে। বরের এক ভাই গত সন এই বৈদ্যবাটির বর হয়েছে। কথাটা মনে পড়ে গেল আর সেই ছোকরাও আসরে এসেছে ছোট ভাইয়ের কনে দেখার জন্য। রাজিয়ার মুখ মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল। মনে হল এই মুখ দেখানির পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে। গয়না শাড়ি পারফিউম যা কিছু সব মিলিয়ে সব রঙ গন্ধ পালিশ হঠাৎ রাজিয়াকে ভীত ত্রস্ত কবে তুলল। ওরা মুখ ভাল করে না দেখেই মন্তব্য করল, মেয়ে আমাদের পছন্দ। অনুমতি হলে আজই বিয়ে করিয়ে টাঙ্গায় উঠাব মুণ্ডলজী।

রাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখ দেখানির আসর থেকে উঠে চলে এল। তখন আনোয়ার ধমকালো, চলে এলি ক্যানে! শুধুপুছ কিছুই হয়নি। বিহা বললেই বিহা হয় না। যা।

রাজিয়া বলল, ওরা আমাকে চেনে। ঘরে এসো বলছি।

আনোয়ার আসলে সবই জানত। তবু রাজিয়ার কাছে আসে। ঘরে এসে রাজিয়া সব পোষাক খুলে ফেলে। মুখের রঙ গন্ধ কাপড়ের আঁচলে রগড়ে মুছে ফেলে। তারপর বলে, আমাকে বাসে তুলে দিয়ে এসো। আম থাকব না। তুমি জানতে না, ওরা কারা ? ওদের রোখ আছে ! অপমান ভোলেনি। কেন ডাকলে আমাকে ? একদণ্ড দাঁড়াব না। চলে যাব।

আনোয়ার বলল, কিন্তুক এই ধারা চলে গেলে রুহানীর সাদী হবে না। চেল্লালে পর সব জানাজানি হবে। ছুঁড়ির আর সাদীই হবে না। তুই চুপ থাক। সন্ধেবেলা বাসে তুল্যা দিব। চলে যাস্। এখুন চুপ থাক।

—না। এটা রুহানীর উপকার নয়। আমার সর্বনাশের চেষ্টা। না যাও, আমি একাই চলে যাচ্ছি। বলেই রাজিয়া নিজের শাড়ি পরে নিয়ে বাইরে চলে আসে। বিয়ের বর পক্ষ হৈ চৈ করে ওঠে। কনে পালাচ্ছে কেন ? আমরা তো তৈরি। ধর ওকে। যেতে দিও না। আমাদের ছেলে কি ফেল্না ? এভাবে কেন অপমান করছেন ? পিছা সাল এই মেয়ে দেখিয়ে অন্য মেয়ে চালিয়ে দিয়েছেন। এবার আমরা ঠকছি না। এখনই কলমা পড়িয়ে টাঙ্গায় তুলব।

দুজন ষণ্ডা ছেলে রাজিয়ার পথ আটকায়। হিঁচড়ে টেনে আনে রাজিয়াকে উঠোনে। রাজিয়া ক্রোধে অপমানে ত্রাসে শক্ত হয়ে ফুঁসে ওঠে। তখনই মবিন রুগী দেখে চলে যাচ্ছিল পথ দিয়ে। গোলমাল শুনে বাড়িতে সাইকেলসহ ঢুকে পড়ে। মুহূর্তে সব ঘটনা একটুখানি শুনেই বলে, দোষ তো আপনারই। রাজিয়াকে বলে মবিন। কেন এই ধারা নাচেন ! আপনার মর্যাদা বলে কিছুই কি নেই ? আপনি হাজীর বিয়েতেও না করেননি। তখন না হয় ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন তো বুদ্ধি পেকেছে। আপনি এই গাঁ ছেড়ে কোথাও চলে গেলেই তো পারেন।

আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আ রে উকে আমি যত্ন কর‍্যা শহরে রেখে এনু ভাই। তা মেয়্যা মুখ-দেখানির লোভে ছোকছোঁক করে কিনা। তাই তু বলতেই মচ্ছবের হাড় চুষতে হাজির ! আপনি না এলে আজ কুরবানী হত। আমি একলা ঠেকাতে পারি ? সব লোক মজা মারছে, আমার অপমান। যান উকে বাসে তুল্যা দ্যান, সাথে যান মবিন ভাই। না হলে ছেলেরা নাজেহাল করবে।

মবিন রাজিয়াকে আগলে নিয়ে আসে বাস স্ট্যান্ড অব্দি। শুধায়, পরিস্থিতি এমন হল, অথচ আপনি আগে থেকে কিছুই গন্ধ পেলেন না ? আশ্চর্য ! রাজিয়া কোন উত্তর করে না। সামনে হনহনিয়ে ছোটে। পেছনে সাইকেল গড়িয়ে বি-এ

পাশ হাতুড়ে ডাক্তার মবিন সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ডাক্তারী ব্যাগ ঝুলিয়ে হেঁটে চলে। চলতে চলতে আবার শুরু করে, বৈদ্যবাটিতে আমার রুগীপত্তর কম। দৈবাৎ দু'একটা ডাক আসে। আসতে হয়। আজ এসেই নয়ন মণ্ডলের ঠেকে উঠেই শুনি, আপনার বিয়ে হচ্ছে। কোথায় বিয়ে ? না, বাহারপুর। বহারপুরের এমন বাহার কল্পনাও করিনি। আপনি গোটা দেশকে মাতিয়ে রেখেছেন। আপনার সম্পর্কে গাঁয়ে যা গাওনা হয়, না এলে বুঝতাম না, তাবত গ্রাম কত বড় বাহাস করছে। আপনি এইসব করেন কেন, ছোটলোকদের ঘৃণা করতে পারেন না ?

রাজিয়া আরো জোরে পা চালায়। নিজেও বোঝে না। কত জোরে ছুটছে সে। তার যেন বাহ্যবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। যেন সে আশ্চর্য নেশা করেছে। কোথায় ছুটছে, কেন ছুটছে কিছুই তার খেয়াল নেই। তার এই নীরবতা আর দ্রুত ছুটে পালানোর ক্ষিপ্রতা মবিনকে আরো প্রগল্‌ভ করে দেয়। মবিন বলে, প্রথম যেদিন আপনাকে সীতাহাটি মিন্নাতের বাপের মৃত্যুর সময় দেখি, খুব মায়া হয়েছিল। একবার মায়া হলে সহজে সেই মায়া মন থেকে পালায় না। তাই বলছি, আপনি লেখাপড়া জানা মেয়ে নিজেকে চিনবার চেষ্টা করুন। এক সস্তা মোহ আপনাকে এইসব বিপদের মধ্যে ফেলেছে। ভাবছেন, উপকার করছি। কিন্তু তার কোন মানে নেই। কাদের উপকার করছেন, তারা কি মানুষ ? নিজেদের মধ্যে বিয়ে ভাঙানীর কোঁদল করে যারা, আপন পর জ্ঞান করে না। অতি নিকটজনের মেয়ের বিয়ে ভাঙিয়ে আপন মেয়ের সঙ্গে সেই বিয়ে জুড়ে দেয়। তারা সব পারে। আপনি এইসব ভালই জানেন। তবু মুখ-দেখানির আসরে কনে সেজে বসেন, কেননা সেটাই আপনার রুচি। এইভাবে নিজের রূপকে ভালবাসা আর জীবনে না-পাওয়ার খিদেটা দুধের বদলে ঘোল করে মিটিয়ে নিতে গিয়ে একটা নেশার মতন হয়েছে আপনার। খুব শুদ্ধ করে বললাম। কিন্তু এইসব কথা যে ভাষায় গাঁয়ের মাতব্বররা আলোচনা করছে, তা ভদ্রলোক মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। আমার মাথা লজ্জায় নুয়ে গিয়েছিল। আমার ভীষণ রাগ হয়েছে আপনার উপর। আজ আপনি মিন্নাতের কাছে থাকছেন, মনে করি, সেটা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। এত কথা কেন বলি জানেন ? মায়া হয়। আপনার খালাস চাইতে গিয়ে কান্নার কথা ভোলা যায় না। এই গাঁয়ে কখনও আর আসবেন না। শহরে গিয়েছেন বরং নিরাপদ। তবুও নিশ্চুপ রাজিয়া। পথটা সংকীর্ণ। দুপাশে ঘন ঝোপ প্রসারিত। হঠাৎ সেই ঝোপের তলা থেকে চারজন যুবক উঠে এল। সাইকেলের ঘন্টি ঢিলে থাকায়

ঠুনঠুন করছিল। সেই শব্দ ওরা শুনেছে। একজন চাপা গলায় বলল, আরে সাথে দেখছি মবিন ডাক্তার। শালা গার্ড দিয়ে লিয়ে যাচ্ছে।

চারজন রাস্তার পাশে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। ওরা দুজন চুপচাপ জঙ্গলের পথ পার হয়ে আসে। মবিন ঘন করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, দেখলেন কী প্রবৃত্তি! শালা বলে গাল দেয়। সঙ্গে না থাকলে আপনাকে ছিড়ে ফেলত। দুঃখ করবেন না, আমি কিছু কটু কথা বলেছি। যাক। বাস বলতেই বাস পাওয়া গেল। উঠে পড়ুন।

বাসে উঠল রাজিয়া। শেষ মুহূর্তে বলল, ধন্যবাদ মবিন ভাই। আপনাকে মনে থাকবে। আপনি মিল্লাতের বন্ধু, তাই না?

বাস ছেড়ে দিল।

শহরের স্ট্যান্ডে এসে বাস যখন দাঁড়ায়, রাত তখন সাতটা বেজে দশ। বাস ছেড়ে রিক্সা ধরল রাজিয়া। সব উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। হৃদয় ক্লান্ত হয়ে গেছে। স্নায়ুকোষ শীতল। গ্রীষ্মের বুকে কখনও হঠাৎ ঠাণ্ডা বায়ু বয়। সেই হাওয়া দমকা বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাজিয়ার অবিন্যস্ত শরীরে। রিক্সার টিং টিং শব্দ হয়। মোহ। নেশা। রুচি। খিদে। রূপ। একটি একটি শব্দ রাজিয়ার কাছে আসে। পোড়া কনুই কেন এইভাবে ঢেকে রাখে সে? রূপ কী অসহায়। যৌবন কী চেয়েছিল? কনুই কেন পুড়ে গেল তার? বড় বউয়ের পায়ে বাসর ঘর থেকে ছিটকে আসে চৌদ্দ পনেরর একটি ভীরু যৌবন। বুবু আমাকে বাঁচাও, আমি বুড়োর কাছে শুতে পারব না। আমার ভয় করছে। বুড়োর চোখ দুটি জ্বলছে বুবু, মনে হচ্ছে মড়া। আমি পারব না। আমাকে তোমার পায়ের কাছে শুতে দাও। ভোর হলেই চলে যাব। ওরা শুনল না। জোর করে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। রাজিয়া বলল, আমি ভুল করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। বুড়ো হো হো করে হেসে উঠলেন।

তারপর ধ্বস্তাধস্তি শুরু হল। বুড়ো কিছুতেই কিশোরীকে বাগে আনতে পারেন না। ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান মেঝেয়। তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দরজা খুলে বড় বউকে ডাক দেন। বড় বউ আসেন। বারান্দায় চায়ের কেটলি ফুটছে কয়লার উনুনে। সেখানেই দুর্ঘটনা। বারান্দায় বেরিয়ে পালাতে যায় রাজিয়া। বড় বউ ধরে ফেলেন। হঠাৎ বৃদ্ধ কুৎসিত হেসে রাজিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বুঝেছিলেন, কিশোরী নিজেকে অক্ষত রাখতে চায়। বড় শুদ্ধ মেয়ে। কসবি। ফের ছুরির মতন কচি। বড় বউকে গা ছাড়িয়ে নিচ্ছে মেয়ে। ছিটকে গিয়ে সামলাতে পারে না আর। উনুনে তার ডান হাতের কনুই

ডুবে যায়। কেটলি উল্টে নিচে ফুটন্ত চাসহ পড়ে যায়। নিসার হোসেন রাজিয়াকে উনুনে চেপে ধরে বলেন, বার্নল লাগাও। দাগ পড়বে। মেয়ে যেন পার্বতী। সিনেমার পার্বতী। ছিঃ!

বড় অদ্ভুত সেই ছিঃ! ক্ষোভ বেদনা ক্রোধ কী নয়। কেমন সেই ছিঃয়ের অনুকার, বিপন্ন! চারিদিকে সেই একটা রুদ্র ঘৃণিত ক্ষুব্ধ ছিঃ ঘুরছে। কেউ নেই আপন। বড় একা এক গভীর নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব কোথাও পৌঁছতে পারছে না। মোহ আছে তার। লোকে বলে। রুচি অত্যন্ত হীন। লোকে বলে। হৃদয় বড় ক্ষুধার্ত। আর কী অদ্ভুত নেশায় কনে সেজে বসা। কেউ কখনও শুদ্ধ বিবেক, কোন স্বপ্নের নায়ক সামনে এসে দাঁড়াবে না। সেকথাও কি লোকে বলে? লোকে বলে সে একটা বিপজ্জনক ছিঃ!

দুতলার সিঁড়ির মুখে দুজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে সিগারেট টেনে টেনে কথা বলছে। ওরা বোধহয় বাসাড়ে। রাজিয়া রিক্সা থেকে নামে। এগিয়ে যায়। ওরা সিঁড়ির মুখ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। রাজিয়া ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। কানে আসে ওদের সংলাপ। একজন শুধোচ্ছে, কে এল? উত্তর হয়: বোধহয় মালিক বিয়ে করেছে। অত্যন্ত সুন্দরী। প্রশ্ন: আমাদের নেমন্তন্ন করল না? উত্তর: মালিক বলে কথা! আমরা যে ছাপোষা ভাই।

রাজিয়া উঠে আসে। ঘর অন্ধকার। আন্দাজে হাতড়ে 'অন' করে সুইচ। ঘর উদ্ভাসিত হয়। তারপরই লোডশেডিং।

রাজিয়ার অন্তর হাহাকার করে ওঠে। দেওয়াল ধরে কাঁপতে কাঁপতে খাটের দিকে এগোয়। এত দ্রুত আলো এসে নিবে গেছে যে ঘরের অবস্থা সে কিছুই দেখতে পায়নি। খাটে এসে আর্তনাদ করে ঢলে পড়ে। সমস্ত নরম উদ্বেলিত দেহ মিল্লাতের শরীরে দশ সেকেন্ড আটকে যায়। মিল্লাত ভয়ে বিস্ময়ে আর্তশব্দ করে: কে? কে অমন করছ?

—আমি মিল্লাত। আমি। ফিরে এলাম। গলা কাঁপছে রাজিয়ার।

—আলো জ্বালনি কেন?

তখনই আলো জ্বলে উঠল। দুজনই লজ্জা পায়। রাজিয়া ছিটকে ভয়ে কুঁকড়ে খাট থেকে নিচে নেমে ঢলে পড়ে যায়। এই অবস্থা দেখে মুহূর্তে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে মিল্লাত দ্রুত রাজিয়াকে স্পর্শ করে খাড়া করার চেষ্টা করে। চেয়ে দেখে কী বিধ্বস্ত অবস্থা মেয়েটির। শুধায়, কী হয়েছে তোমার?

রাজিয়া কথা বলতে পারে না। কাঁদতে পারে না। অকস্মাৎ তার সংবিৎ

হয়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। টলতে টলতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। মিল্লাত মুহূর্তের মতন হতভম্ব হয়ে পড়ে। ভাবে, আজ তো রাজিয়ার ফেরার কথা নয়। ফিরল কেন ?

বাথরুমে অনেকক্ষণ মাথায় জল ঢালে। সুস্থ হয় রাজিয়া। স্বাভাবিক হয়। ফেরে। শুধায়, খেয়েছ ?

—হ্যাঁ। হোটেলে।

—ঘর অন্ধকার করে ঘুমুচ্ছিলে কেন ?

—বার বার লোডশেডিং হচ্ছিল। পড়াশুনা করা গেল না। তাই অফ করে দিয়েছিলাম।

—ঐ ঘরে চলে যাও তুমি। ভারি শোনায় রাজিয়ার গলা। অথচ রাজিয়া এখন স্থির। মনে করে, সে স্থির হতে পেরেছে। মিল্লাত রাজিয়ার কণ্ঠ শুনে কেমন ভয়ই পায়। চুপচাপ উঠে নিজের ঘরে চলে আসে। আলো জ্বেলে একখানা বই খোলে। ঘুম আসে না। বুঝতে পারে না, বৈদ্যবাটিতে কী এমন ঘটল। অবশ্য ঘটবার মতন বহু কিছুই থাকতে পারে। ফের একবার শুধিয়ে দেখবে কিনা সিদ্ধান্ত করতে পারে না।

রাজিয়ার ঘর অন্ধকার। রাজিয়া কিছু খেয়েছে কিনা অন্তত ভদ্রতা করেও জানা, মানে প্রশ্ন করা উচিত ছিল। সময় অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যেতে থাকে। রাজিয়ার হঠাৎ একলা ভয় করে। কেউ নেই। মনে হয় মৃত স্বামী, মড়ার মতন দুইচোখ যার জ্বলন্ত, সে ছাড়া এই বাড়ি প্রাণহীন। রাজিয়া ভয়ে ঘর ছেড়ে মিল্লাতের কাছে আসে। অত্যন্ত আকুল হয়ে বলে, ঐ ঘরে যাবে একটু ?

—কেন ?

—চলো বলছি।

মিল্লাত কোন প্রশ্ন করে না আর। চুপচাপ এ-ঘরে আসে। রাজিয়া মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে হালকা কাঁথা পেতে নিয়ে একটা বালিশ ফেলে বলে, তুমি উপরে শোও। আমি নিচে।

—কেন ?

কেন আবার কী ? শুতে বলছি শোও। প্রশ্ন করো না। আমি সত্যিই নোংরা মেয়ে নই মিল্লাত। বিশ্বাস করো। আমি খারাপ নই। আমি বিপজ্জনক নই। আমি বিকৃত নই। আমি কখনও কোন পুরুষকে ছুঁই নি। আমি কোন পাপ করিনি।

বলতে বলতে রাজিয়া কান্না দমন করে। অন্যদিকে কাত হয়। বিমুখ করে

নিজেকে। তারপর নিঃশব্দে মিল্লাতের দিকে পিঠ করে কাঁদে। মিল্লাত অনেকক্ষণ খাটে বসে থেকে বুঝে পায় না কী করবে। বসেই থাকে। তারপর শুয়ে পড়ে ভাবতে থাকে, রাজিয়ার সত্যিই কী হয়েছে। এমন পাগলের মতন কথা বলে কেন ?

॥ ছয় ॥

ভোরে মিল্লাতের ঘুম ভাঙে। চোখ দুটি খুলে যায়। দেখে, রাজিয়া মেঝেয় বসে নামাজ পড়ছিল। জায়নামাজ গুটিয়ে উঠল। দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার ও অন্যান্য ফোটোগুলি ওল্টানো ছিল, নমাজের পর ফের উল্টে সিধে করে দিল। ঘরে কোন ছবি বা মূর্তি থাকলে নামাজ হয় না। তাই ফটোগুলি সে হয়ত উল্টে ঢেকে দিয়েছিল। ধূপবাতির গন্ধ আসছে নাকে। হাত দিয়ে টেনে পূবের জানালাটা খাটের কাছে এসে খুলে দেয় রাজিয়া। একটু বাদে গরম ফুটন্ত চা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দেয় মিল্লাত। উঠে বসে। চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আমি ভেবে দেখলাম, দুজনে ভাগাভাগি করে যখন খাচ্ছি, তখন তার একটা খরচ আমাকে অন্তত দিতে হয়। ও-ঘর থেকে আমার সার্টটা নিয়ে এসো। দেখবে দেওয়ালে টাঙানো আছে। রাজিয়া মুচকি হেসে ফেলে। তারপর গুমোট-ঘরে চলে এসে জামার পকেটে হাতড়ে দেখে ১২৫ টাকা মতন ছোট-বড়য় নোট। সামান্য কিছু রেজগি। হাতে জামা ফেলে টাকা গুনতে গুনতে এ-ঘরে আসে। বলে, সকালটা তাহলে শুরু করতে চাও টাকার হিসাব, দরদস্তুরে ? আমি বলছিলাম, যদ্দিন থাকবে, হিসাবপত্তর না হয় রইল। বন্ধুর কাছে বন্ধুও তো এভাবে দরদাম করে না।

—আমি যে ভাড়াটিয়া।

—না। তুমি ভাড়াটিয়া নও।

—তবে আমি কী ? পেয়িংগেস্ট ?

—না। আমার দুশমন। হল তো ?

—না। হয়নি। তোমার আমার সম্পর্কের কোন নাম নেই। ভেবে দেখেছি।

—হবেও বা। নাও। চা শেষ করো। টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিচ্ছি। দরকার মতো নেবে। কখনও আমার সঙ্গে হিসাব করবে না। যখন তোমার আমার সম্পর্কটাই হিসাব করে পাওয়া যায় না, তখন টাকার হিসাব কেন ? নিজেই জানি না, কদ্দিন এখানে এইভাবে কাটাতে পারব। কারো ক্ষতি করে তো থাকা যায় না।

—ক্ষতি ?

—হ্যাঁ। আমি থাকলে তোমার যদি ক্ষতি হয় ?

—ও। তার মানে আমাকে তুমি চলে যেতে বলছ ?

—মোটেও না। আসলে আমার স্পর্শ যে ভাল নয় মিল্লাত।

—আচ্ছা, কী হয়েছে তোমার ? বৈদ্যবাটিতে গেলে, ফিরে এলে হঠাৎ। মুখ শুকনো। ব্যাপার কী ? কোন কথাই বলছ না। আমি আসলে যে ঠিক তোমাকে···

—বল। থামলে কেন ?

—না থাক। তুমি ঠিক বুঝবে না।

—বলই না। আমি কি তোমার সত্যিই পর মিল্লাত ? কেউ নই ? কোন কিছু নই ?

এক নিঃশ্বাসে সমস্ত চায়ের প্রায় তলানি অব্দ শুষে নেয় মিল্লাত। কাপটা রাজিয়াকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—হ্যাঁ। ছোট মা। ছোট মা তুমি। কিন্তু আমার মধ্যে মা বলতে কোন আবেগ বেদনা স্বাদ কোন স্বপ্ন স্পষ্ট হয় না ছোট বউ। কোন নরম উপলব্ধি আসে না। কেন আসে না ! নিজেকে বড় নির্দয় মনে হয়। এতগুলি মা সংসারে, অথচ কারুকে ঠিক মা বলে ডাকিনি। ছেলেবেলায় দাদীমাকে মা বলেছি। বুদ্ধি হলে দেখেছি আমার কোন মা নেই। এটা কেন হল ? আসলে আমাদের খানদানীতে আমার মতন ছেলের সেটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল ? তুমি ঠিক বুঝবে না ছোটবউ। রাগ করো না। আমি মায়েদের ঐভাবেই ডেকেছি। বড় বউ। মেজ বউ। সেজ। ন'। ক্ষুদে। ছোট বউ। ফুলবউ। তুমি তবে ফুলবউ। দ্যাখো বলতে বলতে বাংলা ভাষার কী মাধুর্য এসে গেল। ফুলবউ। হা হা হা !

শুনতে শুনতে রাজিয়ার সমস্ত মুখ তীব্র ঝলকে রাঙা হয়ে গেল····

বিছানা ছেড়ে নামে মিল্লাত। ভোরবেলার সব প্রাকৃতিক ক্রিয়া শেষ করে। মুখ ধোয়। দাঁত পরিষ্কার করে। স্নান করে। ভাল পোশাক পরে। ভাল করে চুল আঁচড়ায়। তারপর ঘাড়ে পাউডার দেয়। বলে—ফুলবউ, আজ আমাদের সুপ্রভাত। সময় হল অ্যান্টি। অ্যান্টি রোমান্টিক এই যে সমাজ নামক একটা বিদঘুটে ব্যাপার। মানুষের সব সম্পর্ক, সব মন অ্যান্টি ইমোশনাল। আফটার অল লাইফটাই অ্যান্টি লিরিকাল। এমন কি গানটা অব্দি মানুষ গায়, আগের মতন নরম নয়। সব বদলে গেছে। কিন্তু আমার কাছে গাঁ-ঘরের ফুলবউ মরেনি। তুমি এই নামটা গ্রহণ করো। তোমার জন্য আমি একটা ফুলবাপজী

জোগাড় করে দেব। আমার বন্ধু মবিন ফাসক্লোস ছেলে। রাত্রে শুয়ে কেবলই ভেবেছি। আমার কিছু সোসাল ওয়ার্ক নেই। এইবেলা সেটা শুরু করা যায়। তাতে খানিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। চলি।

মিল্লাত টিউশনিতে বেরিয়ে পড়ে। টিউশনি শেষে মবিনের কাছে আসে। মবিন রুগি দেখছিল। ফার্মেসিতে অপেক্ষা না করে বাড়ির ভেতর চলে আসে মিল্লাত। জৈগুন খালা বড়ি দিচ্ছিলেন। হাতে সাদা লেই। কপালের চুল সরাতে গিয়ে কপাল আর চুলে সাদা লেই লেগে শুকিয়ে গিয়েছে। তিনি ব্যস্ত। কিন্তু মিল্লাতকে দেখেই বলে উঠলেন—তুমি বসো। আমি হাত ধুয়ে আসছি। রাজিয়া এসেছে শুনলাম। এখন তোমাকে ভুগতে হবে ঢের। মেয়ে তোমার ঘাড়ে চড়ে ডুগডুগি বাজাবে।

অভিজাত চেহারা। মধ্য বয়স সামান্য ঢলেছে। কিন্তু সৌন্দর্য যায়নি। পান খান প্রচণ্ড। গায়ে সব সময় ভাল জর্দার সঙ্গে প্রসাধনের একটা নির্দিষ্ট গন্ধ ভাসে। দাপটের সঙ্গে কথা বলেন। মিল্লাত এলেই বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। মবিনের এবং মিল্লাতের। আজও হাত ধুয়ে গামছায় মুছতে মুছতে মিল্লাতের কাছে এসে প্রথমেই বললেন—আর দেরি করো না। বউ নিয়ে এসো। ঘর বসাও। দেখবে কোথাকার উড়পুড়ি এসে ঘাড়ে পড়ল। বউ থাকলে না হক এত জ্বালা সইতে হয় না। তা শুনলাম, গতকাল নাকি বৈদ্যবাটিতে ঐ মেয়ে হরতাল বাধিয়েছিল। বিয়ের আসর থেকে মবিন টেনে এনেছে। জোর করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল। কিছু শোননি? বলেনি রাজি? মিল্লাতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। সে মৃদু মাথা নেড়ে মুহূর্তে কেমন সচকিত হয়ে ওঠে। তখনই মবিন বাড়িতে ঢুকে আসে। ফার্মেসি বন্ধ করে দেয়। বলে—হ্যাঁ, এই যে, এসেছ তা হলে? আজ না এলে কালই একবার যেতাম তোমার কাছে। ঘটনা সেদিন তুমি চেপে থাকলে কেন? বাড়ির দখল তো হয়ে গেছে? নাকি? এখন কী করবে ভাবছ? মা, ওকে কিছু খেতে দাও। দুধ চিঁড়ে আর কলা দাও। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে।

মিল্লাত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। এখানে নয়, একটু অন্যদিকে চলো। আমি কিছু খাব না। খালা মা ব্যস্ত হবেন না। আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। চলো, ওঠো তো।

মবিন কিঞ্চিৎ হতভম্বের মতন মায়ের দিকে দেখে বন্ধুর মুখে চায়। বলে—কী এমন গোপন কথা? মা সবই শুনেছে। এখানেই বললে কী অসুবিধা

হবে ?

মিল্লাত বলল—তবে আর বলছি কেন ? ওঠো। মিল্লাত উঠে পড়ে। মবিনও উঠে পড়ে বলে—বেশ। চলো। কোথায় যাবে ? চলো বাগানে গিয়ে কথা হবে। তোমাকে কিছু নতুন চন্দ্রমল্লিকার চারা দেখাব। নতুন। অন্যরকম।

ওরা বাগানে আসে। মবিন ফুলের গল্প শুরু করে। মিল্লাত বাধা দিয়ে বলে—আমি বৈদ্যবাটির কোন ঘটনাই জানি না। খালা হয়ত এভাবে উঠে আসায় রাগ করলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। আজ তোমার সঙ্গে একটু তর্ক করব ভাবছি। ওরা বাগানে পড়ে থাকা দুটি টিনের চেয়ারে মুখোমুখি বসে। সমস্ত বাগান আলোয় আর গুঞ্জনে ভরে আছে। মবিন বলে—বেশ তো ! তর্ক ছাড়া কবেই বা আলাপ হয়। বল কী বলবে ? বৈদ্যবাটির ঘটনা আর তুলো না। ভারি ন্যাসটিক। ইল্ কালচার ছাড়া সেখানে কী পাবে ? একটা কথা কী জানো, হাই সোসাইটিতে যাকে আমরা বিকৃতি বলি, সেটা নিচু তলাতে এসে হয় দুর্দশা। রাজিয়ার মাথাটা খারাপ। তোমার কাছে এসে ভালই করেছে। বাড়িটা যদি ওরই হয়, তবে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু ও তো একলা থাকতে পারবে না। ওর একটা পুনর্বাসন যাকে বলে, সেটা আমাদেরই করে দিতে হবে। তুমি বঞ্চিত হচ্ছ বটে। কিন্তু একটা জীবন বেঁচে যাচ্ছে। তবে রাজিয়াকে আর বৈদ্যবাটি যেতে দিও না।

মিল্লাত শুধাল—কী ঘটেছিল সেখানে ?

মবিন বলল—ভেরি স্যাড। আনোয়াররা ওর জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল। আমার মনে হয় এই ষড়যন্ত্রের পেছনে সাদিকের বুদ্ধি আছে। ওকে দু কথা বেশ করে বলা দরকার। আসুক একবার। চালাক ছেলে তলে তলে কাটে। স্পটে থাকে না। মুখ-দেখানি কিছু নয়। রুহানি বলে যে কালো মেয়েটার মুখ-দেখানি, তার বদলে রাজিয়া কনে সেজেছে। ঐ কাহাররা বরাবরই রাজিয়াকে ঐভাবে ইউজ্ করে। বোকা মেয়েটা কিরকম নেশাগ্রস্ত দ্যাখ, ঐ ট্র্যাপে বারবার যায়। কেন যায় আমি ভেবে পাইনি। ওকে খুব করে বকে দিয়েছি। বলতে পারো খানিকটা সেন্স দিয়েছি। কী করব, আমি না থাকলে ফেরার পথে রাস্তায় মেয়েটা রেপ হয়ে যেত। জোর করে টেনে আনলাম কিনা ! ওরা কিছুতে ছাড়বে না। মুখ-দেখানির আসরেই বাহারপুরের ওরা কলমা পড়াবে। কারণ ঐ মেয়েই গত বছর ওদের এক দেশের ছেলের বেলা কনে সেজেছিল। ভেরি স্যাড।

আচমকা মিল্লাত বলে ওঠে—তুমি বিয়ে করবে ?

মবিন মিল্লাতের কথায় চমকে ওঠে। মানে ?

—মানে, তুমি রাজিয়াকে বিয়ে করতে পারো না ? আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। বলতে পারো, আমি প্রার্থনা করছি।

মিল্লাতের চোখে পাতলা অশ্রু রেখা চিকচিক করে ওঠে।

—কী সর্বনাশ ! তা কী করে হয় ?

মবিন সহসা বেকুফ আর চিন্তিত, ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করে। বলে—আমি বিয়ে করিনি কেন ? তুমি কি জানো না ? দাম্পত্যের নামে কোন যন্ত্রণা আমি খরিদ করতে চাই না। শোন। অবুঝের মতন কথা বলছ কেন ? তুমি কি চিন্তা করে কথা বলছ ?

মিল্লাত কোন কথা না বলে বন্ধুর মুখের দিকে ভিখিরির মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। মবিন হঠাৎ এরকম প্রস্তাব দিতে পারে কল্পনা করেনি। কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। মবিন কেমন বোকার মতন গলায় অদ্ভুত শব্দ করে হাসে। হেসে বলে—এরকম কাঁচা কথা বললে কী করে ভাবতেই পারছি না।

মিল্লাত ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে—কথাটা কাঁচা বলছ ? কাঁচা ?

তারপর তখন মিল্লাতের কী যেন হয়, কেমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মবিন বলে—তাছাড়া মা এ বিয়ে মেনে নেবে না। কারণ রাজিয়া সম্পর্কে মায়ের ধারণা খুব খারাপ।

—তোমার ধারণা কী ? তোমার ধারণার কথা বলো ?

—তুমি কিন্তু আমায় ভুল বুঝছ।

—হ্যাঁ বুঝছি বৈকি ! কারণ ঐ কাঁচা কথাটা তোমার মুখে সহ্য হয় না। কে রাজিয়াকে বিয়ে করবে তা হলে ? বলো ? এই অবস্থায় তুমি কিছুটা কম বিদগ্ধ হলে খুশি হতাম। আমি লজ্জিত।

—এ সব কী বলছ তুমি ? আমি একটা ফ্রেশ মেয়ে চাই। বরাবরই তুমি সে কথা জানো।

—জানি। কিন্তু ফ্রেশ কথাটা আমি বুঝিই না। ফ্রেশ মানে যদি সতীত্ব হয়, আর সেই লোভ থাকে তোমার, তবে তোমার মতন গেঁয়ো ইন্টেলেকচুয়ালকে আমি ত্যাগ করতে চাই। রাজিয়া সম্পর্কে তোমার বেদনা কিসের বুঝলাম না। মবিন বন্ধুর চোখ থেকে চোখ টেনে নেয়। আকাশে চায়। চেয়ারে চিত হয়। বলে—তুমি বড় রেগে যাচ্ছ। বুঝতে চাইছ না। ওয়েল, কাঁচা কথাটা উইথড্র করছি। তোমার দাবী সত্য, কিন্তু আমি অপারগ। কেন অপারগ সেটা তুমি বুঝতে চাইছ না। এরকম তর্ক আমি চাইনি।

—বেশ। তা হলে আমি উঠি।

—না।

—কেন নয় ? চলে যাওয়াই তো ভাল। একটা মেয়ে ফ্রেশ কি না তার বিচার কী দিয়ে হবে ?

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ ? একটা মেয়ে ফ্রেশ কিনা, তবে শোন, বিচারটা ঐ মেয়ের রুচি দিয়েই হয়। রাগ করো না, রাজিয়ার রুচি যদ্দূর জেনেছি খুব লো। কারণ ও গ্রাম্য নোংরা রুচির লোকেদেরই ভিকটিম। তুমি ওকে জানো না। ঐ ভাবে যে মেয়ে মুখ দেখিয়ে বেড়ায় এবং রূপের গর্ব করে, আমার জীবন তাকে সইতে পারবে না মিলু। আমি কোন কাঁচা কথা বলিনি।

—ঠিক আছে, উঠি তা হলে ? আমি এতদিন ভুল বুঝেছিলাম। আমার চিন্তাই ভুল। আমার কেউ নেই। আমি একা। চলি। যাবার আগে বলে যাই, রাজিয়ার চেয়ে ফ্রেশ মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। একটু বোকা, একটু পাগল, কারণ বোকা আর পাগলরাই ফ্রেশ হয় মবিন। জানে না, কোথায় কেমন করে ফাঁদ পাতা আছে। চলি। পরে দেখা হবে। আজও বিয়ে করতে পারলে না যন্ত্রণার ভয়ে। সেই যন্ত্রণা, ডোণ্ট মাইণ্ড মবিন, বাইরে নয়, তোমার ভেতরেই আছে। নো দাইসেলফ্। বন্ধু বলে আজ তোমাকেই একটু সেন্স দিয়ে গেলাম।.....

মিল্লাত হনহনিয়ে বাগানের গেট অব্দি চলে এসেছিল। এমন সময় মবিন পেছন থেকে ডেকে উঠল—দাঁড়াও। এক মিনিট। অনেক অপমান করলে, আই মিন, অত্যন্ত ডিসটার্বিং ডিবেট হয়ে গেল। তবে উপদেশ আমিও দিই একটু। বললে বোকা আর পাগল, তাই না ? বন্ধুর সঙ্গে বোকা আর পাগলের বিয়ে দিতে চাইছ কেন ? যাকে গে। পাগল বা বোকা কোনটাই সে নয়। ওটাই ওদের স্টাইল। তা দিয়েই মজিয়ে তোলে। তুমি যে এভাবে সার্টিফিকেট দিচ্ছ, তাতে আমি খুব শঙ্কিত হচ্ছি। একটা অতৃপ্ত, বিকৃত মেয়ে তোমার সার্টিফিকেট পেয়ে যায় কোন যাদুমন্ত্রে, মাথায় ঢুকল না। বলি কি, আমি নিজেকে জানব বৈকি। বাট ইট অলসো হ্যাভ টু নো ইওরসেলফ। মিল্লাত পা বাড়িয়ে কড়া গলায় বলল—জানব। ভুল করলে ক্ষমা চাইব। বদলাব নিজেকে। আমি তাকে জানব, নিজেকেও। আজ যাই। কিন্তু জেনে রেখো, চোখের শুকনো জল অনেক দামি জিনিস, আমি শস্তায় কোন সার্টিফিকেট বিলি করি না। ও· কে· ?

মিল্লাত আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে চাইল না। মিল্লাতের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মবিন অস্ফুট বলল—পাগল।

পাগল হয়ে গিয়েছে।

মিল্লাত সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল। হন্তদন্ত বাড়ি ঢুকে রাজিয়ার কাছে এসে মৃদু হাঁপিয়ে গেছে এমনই ভঙ্গি, বলল—দ্যাখো ড্রয়ারে মুখ চ্যাপটা একটা চাবি আছে, ঐ সিন্দুকের। দাও তো! কুইক! তাড়াতাড়ি দাও।

—কেন অত ধোঁকাচ্ছ, মনে হচ্ছে মারামারি করে এলে কোথাও। কোথায় গিয়েছিলে? এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ অব্দি নিশ্চয় পড়াচ্ছিলে না? কী করছিলে? মবিনের বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি? বেলা গড়িয়ে গেল·····

—আহ্ চুপ করো! আগে যা বলছি করো। দাও চাবি দাও।

—দিচ্ছি। বাব্বা!

চাবি পেয়ে অস্থিরভাবে সিন্দুক খুলল মিল্লাত। বলল—দাদীমায়ের সিন্দুক। এই বাক্সটা দাদীমায়ের। এতে কিছু গয়না আছে। পরে ফেলো। তোমাকে ভীষণ নেড়া দেখাচ্ছে।

রাজিয়া শান্ত গলায় বলল—বেশ তো পরা যাবে। তা এত ছটফট করছ কেন? কী হয়েছে তোমার? মনে হচ্ছে তোমার হাতে সময় নেই, এক্ষুনি কোথাও যেতে হবে। কিন্তু শুনে রাখো, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কখনও কারুকে মুখ দেখাব না। তা ছাড়া ঐ গয়না আমি একবার পরেছি।

—মানে?

—পরেছি একদিন। তোমার দাদীমা একদিন ঐ বাক্স কাপড়ের তলায় লুকিয়ে আমার কাছে নিয়ে যান। পরতে বলেন। পরি। তারপর বলেন, আমার নাতীকে বিয়ে করলে, তুই এইগুলি পাবি। সব আমার। তোকে দিয়ে দেব।

শুনতে শুনতে মিল্লাতের সব উদ্যম কেমন সহসা ক্লান্ত আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। অকস্মাৎ পুরো ব্যক্তিটি নিবে গেল যেন। সিন্দুকের মাথায় বাক্সটা ঠক করে সশব্দে রেখে দিয়ে বলল—খেতে দাও। পেটে পিত্তি পড়ছে।

॥ সাত ॥

আশ্চর্য! আর কোন কথাই বলল না মিল্লাত। দ্রুত জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে খেতে বসে গেল। ভীষণ শান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল মিল্লাতের ছবি। খেয়ে যাচ্ছে কিঞ্চিৎ এলোমেলো। ঢকঢক জল খাচ্ছে। ওর প্রতিটি ভঙ্গি মেঝেয় সামান্য তফাতে বসে খুব গভীর চোখে লক্ষ করে গেল রাজিয়া। চুপচাপ খেয়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে মিল্লাত পুরোন অভ্যাস বশে গুমোট ঘরে না ঢুকে রাজিয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। খাটে এলিয়ে শুয়ে তৎক্ষণাৎ মনে পড়ায়

লাফিয়ে ওঠে। গুমোট ঘরে চলে আসে। চৌকিতে শুয়ে পড়ে। সিগারেট ধরায়। তারপর স্বগতোক্তি করে দীর্ঘশ্বাস মাখা—'শালা'! তারপর মনে মনে আউড়ায়—বলে কিনা বিকৃত। অতৃপ্ত। বলে কিনা রুচি নেই। এই আমার বন্ধু। আমার বাপের দোস্ত। আমার নয়। আমি শালা চিনতেই পারিনি। কী করে মবিনরা চিরকাল বৃদ্ধদেরও প্রিয় হয়! কী করে সমাজের সেবক হয়ে বসে? আমরা পারি না কেন? কেমন মেয়ে বিয়ে করতে চায়? ফ্রেশ মানে কী? শালা ফ্রেশ ফ্রেশ করে কেন? কী চায় ও? কেমন চায়? শালা একটা রুগি। শালা ডাক্তার নয়, মানুষ নয়। ও শালা কেবলই মুসলমান। কিন্তু ও যে আমার বন্ধু! হায়! বন্ধু যে! কী করি? দাঁতের চোয়াল শক্ত করে মিল্লাত প্রায় শব্দ করে বলে ফেলে—দাঁড়া। আমি তোর চোখ ঝলসে দেব। মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। অতৃপ্তি কাকে বলে, আমি তোকে দেখাব। খোদার কসম, আমি দেখাব। ও মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান। মাই ফ্রেণ্ড। তুমি সব দেখেছ, হুরি দ্যাখো নাই। তারপর ফের গেয়ে ওঠে—না রে মবিন! তোকে বুঝতে হবে, রাজিয়া সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। সত্যিই তো! আমি বন্ধুকে বুঝিয়ে বলিনি। আমারই ভুল। ইয়ংম্যান তোমাকে বুঝতে হবে।

মিল্লাত চুপ করে নিজেরই মনে বলা কথার নৈশব্দ্যে ছটফট করে।

এদিকে রাজিয়া সিন্দুকের উপর রাখা বাক্সের দিকে খাটে বসে বারবার দেখে। চেয়ে দেখতে দেখতে মনের কী বিচিত্রগতি, খাট থেকে নেমে সিন্দুকের কাছে এসে বাক্সটাকে ছোঁয়। ভেতরটা চমকে ওঠে। এমন সময় বাইরে হঠাৎ গলা বেজে ওঠে—ফুলবউ! থরথর করে কেঁপে যায় তাবৎ পটভূমি। বুকটা শিরশির করে ওঠে। ছলাৎ করে বুকের তলায় রক্ত দৌড়ে যায়। ভয়ে রাজিয়া দ্রুত এসে খাটে ঝাঁপিয়ে শুয়ে যায়।

ব্যস! 'ফুলবউ' বলে ডেকেই মিল্লাত ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আশ্চর্য! ঘুমিয়ে যাচ্ছে কেন মিল্লাত বুঝতে পারে না। বিছানায় উপুড় আর কাঠ হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে রাজিয়া। চোখ খোলে। তারপর একলা পাগলের মতন খলখল করে হেসে ওঠে। তারপর নিজের হাসি শুনে নিজেই ভয় পায়। কাঠ হয়ে যায়। দেয়ালের মিথুন-লগ্নতা দেখে অস্ফুট আর্ত বিহ্বলতায় দুই চোখ আতঙ্কে দু হাতের পাতায় ঢেকে ফেলে! বলে—মা গো! বুঝতে পারে, 'ফুলবউ' বলে, কেউ তাকে ডাকেনি। নইলে সে আবার ডাকত। তাহলে এই ডাক শুনল কেন সে? ধসমস করে উঠে বাইরে আসে। পায়ে পায়ে মিল্লাতের ঘরে এসে উঁকি দেয়। মিল্লাত ঘুমন্ত। ফিরে আসে। ফুলবউ বলে তবে তাকে

কে ডাকল ? খাটে বসে থাকে চুপচাপ। দুই চোখ ত্রস্ত, ভীত। লোভী। আবার চায় সিন্দুকের দিকে। চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে আবার উঠে এগিয়ে যায়। কম্পিত হাতে ছোঁয়। এক সময় চোরের মতন হঠাৎ বাক্সটা উঠিয়ে নিয়ে খাটে ফেরে। ঢাকনা ওঠায়। কানে হাতে গলায় পরতে শুরু করে। শাড়ি বদলে নতুন শাড়ি পরে। মুখে রঙ আর গন্ধ চৌয়ায়। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই যে আর চোখ ফেরাতে পারে না। কপালে টিপ আঁকে। গলায় চাপা বেষ্টিত হার। ঝলসায়। চোখে কাজল টেনে নেয়, আবিষ্কার করে, রাজিয়া বিধবা হলেও ভয়ানক সুন্দরী। বলল তার ছায়াকে—কিন্তু আমি ভাই সত্যিই কোন পাপ করিনি। অবিশ্যি কিছু মানুষকে সেজেগুজে ঠকিয়েছি। সেই পাপ আমার নয়। বিশ্বাস করো, সেই পাপে সত্যিই আমার কোন অহঙ্কার ছিল না।

হঠাৎ রাজিয়ার মাথাটা ঘুরে উঠল। মনে হল সে মাথা ঘুরতে ঘুরতে একটি জ্বলন্ত উনুনে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করতেই সেই শব্দে মিল্লাতের ঘুম ভেঙে গেল। মিল্লাত হঠাৎ বুঝতে পারে না, কী ঘটল।

দিনের বেলা সন্ধ্যার আগে এটা এক ধরনের বিষাক্ত ঘুম। মিল্লাত বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে চোখে জল ঝাপটি দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলে। তোয়ালেয় মোছে। রাজিয়ার ঘরে মুখ ঘাড় মুছতে মুছতে ঢুকে পড়ে অবাক হয়ে যায়। রাজিয়া মেঝেয় দু হাতে একটি খাটের পায়া শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে ঢুলছে। যেন কী বিড়বিড় করছে অতি অনুচ্চ। তাহলে কি মেয়েটা সত্যিই পাগল ! কিন্তু এ যে অসম্ভব সুন্দরী। যেন সত্যিই উর্বশী। জ্বলন্ত দেবীর মতন অলৌকিক। তা ভাবনাটা কেমন হল ! নিজেকে শুধোয় মিল্লাত। মুসলমানের ছেলে হয়ে দেবীর উপমা ! বাপ বলতেন—'হুরি !' বেশ তাই সই, হুরি-মাতা ! যা বাব্বা ! হুরির তো কোন ছেলেপুলে হয় না। ডেকেই উঠেছিলাম আর কি ! কিন্তু ডাকি কী বলে ? ফুলমা, তোমাকে ডাকব কী বলে ? বৃদ্ধ গলায় ডাকি একবাব—রিজিয়া ! আরে শোন শোন। সত্যিই কি ডাকছি নাকি ? এটা একটা খুয়াব, বুঝলে ? আমি কারুকে ডাকিইনি। দ্যাখো, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ওঠো ! রাজিয়া আস্তে আস্তে চোখ খোলে। কিছুক্ষণ নিথর বসে থাকে। হঠাৎ সংবিৎ হয়। বাহ্য বোধ আসে। বোঝে, মিল্লাত পেছনে। তাকে দেখছে। উঠে দাঁড়ায় সে। ঘুরে দাঁড়ায়। বলে—মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। তুমি ঘুমুচ্ছিলে, সেই ফাঁকে কেমন বীভৎস করে সেজেছি দ্যাখো ! কিন্তু খারাপও লাগছে না। বেশ একটা অহঙ্কার হচ্ছে। মনে হচ্ছে, রাস্তায় একটু গটগট করে হেঁটে আসি।

—যাবে নাকি ?

—না। ভারি লজ্জা করবে।

—চলো না। একজনের সঙ্গে মিট করব। এরকম সাজগোজ করা মেয়ে পাশে থাকলে বেশ কদর হয়। খাওয়াদাওয়া ভাল হয়। রাত্রে তা হলে আর রাঁধতে হয় না। যাবে ?

রাজিয়া কোন জবাব না দিয়ে একবার আনমনা খাটের চারপাশ বড় অকারণে ঘুরে আসে। আবার আধখানা ঘুরে খাটের ও-পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সোজাসুজি মিল্লাতের চোখের দিকে চায়। মিল্লাত এবং সে নিজে কিছুক্ষণ দুজন দুজনের দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না। মিল্লাত বলে—চলো ঘুরে আসি।

হঠাৎ মুখ নামিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে রাজিয়া বলল—না। হয় না। কিছুতেই হয় না মিল্লাত। তুমি সামাজিক নও। সমাজটা যে কী অ্যান্টিলিরিক্যাল, খটখটে কর্কশ গদ্য মুখে বললেও বোঝো না। যাও। তোমার বন্ধুকে গিয়ে বলে এসো। আমি রাজি নই। আমার রূপের সত্যিই অহঙ্কার আছে।

বলেই রাজিয়া কানে হাত লাগিয়ে গহনা খুলতে শুরু করল। মিল্লাতের সহসা মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে গেল—প্লিজ, আর একটু থাকো। একটা ছবি তুললে বেশ হত। ছবিটার একটা নাম দিতাম 'ফুলবউ'।

রাজিয়া চোখে কেমন একটা ছদ্ম শাসানি করে বলল—ইস, খুব তো শখ! কিন্তু মনে রেখো সবই তিনি দেখছেন, সবই তিনি শুনছেন।

—কে ?

মরহুম পিতা। মৃত স্বামী। মনে হচ্ছে না কি সত্যিই কেউ দেখছে, সব শুনছে ? আমার কিন্তু হচ্ছে। আর খুব হাসি পাচ্ছে। সত্যিই হাসি পাচ্ছে। কেমন চমকে দিলাম, তাই না ? বলতে বলতে রাজিয়া হি হি করে হেসে উঠল। মিল্লাত সহসা ভয়ই পেয়েছিল। কিন্তু হাসি শুনে ভাবল, ও তাই ? অর্থাৎ একটা মজা। তারপরই সেও হাসিতে যোগ দিল। কিন্তু দুজনই খুব ভাল করে হাসতে পারল না। পরে গম্ভীর হয়ে মিল্লাত বলল—তোমার বিয়ে আমি দেবই। তখন কেমন করে না হেসে পারো দেখা যাবে। মানুষের এত ভূতের ভয় দেখেই বোঝা যায় মানুষটা মেয়েমানুষ। ধেত্তেরি! কী যে হচ্ছে না! বলে বিরক্ত হয়ে তোয়ালেটা রাজিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিল্লাত বাইরে বেরিয়ে যায়। রাজিয়া তা দেখে এতক্ষণে খুব নির্ভয়ে উচ্ছল হাসিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে। রক্তে একটি অদ্ভুত উৎসব জাগে। মাটি ফুঁড়ে নিঃসীম অন্ধকার থেকে একটি আলোকিত শহর জেগে উঠতে থাকে সহসা।

রাত্রে ঘুমনোর আগে রাজিয়া মিল্লাতের মার্কসীট কপি করল। কপি করে দেখিয়ে নিল একবার ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। এক পলক দেখে মিল্লাত মন্তব্য করল—তোমার হাতের লেখা এত চমৎকার! মেয়েলি নয়। আচ্ছা, তুমি কদ্দুর পড়েছ? বি· এ· পাশ করেছ নিশ্চয়!

রাজিয়া মার্কসীট নকল করার পর সেটা একটি হলুদ খামে যত্ন করে ঢুকিয়ে টেবিলে বইয়ের পাতার ফাঁকে রাখল। তারপর ব্লাউজের একটি বোতাম সুচ দিয়ে আটকে নিচ্ছিল। মেঝেয় মাদুর পেতেছে। বলল—হ্যাঁ। প্রাইভেট দিয়েছিলাম। রেগুলার নই। অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে অর্থাভাবে কলেজ বন্ধ করে দিই। নানীর জমি বিক্রি করেও অনার্স চালানো যায়নি। অত পয়সা কোথায় পাব! তারপর রাজিয়া বলল—এই শোন! আমার একটু উপকার করবে? একবার বৈদ্যবাটি যেতে হবে তোমাকে। নানী আমাকে যে জমি দিয়েছিল, তার দলিল আছে। বিঘে খানিক জমি এখনও বিক্রি করিনি। ওটা বেচে দেব। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখব। যদি তেমন সুযোগ হয় চাকুরির জন্য ঘুষ দেব। ঐ জমির ফসল আনোয়াররা দেবে না। আমিও গিয়ে পাহারা দিয়ে তুলে আনতে পারব না। যাবে একবার?

মিল্লাত বলল, গিয়ে কি করতে হবে?

রাজিয়া উত্তর করল—মোহর আলি নামে একজন লোক আছে। ভাল মানুষ। চাচা বলে ডাকি। ওকে গিয়ে আমার নাম করে বলবে, জমিটুকু বিক্রি করব, উনি যেন খদ্দের দেখে দ্যান। পারবে না?

—দেখব।

—না। দেখা নয়। করতেই হবে। আমি আর বৈদ্যবাটি যাচ্ছি না। আমার ধারণা, সেখানে গেলে আমি আর আস্ত ফিরতে পারব না। আমার ভয় করে।

মিল্লাত অন্য কিছু ভাবছিল। সেলাই শেষ করে রাজিয়া সুচসুতো তুলে রাখল। রাজিয়ার ওঠাচলা লক্ষ করতে করতে মিল্লাত মনের ভাবনাটাকে স্থির করে নিচ্ছিল। শুধু অস্ফুট বলল—কাল হাফ-ডে। শনিবার।

রাজিয়া বলল—এক্সচেঞ্জ খোলাই থাকবে।

মিল্লাত মিষ্টি হাসল। বলল—কাল একবার লাইব্রেরি যাব। অনেকদিন কোন সংযোগ নেই। এক্সচেঞ্জের পথেই পড়বে। আগে মবিন আর আমি প্রায়দিনই বিকালে ঘন্টাখানেক আড্ডা দিতাম। জায়গাটা শহরের সবচেয়ে ভদ্র পরিবেশ। ওখানে গেলে তোমার ভাল লাগবে। ওখানকার লাইব্রেরিয়ান আমার দোস্ত। পড়াশুনা প্রচুর। আলাপ করে দেখবে ভাল লাগবে নিশ্চয়ই। ওর নাম রিয়াজ।

রাজিয়া একখানি সাপ্তাহিকে আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত নিবন্ধে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে বলল—আমি কোথাও যাব না।

মিল্লাত বলল—একজন মৌলবীর যা জ্ঞান নেই রিয়াজের তা আছে। মুসলমানদের ফেকাহ্ হাদীস ইত্যাদি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কথা বলে। আগে বড় বড় পত্রিকায় মুসলমান জীবন, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ লিখত। বেশ নাম হয়েছিল। কী পড়ছ? বর্ণ-বিদ্বেষ?

রাজিয়া বলল—হ্যাঁ। মিলিয়ে দেখছি। বৈদ্যবাটির বর্ণ-বিদ্বেষ আর আমেরিকা, তফাৎ কোথায়।

মিল্লাত বলল—বাঃ! ধরেছ তো বেশ। বর্ণবিদ্বেষই বটে। চামড়ার রঙ নিয়েই তোমার যত বিপত্তি। তোমার এবং তাদেরও। কখনও ভাবিইনি ব্যাপারটা। আশ্চর্য! শুনেছি অস্ট্রেলিয়া না কোথাকার মেয়েরা মুখ কালো করার জন্য মুখে কালো পাউডার মাখে। সেখানে যে যত কালো, সে তত সুন্দরী। আর হ্যাঁ। অভিনেত্রী অঞ্জু মহেন্দ্রর সঙ্গে ক্রিকেটার সোবারস-এর ভাব হয়েছিল। বিয়ের কথাও উঠেছিল। তা, অঞ্জু ফর্সা বলেই নাকি সোবারসের জননী সেই বিয়ে নাকচ করে দিয়েছেন। গুজব কি না জানি না। আচ্ছা, নবী যে সুন্দরী নারীর কথা বলেছেন, সেটা কালো না ফর্সা? সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন, যাতে সুন্দর সুন্দর সন্তান হয়। সেই সৌন্দর্যের মাপকাঠি কী? কালো কি সুন্দর হয় না? নবীর কনসেপশন কী ছিল? আরবীয়রা তো কালো নয়! রিয়াজ বলতে পারবে।

রাজিয়া পত্রিকা বন্ধ করে হাই তুলল। বালিশটা শব্দ করে ঠিক করল। শুয়ে গেল। মনে হচ্ছিল সে মিল্লাতের কোন কথাই শুনছে না। মিল্লাত খাট থেকে কাত মেরে ঝুঁকে রাজিয়াকে একবার দেখে নিয়ে বলল—দাদীমা কালো মেয়েদের দেখতে পারতেন না। তোমার গায়ের রঙ উনি পছন্দ করেছিলেন।

রাজিয়া বলল—আমার পড়াশুনাও। মাঝে মাঝেই যেতেন। উনি বেঁচে থাকলে আমার জীবনটা বোধ হয় অন্যরকম হত। উনি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে ভালবাসতেন। জোর করে একটা স্বপ্ন তিনি দেখাতে চাইতেন।

—কী স্বপ্ন দেখেছিলে ফুলবউ?

—তোমাকে বলা যায় না মিল্লাত। ঘুমোও। আমায় জমিটা বিক্রি করে দিও। রাত হল অনেক। কথা বলো না। প্লিজ।

মিল্লাতকে ঘুমাতে বলে রাজিয়া একলা জেগে থাকে। ঘুমাতে পারে না। দাদীমায়ের আকৃতি মনে পড়তে থাকে। সাধ মনে পড়ে। একজন কিশোরী স্বপ্ন

দেখেছিল। বারংবার একটি নাম উচ্চারণ করেছেন তিনি। 'মিল্লাত' শুনতে শুনতে রাজিয়া ঐ বয়সে একটি নামকেই ভালবেসে ফেলেছিল। হায় রাধারানী! একাদশবর্ষীয়া বালিকা। তোমার রোমান্স জগৎ সেদিন বিশ্বাস করেছে। যখন বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচেছিলেন। আজ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তেমন সুযোগ পেলে আজও কারো মধ্যে রাধারানী বেঁচে থাকতে পারে। সুযোগ না থাকলেও মনের নিভৃতে রোমান্স লুকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ শতাব্দী সেই মনের পৃথিবীকে কখনও চিনতে পারে না। অবহেলা করতে থাকে। মাহেশের রথে তোমার বনফুলের মালা যে ডবল পয়সা দিয়ে খরিদ করেছিল অন্ধকারে, না, পয়সা নয়, টাকা। তাকে তুমি ভুলতে পারোনি। ভোলা তো যায় না। তাকে তুমি আজীবন খুঁজেছিলে। মানুষ তা বিশ্বাস করেছে। তোমার প্রেম সেদিনের বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। তার বোধ হয় নাম হয়েছিল রোমান্স। কিন্তু এ যুগ তো রোমান্সের নয়। কিন্তু কেন সেই অন্ধকারে অচেনা ব্যক্তিটিকে খুঁজে ফিরতে চাও? খুঁজে পেলেই কি তাকে স্বীকার করা যায়? যায় না। কারণ এ যুগে রোমান্সের একাদশ বর্ষীয়া প্রেম মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। যায় না। বিনিদ্র রাজিয়া নিজেকে শুধায়—কেন যায় না? বিয়ের পর হাজীর বাড়ি গিয়ে দেওয়ালের টাঙানো ফোটো, মিল্লাতের ছবি দেখে সেই বালিকার অন্তর-প্রদেশে কী অগ্ন্যুৎপাত হয়, পৃথিবী কখনও তার হদিস বুঝে পাবে না। অথচ তা ভাবলে গায়ে এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে। রাজিয়া শিউরে ওঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তেষ্টা পায় তার। বুক ধু ধু করছে। কলসী থেকে জল গড়িয়ে নেয় রাজিয়া।

॥ আট ॥

কাল শনিবার। হাফ-ডে। সেই শনিবার আজ। শনিবারের সকাল। সকাল সকাল স্নান খাওয়া করে নিয়ে মিল্লাত রাজিয়াকে তাড়া লাগায়। বলে প্রথমে আমরা এক্সচেঞ্জেই যাব। পরে লাইব্রেরি। চটপট সেজেগুজে নাও। রাজিয়া বেশ মন্থর। কোথাও বেরুনোর আগে রাজিয়া কখনও এত ঢিলে থাকে না। সেটা দুদিন লক্ষ করেছে মিল্লাত। আজ লক্ষ করছে, রাজিয়ার কোন উদ্যম নেই। কোন তাড়া নেই। লক্ষ করে বলে—তুমি স্নান করছ না এখনও? কখন খাবে আর কখন বেরব? আচ্ছা আমরা নম্বরের অফিস যাব, নাকি বাড়ি?

রাজিয়া বলে—আগে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট জোগাড় করার কথা ছিল। তুমি নবীনাকে চিঠি দিলে না।

মিল্লাত বলল—আসলে আলস্য আছে ঠিক কথা। কিন্তু নবীনাকে চিঠি

লিখতে আনন্দই পাই। তথাপি কেন লিখিনি শুনবে ? আমার রেসিডেন্স যে সীতাহাটি সেটা ভুলতে চাই। সীতাহাটির প্রধান আমাকে নিসার হোসেনের পুত্র আর ভারতের নাগরিক বলে সার্টিফাই করবে, এটা ভাবলেই আমার আলস্য আরো বেড়ে যায়। রাজিয়া ক্ষীণ হেসে বলল—কিন্তু তোমার নিজস্ব ঠিকানা কোথায় তুমি জানো না। আজও একজন গ্রামের প্রধানের কাছে তোমার পরিচয় বাঁধা আছে। তার কাছে তোমার নিজের যা, যে পৃথিবী নিজের জন্য তুমি কল্পনা করো, তা নিতান্তই তুচ্ছ। কারণ সেই কল্পনাও তোমার কাছেই খুব অস্পষ্ট। আর আমার কথা যদি বল, তবে অভিমান করব না, আমার কল্পনা খুব ছোট। তা সত্ত্বেও সেই কল্পনা করতে আমি ভয় পাই। আমি কোথাও পৌঁছতে পারি না।

মিল্লাত শুধায়—তোমার ছোট কল্পনাটা কী, আমায় বলবে ?

—না। সেই কল্পনার কথা আমি নিজেকেই বলি না। বলতে পারি না।

—কেন ?

—কারণ তাতে পাপ হয়।

—সেইজন্য তুমি ভয় পেলে নামাজ পড়ো ?

—পড়ি।

—কেউ যদি তোমাকে কখনও সাহস দিয়ে বলে, ভয় করো না। তখন তুমি কী করবে ?

—আমি তখন আরো ভয় পাব এবং নামাজ পড়ব।

—আমার সব কথা তুমি বুঝতে পারছ ?

—জানি না। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ সব ?

—না। কারণ তোমার কল্পনার কথা আমি জানি না।

—তবে কথা বলছ কেন ?

—বলছি, কারণ তুমি যে কথা বলে যাচ্ছ। কী আশ্চর্য,মানুষ এমন করেও কথা বলে ? কী নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের ?

রাজিয়া একটু চিন্তা করে বলল—রেসিডেন্স।

মিল্লাত-বলল—তাই বা কেন, আমার আলস্য নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজ আমার কোন আলস্য নেই তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

রাজিয়া বলল—ঠিক আছে। আলস্য যখন নেই, নীল খাম দিচ্ছি, বসে বসে চিঠি লেখ। সার্টিফিকেট আসুক, নাম রেজিস্টারি করিয়ে নেব। তখন যাওয়া যাবে। আজ থাক।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য বৈকি। আমি কোথাও যেতে পারব না। তুমি কি কারুকে লাইব্রেরি যাবে বলে কথা দিয়েছ? সত্যি করে বলবে।

—সত্যিই বলছি। তোমাকে আমি মুখ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি না। এত ভয় পাচ্ছ কেন? রিয়াজের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। তোমারও আলাপ হবে। আচ্ছা, তুমি মুখ দেখাতে চাইছ না কেন?

রাজিয়া আলনায় জামাকাপড় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। পেছন ফিরে ক্ষীণ হাসল। মিল্লাত খেয়েদেয়ে মৌরি চিবোচ্ছিল খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। শরীরের দু পাশে দু হাত ভর দিয়ে খাট চেপে দুলছে। রাজিয়া শুধাল—তুমিই বা অত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? আমি কি বিয়ের কথা বলেছি? আমার কেমন যেন সংস্কার এসে গেছে, যে আমার মুখ দেখবে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। আমার সেজেগুজে বিয়ে হবে না মিল্লাত। তুমি চেষ্টা করো না।

মিল্লাত শুধাল—তা হলে বলে দাও, কী ভাবে হবে?

—হবে না। ব্যস!

—কিন্তু কেন?

—মন চায় না।

—তোমার মন কী চায়?

—মনটাই তো নেই মিল্লাত, তার চাইব কী? যখন মন চেয়েছিল, তখন তো কেউ আমায় দিল না। মন চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পায়নি। সেই মনের মৃত্যু হয়েছে, তাকে জবাই করা হয়েছে।

মিল্লাত বলল—মনের যদি মৃত্যু থাকে, তবে তার পুনর্জন্মও থাকে। বলো, সেই মন কী হলে জীবিত হয়?

—যা হলে হয়, তা তো হবার নয় মিল্লাত।

—কেন নয়? বলো? কেন নয়?

—তাকে তুমি কোথায় পাবে?

—কাকে?

—যে অন্ধকারে কতকাল আগে হারিয়ে গিয়েছে, তাকে কোথায় পাবে তুমি?

—কে? নাম বলো? আমি খুঁজে এনে দেব।

—পাবে না। কারণ সে তো আমায় খোঁজেনি। রাধারানীকে রুক্মিণীকুমার খুঁজেছিলেন। একখানা নোটে, তিনি তাঁর নাম লিখে রেখে ঝড়বাদলার রাতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমার রুক্মিণীকুমার কিছুই যে রেখে যায়নি। আমাকে খোঁজেও না, আমি তাকে পাব কী করে?

মনে মনে রাজিয়া বলল—অবিশ্যি এক বাক্স গহনা আছে। সে কথা যে কিছুতেই বলা যায় না। হায় খুদা! এ কোন পাপের তিমিরে আমায় ঠেলে দিচ্ছ! আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি?

মিল্লাত খুক খুক করে হেসে মন্তব্য করল—নস্টালজিয়া। তুমি একটা পাগল। এই জন্য সবাই তোমার জোর করে বিয়ে দিতে চায় বা পারে। সেইজন্যেই রুক্মিণীকুমার ভরসা করে কোন কিছু রেখে যায়নি। ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! এমন করেই লুকিয়েছে যে তাকে ডেকে একদিন বলতে পারলে না, আমি তোমায় ভালবাসতাম। এই জন্যই আজকালকার সাহিত্যিকরা ঐসব রাধারানী তৈরি করে না। আর রাধারানীরাও আজকাল বেশ সেয়ানা। তোমার মতন ব্যাকডেটেড না। অবিশ্যি তোমার যুগটা রাধারানীরই যুগ। সেকালের রুক্মিণীকুমার একাধিক বিয়ে করত। যেমন তুমি আমার বুড়ো বাপকে করেছিলে। তা হলে কথাটা দাঁড়াল, তুমি রাধারানী। কেমন? কিন্তু তুমি এত হতভাগ্য, রুক্মিণীকুমারের সামান্য চিহ্নও তোমার কাছে নেই। ভাবছি, দাদীমা তোমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছিলেন, সেই জন্যই গহনা পরতে তোমার কোন আগ্রহ নেই। কারণ দাদীমা যখন তোমাকে গহনা পরাতে যেতেন, তখন তুমি রুক্মিণীকুমারকে মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আমি খুব লজ্জিত ফুলবউ। তোমাকে যে সামান্য সাহায্য করব, তারও কোন সুযোগ আমার নেই। আমি খুবই দুঃখিত। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, নিজেকে আমার এখন খুবই অসহায় মনে হচ্ছে। যাই। ঘুরে আসি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিল্লাত। রাজিয়া আলনা ধরে দম নিচ্ছিল। নিজেকে সংবরণ করছিল। দুই ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। গলা দিয়ে স্বর ফুটছিল না। কোন মতে কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ করল—একটু ও ঘরে যাও। আমি যাব।

এ ঘরে এসে মিল্লাত ভাবল, আমি কী বোকা! ভেবেই সে চমকে উঠল। তার বুকের ভেতর কেমন এক ভয় ঢেউ তুলতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, দেওয়ালের মধ্যে মিশে থেকে তার মৃত পিতা তাকে দেখছেন। মিল্লাত টেবিলে রাখা ঢাকনা ঢাকা জলের গেলাস ঠোঁটের কাছে তুলে এনে দ্রুত নামিয়ে ফেলে সহসা দেওয়ালে সেই জল ছুঁড়ে মেরে বলল—আই হেট ইউ। ঘৃণা করি। প্রধানকে বলবে, আমি তার সার্টিফিকেট চাই না। না। চাই না। মনে রেখো, আমি তোমার কোন কিছু চাই না। আমি তোমার কেউ নই। না। কেউ নই। কোন কিছু নই।

দাঁত দিয়ে অধর খামচে ধরে মিল্লাত। শরীর কাঁপে। দুই চোখে অভিমানে

ক্রোধে অপমানে ধিক্কারে অশ্রুর ক্ষীণ ছায়া চিকচিক করে। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। অভিমান হয়। ক্রোধ হয়। বলে, না কেউ নই আমি। রাজিয়া আধঘণ্টা বাদে ওকে ডাক দেয়—এসো। আমি তৈরি।

রাজিয়ার প্রতিমা দেবীর মতন ঝলকায় সোনায় ও সৌন্দর্যে। মিল্লাতের মুখ ভার ভার। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে দুটো বেজে যাবে। দুটোয় লাইব্রেরি খোলে। আজ বিকালে কি মবিন আসবে সেখানে ? মবিন কি আগের মতনই আসে ? রোজ নয়। তবে আসে। মবিন বলছিল মিল্লাতকে। মিল্লাত কেন একেবারেই লাইব্রেরি ছেড়ে দিল। কেন যায় না ? মিল্লাত বলেছিল—যাব। আজ তাই মিল্লাত যাচ্ছে। ওরা রিকশায় উঠল।

পাশাপাশি বসে শরীরের স্পর্শে রাজিয়া কেমন রক্তে বিচলিত হয়। আরো ঘনিষ্ঠ হতে মন চায়। সে পাশের রুক্মিণীকুমারকে দেখে। মনে মনে বলে—আমি রাধারানী। আমায় চিনতে পারছ না ? কেন অত মুখ ভার করে আছ ? একদিন রুক্মিমণীকুমার রাধারানীর কাছে এল। ওদের কথা হতে লাগল। কত ভয় তখন ? রাধার ভয়। রুক্মিণীকুমারের ভয়। আমাদের ভয় তারও চেয়ে তীব্র মিল্লাত। পাছে চিনে ফেলি ? ওদের ভয় ছিল, চিনতে পারব তো ? ভয় ছিল, যাকে চাই; যেমন করে চাই, তেমন করে তাকেই পাবো তো ? আমরা যত চিনতে থাকি, ততই ভয় বাড়ে, ততই অচেনা হয়ে যাই। তখন একটি সিদ্ধান্ত কেবল বাকি থাকে, রুক্মিণীকুমার বলে কেউ ছিল না। রাধাও ছিল না। বরং চিনতে না চাইলেই সে থাকে। সে মানে রুক্মিণীকুমার হতে পারে। রাধারানী হতে পারে.....

মিল্লাত ভাবছিল, দাদীমা যাকে জোর করে স্বপ্ন দেখাতে চাইতেন, তার একটা রুক্মিণীকুমার ছিল। দাদীমা বোঝেননি। আর আমি কিনা ভেবেছিলাম, আমিই সেই রুক্মিণীকুমার। গল্পের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারা কী একটা রহস্য সৃষ্টি করলেন। তা বেশ তো। কিন্তু মানুষের সৃষ্টির কিনারা আছে। পয়গম্বরের সৃষ্টি বিধানের কোন কিনারা রাখেনি মানুষ। বাবা বলতেন, হাদীসে আছে, কম বয়েসী বালিকাদের বিয়ে করো, কারণ তাদের মুখের ভাষা মিষ্টি, ব্যবহার ভাল, তাদের তলপেট গর্ভধারণের পক্ষে প্রশস্ত। তারা অল্পে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু বাবা জানতেন না, তারাপ্রত্যেকেইএক একটা রাধারানী। তারা রুক্মিণীকুমার ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারে না। ভাই মবিন, তুমি ভাই রাজিয়া দেখছ, রাধারানী দ্যাখ নাই। আজ তোমাকে যা দেখাতে চলেছি, তা কিন্তু রাজিয়া নয়। অতৃপ্ত। কিন্তু বিকৃত নয়। বঙ্কিমবাবু আমার সাক্ষী। তিনিই বলবেন।

ওরা রিকশা থেকে নেমে চায়ের দোকানে ঢোকে। চা খায়। স্রেফ চা। দোকানের খদ্দেররা ওদের দুটিকে বেশ সম্ভ্রম আর আকুল চোখে দেখতে থাকে। মিল্লাত ঝোঁকের মারে দামী এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেলে। ফের রিকশায় ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে বলে—কিনলাম। এমন দামী পোশাকে চারমিনার চলে না। পথে যদি তোমার রুক্মিণীবাবু দেখেন, একদম ভড়কে যাবেন। অবিশ্যি তিনি তো চিনতেই পারবেন না। যাক গে।

—দ্যাখো, পাগলামি করো না। ভাল হবে না সত্যিই।

—ভালো যে হবে না, তা আগেই জেনেছি। কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—মনে করো ?

—নিশ্চয়।

রিকশাঅলা একবার পেছন ফিরে দেখল। মিল্লাত সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা বলল—লাইব্রেরিখানা একেবারে শহরের বাইরে।

রাজিয়া বলল—কেউ যদি বোকার মতন দুঃখ করে, তা হলে করার কী আছে ?

—মানে ?

—বোকা তো মানেও বোঝে না।

—কিসের ?

—কোন গল্পের কী মানে ?

—অ।

—অ করলে। করলে তো ?

—হ্যাঁ।

—মানে, কিছুই তুমি বুঝলে না।

মিল্লাত আবার বলল—অ।

রাজিযা খিলখিল করে হেসে উঠল। মিল্লাত চুপ। ভাবছে। কী যে রহস্য না! অতএব তিনিই বলবেন। ওরা লাইব্রেরির গেটে এসে নামে। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন না। গল্পের শেষে গিয়ে তিনি সব কথাই নায়ক নায়িকার বলবার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে একেবারে চুপ। ভাবখানা, যেন, ওরাই বলুক। আমি আর কী বলব! গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ওরা। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলার উপরে দেখে তালা ঝুলছে। তাবত বাড়ি নিস্তব্ধ। কী ব্যাপার! লাইব্রেরি বন্ধ কেন ? আজ কী বার ? আজ শনিবার। হাফ-ডে। মবিনের দোকান বন্ধ। তাই তো। না। আজ তো লাইব্রেরি বন্ধ থাকে না। তাহলে খোলার সময় এখনও

হয়নি ? ঘড়ি দেখল মিল্লাত। দুটো বেজে গেছে। তাহলে ?

ওরা নিচে নেমে এসেই দেখতে পায় পা-জামা পাঞ্জাবি পরা মুখে প্রায় অমুসলিম দাড়ি-গোঁফ পাতলা চেহারার অসম্ভব ফর্সা রিয়াজ লম্বা পা ফেলে পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে আনমনা হেঁটে আসছে এদিকেই। গেট পেরিয়ে ঢুকে এল। সোজা এসে সামনে দাঁড়িয়ে মিচকি হেসে বলল—কতক্ষণ ? আজ কিন্তু ছুটি। আমার আসার কথা নয়। তবু তোমাদের জন্য আসতে হল। চলো ওপরে যাওয়া যাক। ফলে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে লাগল রিয়াজ। মিল্লাত ও রাজিয়া রিয়াজকে অনুসরণ করে উপরে উঠতে লাগল। মিল্লাত কৌতূহলিত প্রশ্ন করল সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে—আমাদের জন্য আসতে হল কেন ?

—বারে. আসতে হবে না বলছ ?

—না। মানে, আমাদের জন্য বলছ কিনা। শুনে মনে হচ্ছে, আমরা এসেছি শুনেই এলে।

—না। শুনে নয়। দেখে। তোমরা রিকশায় যখন কথা বলতে বলতে চৌমাথা ক্রশ করছ, আমি তখন ননার দোকানে চা খাচ্ছি। তাই বলছি, দেখেই আসছি। রিয়াজ চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফেলে তারপর ভেতরে ঢুকে আসতে বলে মিল্লাতকে। তারপর বলে—আসুন। আপনিও আসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? রাজিয়াও পিছু পিছু ঢোকে। রিয়াজ একটি লম্বা টেবিলের সামনে গিয়ে বলে—এটা লাইব্রেরির বৈঠকখানা। আজ লাইব্রেরি খুলব না। ছুটি বলে। গতকাল লাইব্রেরির জন্মদিন গেছে। উৎসব ছিল। খাটাখাটনি করেছে সবাই। আজ বন্ধ তাই। আজ দু'একজন ভুল করে এসে ঘুরে যাবে। যেমন মবিন। অবশ্য তোমাকে দেখে মবিন আড্ডাও দিতে পারে। আমার সঙ্গে মবিনের আজকাল আর আগের মতন বনে না। বই নিয়েই চম্পট দেয়। বসুন ?

রাজিয়াকে আর একবার অনুরোধ করে রিয়াজ। বলে—আপনারা পাশাপাশি আমার মুখোমুখি বসুন। কথা বলা ভাল হবে। তাছাড়া আপনাদের দুজনকে এই প্রথম একসঙ্গে দেখছি। কবে বিয়ে হল তোমাদের ? আমায় তো কার্ড দাওনি ? খানাটানা করোনি বুঝি ?

মিল্লাত লজ্জিত গলায় বলল—বিয়ে এখনও করিনি। করলে অবশ্যই তুমি জানতে। আমি এখনও অবিবাহিত। আমার পাশে যাকে দেখছ উনি অবশ্য বিধবা। আমি ওঁর বাড়িতে থাকি। তুমি একটু ভুল করছ।

রিয়াজও সামান্য লজ্জিত হয়ে বলে—সরি। ভুল হয়েছে। আমার ভাই দোষ

নেই। তোমাদের দেখে অন্য কিছু ধারণা করা যায় না। আপনি কি হিন্দু ? লজ্জিত রিয়াজ খেয়াল করল না বন্ধু মিল্লাত 'ওঁর বাড়িতে থাকি' বলছে কেন ? কথাটার কোন গুরুত্ব দিল না সে। রাজিয়া খুবই 'আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। মৃদু মাথা নাড়ল। তা দিয়ে কোন উত্তর হয় না। মিল্লাত বলল—না। তা কেন ? উনি মুসলমান। নামাজ পড়েন। রাজিয়া এই 'নামাজ' পড়েন বলায় আরো সংকুচিত হয়। মিল্লাতকে চোখের তারায় মৃদু তিরস্কার করে। অর্থাৎ, নামাজ পড়ি, একথা জানিয়ে কারুকে কতখানি মুসলমান বোঝানোর আদিখ্যেতা কেন ? এই চাপা তিরস্কার রিয়াজও লক্ষ করে। মিল্লাত হাসে নিচু শব্দে, স্বল্প। রিয়াজও নিঃশব্দ সামান্য হাসি দেয়। বলে—বেশ তো ! নামাজ পড়েন, সেটা ভালই তো ! আমি ছেলেবেলায় নামাজ পড়ে বন্ধুদের বলে বেড়াতাম। এখন কখনও নামাজ পড়লে, অন্যকে ঘন ঘন নামাজ পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। নামাজ পড়লে আমার কেমন একটা অহঙ্কার হয়। হা হা হা ! আমার মনে হয়, মুসলমান পুরুষের তুলনায় মুসলমান মেয়েরা সংখ্যায় বেশি নামাজ পড়ে। কেন পড়ে ? বলতে পারবে মিল্লাত ? ভাববার মতন কথা। অথচ এই মেয়েরাই বেশি দোজখ যাবে। হাদীসের কথা। পুরুষের তুলনায় নারীরাই অধিক দোজখী। একটু থেমে রিয়াজ বলল—তা বলে আপনি লজ্জিত হবেন না। এমনকি এই যে এমন সব অলঙ্কার পাতি পরেছেন, তার জন্যও নয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুকে, মানে মিলুকে কোনরকম তিরস্কার করবেন না। মিল্লাত বরাবরই কারো পরিচয় গুছিয়ে ঠিকমতন বলতে পারে না। একবার এক মজলিসে গিয়ে একজন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কী বলে, শুনবেন ? আমার বন্ধু রিয়াজ। লেখে। মানে কবি আর কী ? কী লজ্জার কথা দেখুন, আমি জীবনে সাকুল্যে তিনটির বেশি কবিতা লিখিনি। দু চারটে গদ্য লিখেছি। তা-ও প্রবন্ধ। সাহিত্য ঠিক নয়। ও বলল, আমার বন্ধু কবি। ফলে বুঝতেই পারছেন ও ঠিক পরিচয় করাতে জানে না। তাই না ?

—না। মানে। মিল্লাত আমতা আমতা করল। রিয়াজ কিঞ্চিৎ ধমক দিয়ে উঠল—থামো তো ! তুমি কথা বলবে না। আপনাদের সম্পর্ক ঠিক কোথায় পৌঁছেছে, বিধবা পরিচয় করিয়ে সেটা আমার সামনে ঢাকবার চেষ্টার কোন মানে হয়, বলুন তো ? সোজা বলতেই পারতে, আমরা এখনও বিয়ে করে উঠতে পারিনি। ব্যস ! অত ভেবে বিধবা না কুমারী ব্যাখ্যার কী দরকার ? হিন্দুর বিধবা হলে তবু কিঞ্চিৎ কথা ছিল। মুসলমানের বিধবা আবার একটা বিধবা নাকি ?

এই সুযোগে মিল্লাতও প্রসঙ্গকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল। বলল—মবিন কিন্তু অন্যরকম বলে।

—কী বলে ?

—মুসলমান বিধবারাও বিধবা। তাদেরও কোথাও কোথাও গুরুতর সমস্যা হতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে। মন খুলে একজন পুরুষের উচিত মরবার সময় বউকে খালাস দেওয়া। মানে মুক্তি দেওয়া। বলল মিল্লাত। রিয়াজ বলল—সেটা আর কতজন দেয়। বা নেয়। খালাস তো লোকটিকেও চাইতে হয় আসন্ন বৈধব্যের কাছে। কিন্তু কয়টা মেয়েই বা সেই খালাসের তোয়াক্কা করে। তার মধ্যে কোন কড়াকড়ি নেই। দিলে হয়, নিলে হয়, আজকাল সেটা যাবার সময় 'আসি ভাই' বলার মতন। অবশ্য সেটাও একটা মুসলমানি আদব। খালাস দেয়নি বা পায়নি, এমন ঘটনা কই দেখা বা শোনাই যায় না। মরবার সময় সবাই-ই হ্যাঁ করে। না করে না। ফলে ঐ সব ব্যাপারগুলো আজকাল খুব প্রত্যন্ত গ্রাম ছাড়া উঠেই গেছে। গ্রামেও উঠে যাচ্ছে, বলা যায়। তাই না ?

—হ্যাঁ। ঢোক গিলল মিল্লাত। রাজিয়া বলল—না। তা নয়। আমার স্বামী আমাকে খালাস দেননি। অনেকে দেয় না। শহর গ্রাম কথা নয়। খুদি ফুপু শহরের লোক। তার শুনেছি এই ধারা হয়েছিল। কিন্তু আমি খালাস নয়। তালাকই চেয়েছিলাম। উনি তালাক দূরে থাক। খালাসও দেননি। এমন ঘটনাও কিন্তু হতে পারে রিয়াজ সাহেব। হয়। খুব হয়। দেখুন, এ দিয়ে যদি কিছু শিখতে পারেন। রিয়াজ বিস্ময়বিদ্ধ গলায় বলে—স্ট্রেঞ্জ ! তাহলে তো আপনার সুগন্ধী মাখা ঠিক হয়নি। অলঙ্কার তো আরো খারাপ। হাদীস হল, স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য যে মেয়ে সুগন্ধি মাখে, তার নরক অনিবার্য। সে ঘৃণিত। দাঁড়ান বলছি, হাদীসের নাম, কার বর্ণনা একটু মনে করি। আসছি আমি। মবিন এলে বসতে বলবেন।

হঠাৎ উঠে রিয়াজ দ্রুত নিচে নেমে চলে গেল। চলে যেতেই রাজিয়া চাপা গলায় বলল—আমার একটুও ভাল লাগছে না। তুমি কথা বলতেও ঠিক জানো না। যখন উনি জানবেন, আমরা কে তখন কী হবে ? তুমি আমার কাছে থাকো। আমি বিধবা। কথাটা খুব অশ্লীল হয়ে গেছে। একবার ভেবেও দেখলে না।

মিল্লাত থতমত করে বলল—না। তোমার কাছে বলিনি, তোমার বাড়িতে বলেছি।

—বেশ বলেছ ! চুপ করো। মা বলতে না পারো, বাপের বউ বললেই তো পারো। না পারো, আমি যে তোমার কেউ নই, সেটা বন্ধুকে বুঝিয়ে বললেই তো

পারতে। আমার বাড়িতে থাকো বলে তুমি যে কতবড় শত্রু, সেটা তো কেউ বুঝল না। সত্যি বলছি, আমার একটুও ভাল লাগছে না। তাছাড়া তুমি যথেষ্ট শয়তান।

—মানে ? চমকে উঠল মিল্লাত।

রাজিয়া বলল—ভাবছ আমি ধরতে পারিনি, তাই না ? মবিন আসবে, সে কথা রিয়াজও জানেন। মানে সবই বলা কওয়া আছে। এখন উঠে চলে গেলে, যদি যাই, তোমার মুখ কোথায় থাকে ? ভাবছ, পারি না ? ছিঃ ! তোমার জন্যই এমন করে সাজতে হল। এখন নিজেকে একটা সঙ ছাড়া কীই বা ভাবতে পারছি। জীবনভর এমনি করে সঙই সাজতে হল আমাকে। কেউ বুঝল না। কেউ না !

রাজিয়ার গলা অস্পষ্ট কান্নায় ধরে আসে। মিল্লাতের মুখ কালো হয়ে যায়। কোন কথা বলতে পারে না। মনে মনে রাজিয়া বলে—তোমার বন্ধুর মুখেও কোন কথা আটকায় না দেখছি। মনে মনে বলা কথার তির্যক অপাঙ্গ দৃষ্টি ফুটে ওঠে রাজিয়ার চোখে। মিল্লাত সেই দৃষ্টির ভাষা অনুধাবন করে মনে মনেই উত্তর দেয়—ও যে ঐরকম হঠাৎ করে হাদীসের কথা তুলবে, তা কে জানত ! রিয়াজ ঐরকমই ভারি ব্যঙ্গনিপুণ ছেলে। সবতাতে রসিকতা। দুজনের পক্ষেই পরিস্থিতি ছিল অভাবিত। মিল্লাতের এখন একধারা অস্বস্তি হচ্ছিল। অথচ সে মনে মনে কেমন একটা জেদও অনুভব করছিল। দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট মতন সময় নিঃশব্দে কেটে যায়। রাজিয়া শুধায়—তোমার বন্ধু অমন হন্তদন্ত ছুটলেন কোথা ? মবিনকে ডেকে আনতে গেলেন নাকি ?

—কী যে বলো না ! ও চা বলতে গেছে।

—বলা তো যায় না ! ছেলেরা মেয়ে দেখার ব্যাপারে কেউ কেউ খুব নির্লজ্জ হয়।

—তুমি ভাবছ এটা একটা প্ল্যান।

—নিশ্চয় ভাবছি। ছুটির দিন, তবু মবিন আসতে পারে, কথাটা তো শুনিয়ে গেলেন তোমার বন্ধু।

—আমরাও তো ছুটি না জেনেই এসেছি। মবিন এলেই বুঝি সেটা প্ল্যান হয়ে যায় ? তুমি আমাকে এভাবে সন্দেহ করছ কেন ? দেখছি, ব্যাপারটা খুব ঝকমারি হয়েছে।

রাজিয়া আর কোন কথা বলে না। আরো পাঁচ মিনিট বাদে সিড়িতে দুজন ব্যক্তির উপরে ক্রমাগত ঠেলে উঠে আসা বাক্যালাপ কানে আসে। রাজিয়া

রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মিল্লাতের চোখমুখ ক্রমশ ত্রস্ত দেখায়। একজনের গলা রাজিয়া চিনতে পারছে। সদ্য চেনা রিয়াজ। অন্যজনকেও চেনা যায়। মেয়েরা খুব সহজে পুরুষের কণ্ঠস্বর আলাদা করে মনে রাখতে পারে। মবিন বলছে—আরে না না। মনেই ছিল না, তা নয়। মনে ছিল আজ বন্ধ। তবে একদিনের ছুটি বলে তুমি বাড়িতেই থাকবে সেটা আমার অনুমান। ভাবলাম, এই ফাঁকে তোমাকে নেমন্তন্ন করে এলে কেমন হয়?

রিয়াজ বলল—একই দিনে আমরা এমন জুটে যাব ভাবিনি কিনা! এসো! ভেতরে ঢুকেই মবিনের দুই চোখ অস্বাভাবিক ধাক্কা খায়। ও যেন, এমন সমাবেশের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। রাজিয়ার গায়ের বিজলি ছলকানো উজ্জ্বলতা, গভীর স্বপ্নিল বিষণ্ণ রূপ, একেবারে অচেনা করেছে তাকে। বৈদ্যবাটির বিতাড়িত মেয়েটিকে কোথাও আর চেনা যায় না। মানুষ এত সুন্দর হয়, মবিনের অভিজ্ঞতায় সেই তথ্য নতুন। কিন্তু সেই উজ্জ্বলতার বিকিরণ চোখ সহসা ধাঁধিয়ে যেন বা দিগভ্রান্ত করে। খুব পাশে বসা মিল্লাতের অপ্রসন্ন মুখে ফুটে ওঠা ক্লিষ্ট হাসি মবিনকে বিচলিত করে দেয়। মবিনের হতচকিত চাউনি মিল্লাতের মতন রাজিয়াও লক্ষ করে। রিয়াজ বলে, এ পাশে এসো মবিন। কফি এলো বলে। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? এদিকে আমার পাশে বসো। একটু আগে ওদের সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল।

—আমার কথা! মবিন বিস্ময়-আবিষ্ট গলায় রিয়াজের দিকে চায় এবং পাশে এসে বসে যায়। বলে আমার কথা কেন?

রিয়াজ বাকি দুজনের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলে উঠল—তুমি আমাদের মধ্যে পুরনো তাত্ত্বিক মানুষ। সমাজ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করো।

—পুরনো মানে?

—পুরনো মানে অনেকদিনের। মানে ট্রাডিশনাল, সহিষ্ণু। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভাবতে পারো।

—ও। তুমি আজো তর্ক করতে চাও। কিন্তু আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি, আমি তর্ক করতে পারব না। আমি স্রেফ তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। তোমরাও নিমন্ত্রিত। তুমি ও আপনি। কার্ড লিখে দিচ্ছি। যাবেন অবশ্যই।

—কিসের কার্ড মবিন? মিল্লাত প্রশ্ন করে।

—খৎনা। আমার ভাগ্নের মুসলমানি। যাবে। মা বলেছেন।

কফি আসে। কফিবাহক ছেলেটি জাগে করে জল আর একটি গেলাসও

এনেছে। টেবিলে কাপ সিধে করে। রিয়াজ ওঠে। কোথা থেকে আরো একটি কাচের গেলাস জোগাড় করে এনে সেটি টেবিলে রেখে বলে—এটিও ধুয়ে আমাদের নতুন অতিথিকে যত্ন করে জল দাও। বাকি গেলাস আমরা তিনজনে ব্যবহার করব। মানে ধুয়ে ধুয়ে জল খাব। গেলাস নেই।

—ধুয়ে ধুয়ে খাবে মানে? মবিন শুধায়।

—জলটাও আজ উপভোগ্য কিনা?

মবিন কার্ড লিখে রাজিয়ার দিকে এগিয়ে দেয়। সেটি সেদিক থেকে নিজের দিকে টেনে নেয় রিয়াজ। মবিন বলে—তুমি ওটির ওপর আবার লোভ করছ কেন? ওটা কি উপভোগ্য?

রিয়াজ ক্ষীণ আহত হয়েও উজ্জ্বল গলায় বলল—দ্যাখো ভাই, আমি সব সময় গম্ভীর থাকতে পারি না।

মবিন সঙ্গে সঙ্গে বলল—সেইজন্যই সস্তা রসিকতা করো!

—সস্তা নয়। হাল্কা। তা তোমার কার্ড লেখাটা বেশ আধুনিক। বেশ উপভোগ্যই বলব। লিখেছ, বরাবর মিল্লাত ও রাজিয়া বন্ধুবরেষু. বাঃ খাসা!

—ঠাট্টা করছ?

—না হে না। ঠাট্টা করছ কথাটা দেখছি তোমার ম্যানারিজম হয়েছে। ইটস সিম্পল বাট বিউটিফুল। রিয়েলি ভেরি নাইস। দ্যাখো তোমরা, মিল্লাত ও রাজিয়া বন্ধুবরেষু! চমৎকার।

রাজিয়া সহসা কেমন খুশি হয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে কার্ডখানা মৃদু আকর্ষণ করে নিজের দিকে। রিয়াজ সেটি ছেড়ে দেয়। মিল্লাত সেদিকে এক পলকে দেখে বলে—কবে যেন?

মবিন জবাব দেয়—পরশু। তা আমার কথা কী হচ্ছিল শুনতে পাই?

রিয়াজ হেসে বলল—জানি তুমি শুনতে চাইবে। কিন্তু তোমাকে আমরা কোন ঠাট্টা করিনি। তুমিই বলেছ, মুসলমান বিধবাও বিধবা। আমি আমার বন্ধু কাম বোনটিকে বোঝাচ্ছিলাম, ও কেন অমন করে সেজেছে, সুগন্ধি মেখেছে। কারণ ওর স্বামী তো ওকে খালাস দেয়নি। হাদীস বলছে, স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিন্দনীয়। শুধু নিন্দনীয়ই নয়, সেটা পাপ। তা করলে সেই মেয়েকে অবধারিত দোজখ যেতে হবে। সাগির। হাদীসের নামটা মনে পড়ল। আমার বাংলা ভাষাকে বিশ্বাস করতে পারো। আরবি আয়াত আমার মুখস্ত থাকে না। হাদীসগুলো আমি বাংলাতেই বলি। মিল্লাত সহসা কেন যেন বলে ফেলল—কিন্তু ওর স্বামী তো বেঁচে নেই।

—হ্যাঁ। নেই। কিন্তু খালাস তো হয়নি। নাকি হে মবিন ? আমি কি ভাবি জানো ?

মবিন চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে রিয়াজকে দেখে। রিয়াজ বলে—আতর আর সুগন্ধি, নবীর ভাষায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোথাও সেটা সিম্বল, কোথাও সেটা বস্তুগতভাবেই আদরণীয়, কী বলব, ভেরি সিগনিফিকেন্ট। এর সঙ্গে সেক্স অ্যাণ্ড বিউটির বেশ রিলেশন আছে। মাখামাখি। আবার সেটা ভীষণ পোয়েটিকও বটে। আতর বা সুগন্ধি। কোথাও সুগন্ধি, কোথাও আতর। যাই হোক। প্রায় একই অর্থে তিনি ব্যবহার করছেন। কারণ সেই সময় বোধহয় অন্য পারফিউম তেমন ছিল না। তাই আতর বা সুগন্ধি। যাই হোক। সেটা সিম্বল। যেমন উনি বললেন, যদি দু পয়সা কামাও। এক পয়সার খাদ্য এক পয়সার আতর বা গোলাপ। সেই একই কথা কিনতে বলছেন। আতর কেন ? সুন্দর হও। কিন্তু মেয়েরা সুন্দর হবে তার স্বামীর জন্য। কারণ সেই সুগন্ধি কথা বলতে পারে। সেক্সসুয়াল অ্যাপ্রোচকে ভাষা দেয়। সেইজন্য অন্যের জন্য মাখতে নিষেধ করছেন তিনি। নবীর সেই সেক্সোলজির ভাষা আধুনিক মেয়েরাও বোঝে। কিন্তু আজকাল তার মধ্যে সেক্সই থাকে, নবীর বিউটি থাকে না। পোয়েট্রি থাকে না। যাই হোক। আমি বলছিলাম······বলেই থেমে পড়ে রিয়াজ। চেয়ে দেখে কার্ডখানার উপর রাজিয়ার মাথা নুয়ে পড়েছে। চোখ তুলতে পারছে না। হাসতে হাসতে লজ্জিত রিয়াজ বলল—তুমি কিন্তু ভাই ভীষণ লজ্জা পাচ্ছ রাজিয়া। না। তোমার নামটা মবিনের মুখে শুনলাম। কিন্তু তুমি তো একটু আগেই আমাদের বন্ধু হয়েছ। তুমি সুগন্ধি মেখেছ, সেজেছ। সেটা তোমার প্রতিবাদ। নবী দেখলে খুশী হতেন। কারণ তিনি খদিজাকে বিয়ে করেন। একজন বিধবাকে। মুসলমানদের বিধবা বিবাহের আন্দোলন করতে হয়নি। সব আন্দোলন নবী একাই করে রেখে গেছেন। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের রমা-রমেশের কাহিনী লিখতে হয়নি। কিন্তু তুমি কেন সুগন্ধি মাখতে পাবে না, সেই গল্প লেখার কথা আমাদের মনেই ছিল না কতকাল। তোমার প্রতিবাদকে আমি শ্রদ্ধা করি বোন। তুমি মুখ তোল।

মবিনের হঠাৎ মনে হল, রিয়াজ বড় বেশি ন্যাকামি করছে। এদিকে রাজিয়া ধীরে ধীরে চোখ তুলল রিয়াজের দিকে। চোখ দুটি টলটল করছে। পাতলা অশ্রুরেখার উপর ভাসছে যেন। সেই অশ্রুরেখায় গায়ের আলো এসে পড়েছে। অপূর্ব রহস্য ঘিরেছে তাকে। তাকে আর মানবী মনে হচ্ছে না। চেয়ে দেখতে গিয়ে মবিনের চোখ বারবার আটকে যাচ্ছিল। এই মৃদু কান্না জড়িত চোখ

মবিনকে দিশে হারিয়ে দেয়। মিল্লাত কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। সে কেবল মুগ্ধ চোখে রিয়াজকে দেখতে থাকে। হঠাৎ রিয়াজের গলা আরো একটু উপরে উঠে যায়—মানুষ তত্ত্বচর্চা করবে নবীর মতন। আই মিন, সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য, জীবনকে আরো বেশি ভালবাসার জন্য। উপভোগের ক্ষমতাকে শুকিয়ে মেরে ফেলবার জন্য নয়। এমন ভাল বিকাল পৃথিবীতে ঢের দিন আসে না।

মবিন আর সহ্য করতে পারে না। জীবনের এক অপ্রতিরোধ্য সৌন্দর্য তার দিকে ছুরির নিপুণ ধার হয়ে ছুটে যায়। অন্যদিকে সেই সৌন্দর্যে শান দিতে থাকে রিয়াজের পাগলামি। মবিন সটান উঠে দাঁড়ায়। সামনের কফির কাপ অর্ধভুক্ত পড়ে থাকে। বলে—তাহলে তোমরা যাচ্ছ তো? আপনিও যাচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রিয়াজ। রিয়াজের দিকে ফিরে বলে মবিন—সব সৌন্দর্যই সব স্থানে সুন্দর নয়। আশা করি ভুল বুঝবেন না। আপনি সেইদিন একটু কম সেজে যাবেন। মায়েরা পুরনো যুগের মানুষ। নানীমা থাকবেন। ওরা ফের আপনাকে অন্যভাবে চেনে। মানে খানদানী বউ হিসেবে দেখতে চায়। ওরা বলে, আপনি হাজীর বিধবা বউ। সেইভাবেই দেখতে চায় আপনাকে। আপনি তাব'লে দ্বিধা করবেন না। অবশ্যই যাবেন। নইলে ভাবব, মিল্লাতও আমাকে ভুল বুঝেছে। মিলু তুই যাস। চলি রিয়াজ। এভাবে চলে যাচ্ছি বলে দোষ নিও না। খৎনার ব্যাপারে অনেক কাজ পড়ে আছে। চলি। যেও কিন্তু।

মবিন দ্রুত পায়ে দরজার মুখে চলে গেছে। তখনই রিয়াজ বলল—তুমি কিন্তু বিধবা বউ কথাটা ঠিক বললে না। ওটা ব্যাকরণগত ভাবে ভুল। হয় বিধবা। নয় বউ। নাকি?

মবিন হেসে ফেলে বলল—মুসলমানরা অনেকই এই ধারা কথা বলে, যা বাংলা ব্যাকরণে চলে না। জীবনে চলে। আমি বলেছিলাম, মুসলমান বিধবাও বিধবা। কথাটা মনে রেখো। আসি তাহলে।

মবিন নেমে চলে যায়। জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে নিচে লাফিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে গেছে। মবিনের পরিত্যক্ত পরিবেশ অস্বাভাবিক স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মিল্লাত বলে—আমরা তাহলে উঠি রিয়াজ। সন্ধ্যা হচ্ছে।

—না। সন্ধ্যার অনেক দেরি। তবু উঠতেই বলব। চলো। উঠি। রিয়াজ গা তোলে। ছেলেটি কাপ গেলাস গুছিয়ে নেয়। মিল্লাত আর রাজিয়া উঠে পড়ে। নেমে আসে। পথে এসে দাঁড়ায় ওরা রিকশার জন্য। রিয়াজ হঠাৎ বলে ওঠে—বনে না কেন বলেছিলাম দেখলে তো। তোমাদের ব্যাপারে ও ভারি

উন্নাসিক। বিধবা বউ কথাটা বোধহয় বলে গাঁ-ঘরে। হবেও বা। কিন্তু তখন কথাটা ওর মন থেকেই বেরিয়ে এসেছে। যাও। চলে যাও। দশমিনিট হেঁটে, না প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট হাঁটলে তবে রিকশা পাবে। আজ লাইব্রেরি বন্ধ বলে সব রিকশা কোর্টের ওখানে জমে আছে। বোন রাজিয়া তুমি ভাই আমাদের মার্জনা করবে। আমরা কখনও বিধবাদের হয়ে আন্দোলন করিনি। তুমি আমাদের সাহায্য করবে ?

—আমি কী সাহায্য করব বলুন ? আর আন্দোলনই বা কিসের ?

—সেটা একদিন বুঝিয়ে বলব তোমাকে। আজ নয়। তুমি নিজেই একটা আন্দোলন।

মিল্লাত আর রাজিয়া হাঁটতে শুরু করে। ওদের দিকে চেয়ে তখনও রিয়াজ দাঁড়িয়ে থাকে। পলক ফেলে না।

রাজিয়া নিজেই যে একটা আন্দোলন, সন্দেহ কি ? ভাবছিল মিল্লাত। কিন্তু মনে তার একটি অন্য আন্দোলন চলছিল। আজকার আলাপ-পরিচয়ে কথাবার্তা যেভাবে ভেবেছিল তার কিছুই তো হল না। ওর মনে একটা জেদ ধরে গেছে। মবিনের কাছে রাজিয়াকে গ্রহণযোগ্য করানো তার যেন দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দায়িত্ব কোথা থেকে কীভাবে মনের মধ্যে চলে এসেছে, কেন সে এরকম করছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তার নিজের কাছেও নেই। তার মন বলে, বাপের জীবন পদ্ধতির মধ্যে যে মেয়ে মানুষকে নিয়ে নিকৃষ্ট কতক অনুভূতি ছিল, তা ছিল তামসিক ও পাপবিদ্ধ। এবং সেই পাপাচার নিয়ে তার নিজস্ব বিচারের, তা কোন ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত নয়। ফলে সেখানে জমে উঠেছে এক নিরাবয়ব তামসিকতার বিরোধ, সেটি হয়েছে কোন উচ্চতর সভ্য কল্পনার কারণে, সেই কল্পনাও তার আপন জীবনকে ঘিরে। মনে হচ্ছে, তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত দরকার। আলো দরকার। আলোর এক নিমগ্ন পরিস্ফুটন হয়, যদি সে রাজিয়াকে একটি সুসভ্য জীবন দিতে পারে। কোন ভালবাসার জীবন। কারণ রাজিয়া শুধু বাড়ি দখল করে কোন আশ্রয় চায় না, সে তার ভালবাসাকে অন্বেষণ করে ফিরছে। এই ধরনের একটি মনকে আবিষ্কার করার পর সেই মনের সৌন্দর্যকে মবিনকে চেনানো যে কোন শিক্ষিত মানুষের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। মবিনকে বা মবিনের মতন আর পাঁচজনকে। কিন্তু মবিন যেন চিনতে পারছে না। বাইরে রাজিয়া যত সুন্দর, মনে ততোধিক। এ কথা কি তার রাধারানীর গল্পে প্রমাণিত হয়নি ? রুক্মিণীকুমার কোন নির্দিষ্ট মানুষ বা মানবাকৃতি নয়, সেটা একটা ধ্যানমাত্র। হ্যাঁ, রাজিয়া তুমি মনে করো আমি তোমার গল্প বুঝতে

পারিনি। তাই কি? রাজিয়ার কথায় মিল্লাতের আত্মআলোচনা ছিন্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি ওরা হাঁটছে। রাজিয়া জিজ্ঞাসা করে—রিয়াজ কী করেন?

—দেখলে তো, চাকুরি।

—আর কী করেন?

—লেখে।

—আর কী?

—আর? না, কোন সংসার করে না। বিয়ে করেনি।

—কেন?

—কখনও বলে না। প্রশ্ন করলে গম্ভীর হয়ে থাকে।

—কেন?

—সেটা ওকে শুধিয়ে নিও।

আবার ওরা হাঁটতে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। ফের প্রশ্ন করে রাজিয়া—পরশু নেমন্তন্নে যাচ্ছ, তাহলে?

—কেন, তুমি যাবে না?

কিছুক্ষণ উত্তর দেয় না রাজিয়া। মিল্লাত জিজ্ঞাসা করে—কথা বলছ না যে?

—কী বলব?

—যাবে না?

—রিয়াজ বোধহয় আসবেন?

—ও খুব ভুলো। আসতেও পারে। কেন, তার সঙ্গে তোমার যাওয়া নির্ভর করছে নাকি?

—না। তা নয়। আমি ভাবছি, বেচারি আমাকে চিনতেই পারেননি।

—পেরেছে।

—কী করে বুঝলে?

—তোমার নাম বলল, নিশ্চয় মবিন সব বলেছে। কফি বলতে গিয়ে কথা হয়েছে তখন। নিচে।

—সব নাও বলতে পারে। কারণ সব কথা জানার পর তাঁর কিছু বিকার চোখে পড়ল কিনা!

—ওর নির্বিকার থাকার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি।

এবার ওরা দীর্ঘক্ষণ কথা বন্ধ করে। কোর্টের কাছে পৌঁছে যায়। রিকশায় উঠেই রাজিয়া বলে—তোমার বন্ধু মবিন আমায় দেখে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল

যে তখন খারাপ লাগলেও এখন হাসি পাচ্ছে। লাইব্রেরিতে ঢোকার আগেই আমরা আছি জেনেও নিজের দুরবস্থা গোপন করতে পারল না। বেশ চমৎকার লোক। রেগে যাচ্ছিল। মিল্লাতের চোখমুখ কেমন এক সূক্ষ্ম ভাবনায় মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। ওকে লজ্জিত দেখাল। রিকশা চলতে শুরু করলে রাজিয়া বলল—পরশু একবার যেতেই হয় তাহলে। হাজার হোক আমিও তার বন্ধুস্থানীয়। কী বলো?

মিল্লাত বুঝতে পারল, রাজিয়ার মন চঞ্চল হয়ে আছে। আঘাত লেগেছে অনিবার্য। মিল্লাত আরো লজ্জিত হয়ে উঠল। তখন জেদ আরো চেপে বসল তাকে। মনে মনে বলল—তুমি নিশ্চয় একটা আন্দোলন ফুলবউ, স্বীকার করি।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভীড়। অফিস আদালতের ভীড় যাকে বলে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। চারিদিক থেকে কুলকুল করে অজস্র স্রোত এসে রাস্তায় নামছে। রিকশাঅলা ভীড় ঠেলে যেতে পারছে না। সিট থেকে নেমে একটু একটু গড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এমন সময় বাহারপুরের দু'তিনজন স্বল্প চেনা লোককে দেখতে পায় রাজিয়া। সঙ্গে আরো কেউ, কোন দলবল আছে কিনা রাজিয়া বুঝতে পারে না। লোকগুলি রাজিয়াকে দেখে ফেলেছে। ভীড় ঠেলে হাতের ইশারা করে ওরা রিকশার কাছে পৌঁছতে চাইছে। হাত নেড়ে কী বলছে বোঝা যায় না। বোধহয় থামতে বলছে। ভীড়ের চাপ আরো বাড়তে থাকে। তবু রিকশাঅলা কোনমতে খানিকটা পথ করে নেয়। ফুটপাথে নামিয়ে ফেলে রিকশা। একটু একটু করে গড়ায়। হঠাৎ খানিকটা ফাঁকা পথ পেয়ে সেটুকু ঠেলে আনে দ্রুত। ফুটপাত থেকে উঠে পড়ে। তখন আরো খানিক ফাঁকা রাস্তা। কিঞ্চিৎ দৌড়ে ছুটে যেতে যেতে লাফিয়ে 'সিটে' উঠে বসে। চালাতে শুরু করে। হঠাৎ রাজিয়া পেছন ফিরে লোকগুলোকে দেখবার চেষ্টা করে। ওরা ছুটে আসছে। রাজিয়া রিকশাঅলাকে বলে—আরো একটু টেনে চলো ভাই।

রিকশাঅলা আরো খানিক গতি বাড়িয়ে দেয়। ওরা আরো কিছুক্ষণ ছুটে এসে বুঝতে পারে ধরা যাবে না। ওরা থেমে যায়। রাজিয়া বারবার পেছন ফিরে দেখছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মিল্লাত জানতে চায়—কী দেখছ অমন করে?

রাজিয়া উত্তর দেয়—কিছু না। কী ভয়ানক ভীড়! রোজই কি এইধারা হয়?

মিল্লাত জবাব দেয়—হ্যাঁ। কলেজ কোর্ট হাসপাতাল সিনেমা, এইসময় রোজই রাস্তায় জ্যাম। চারিদিক থেকে চাপ হয়।

রিকশা চলছিল। ঠিক এক মিনিটও হয়নি। রিকশার পাশে একজন সাইকেল চালক মাঝবয়সী অফিসবাবু এলেন। সাইকেল চালিয়ে চলেছেন।

বললেন—ওরা আপনাদের খুব শাসাচ্ছে। রিকশা থামাতে বলছে। কী হয়েছে ? দেখে নেবো বলে লাফাচ্ছে দেখলাম। কী ব্যাপার ?

—কে ? কারা ? এই থামো তো ! বলে ওঠে মিল্লাত। পেছন ফিরে দেখে। রিকশার গতি কমে যায়। মিল্লাত নেমে পড়ার উপক্রম করতেই রাজিয়া বাধা দেয়। হাত চেপে টেনে ধরে নিরস্ত করতে করতে বলে—ওরা যা ইচ্ছে বলুক। গায়ে পড়ে কোন কিছু করতে যেও না। নামবে না তুমি। এই রিকশা, চালাও তো ! থামলে কেন ?

কিছু লোক মুহূর্তে রিকশার দিকে কী হয়েছে জানতে ছুটে আসে। ওরা পেছনে ভয়ানক তর্জন করছে। সাইকেলঅলা সাইকেল থেকে নেমেছে। অবশ্য নামার কোন প্রস্তুতি ছিল না। লোক ছুটে আসায় নামতে বাধ্য হয়েছে। জোরে জোরে বলল—দেখুন, অযথা বাহাদুরি করতে যাবেন না। চলে যান।

মিল্লাত জোর করে নেমে পড়েছিল। বাহারপুরের ওরা এগিয়ে আসছে। ভীড় বেড়ে যাচ্ছে দেখে একজন মিল্লাতকে পথ আটকে ধরে এনে রিকশায় উঠিয়ে দেয়। বলে—আরে মশাই, সব নোংরা ছেলেপেলে, একটা হুজ্জোত্ করবে, খামাকা গায়ে মাখছেন কেন, উঠুন ! এই শালা বিশে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন, চালিয়ে চলে যা। জানিস তো কিসে কী হয় ? গতকাল এখানেই দুটো জখম হয়েছে।

মিল্লাত গজগজ করতে করতে উঠে পড়ে। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, লোকগুলো গাঁয়ের এবং হয় বৈদ্যবাটির নয় বাহারপুর। মনের মধ্যে সহসা এই কথা খেলে যেতেই ও উত্তেজিত হয়ে নেমে পড়েছিল। রাজিয়া যখন বারবার পেছনে ফিরে দেখছিল তখনই সন্দেহ হয়। কারণ ওদের হাতের ইশারা মিল্লাতেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু রিকশা থেমে যাওয়ার পর তার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ঐভাবে নেমে পড়ার মধ্যে একটা নম্র ক্ষোভ ছাড়া কোন অভদ্রতা প্রকাশ পায়নি। তার নিজেরও হঠাৎ কেমন একটু ভয় হয়েছিল। কারণ শহর এখন সমাজবিরোধীরাই শাসন করছে, গাঁয়ের মাকড়া কিম্বা শহরের মস্তান গলাগলি হয়ে আজকাল নতুন টীম তৈরি হচ্ছে। শহরের মস্তানীর ঘোলাস্রোত গ্রামের দিকে হুড়হুড় করে ঢুকে গিয়ে গাঁ-গঞ্জেও নয়া মস্তানবাহিনী গড়ার জন্য ষণ্ড-নাগরিক ইজ্জৎ সম্পর্কে লোভ জাগিয়ে তুলছে সমাজ বিরোধীদের মধ্যে। মিল্লাত ভাবছিল, শহর থেকে গাঁয়ে সভ্যতা যেতে গিয়ে ভারি লজ্জা পায়, কিন্তু তার কদর্যতা ক্যানসারের মতন সাহসী। বন্যার মতন জিভ দিয়ে মাটি চাটতে চাটতে ছোটে। তার সঙ্গে গ্রামের

নিজস্ব আতঙ্ক আর বাহাদুরি তো বাহারপুর কম জানে না। রিকশাঅলা বলল—দিনের বেলা গুলি খেয়ে এক হপ্তা আগে এক শালা মস্তান হজম হয়ে গেল। পাল্টা অ্যাকশন এখনও হয়নি। কখন যে লাশ পড়বে বলা যায় না। সন্ধ্যার পরই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও বেশিরভাগ গাড়ি বন্ধ করে দিই। প্রাণের মায়া বড় জিনিস।

রাজিয়া বলল—তুমি আর কথা বলো না, তাড়াতাড়ি চলো।

রিকশাঅলা আরো গতি বাড়িয়ে দেয় সামান্য। বেশ কিছু দূর আসার পর প্রায় অবরুদ্ধ গলায় রাজিয়া বলে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না মিল্লাত।

॥ নয় ॥

মিল্লাত ভোরের দিকেই টিউশানি গিয়েছিল। তার একই পাড়ায় আরো দুটি টিউশানি বেড়েছে। কিন্তু সুবিধা হয়েছে অন্যরকম। নতুন দুজন ছাত্র পুরনো দুজনের সঙ্গে একই বাড়িতে পড়ছে। ফলে সময় অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে না। অন্য বাড়িতে আরো দুটি ছেলেকে পড়াতে হয়। সেখানেও বোধহয় ছাত্র বাড়বে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্ধ্যায় তার মেয়েকে পড়াবার জন্য বলেছিলেন। মিল্লাত রাজী হয়নি। কারণ ৫০ টাকার আলাদা করে একটি মাত্র টিউশানি করানো তার পক্ষে অসুবিধা। সে একশ টাকা দাবী করেছে। পরে আর কথা হয়নি। অন্যরা সব পঞ্চাশ টাকার ছাত্র। তার রোজগার এখন তিন শো টাকার মতন। সে চাইছে আরো ছাত্র বাড়ুক। কিন্তু আলাদা আলাদা সময় যাতে ব্যয় না করতে হয়, তাতে বেতন কিছু কম হলেও চলবে।......

সকালবেলা রাজিয়া বাড়িতে একাই ছিল। এমন সময় সাদিক এল। রাজিয়া স্নান করে বাসনপত্তর ধুয়ে কয়লার আঁচে আগুন করেছে। চা করছিল নিজের জন্য। এক কাপ জল বেশি দিল। সাদিকের গলা শুনে বলল—তুমি ঘরে গিয়ে বসো, আসছি। কথা আছে ঢের।

চা করে নিয়ে হাঁড়ি চড়িয়ে চাল ফেলে দিয়ে রাজিয়া এল। প্লেটে বিস্কুট আর চা এগিয়ে দিল সাদিকের দিকে। বলল—ঢের দুশমনি দেখেছি, এমন বজ্জাতি তুমি করবে ভাবিনি। সাদিক বিস্কুট কামড়ে বলল—পরে আমি সব বুঝতে পারলাম ছোটমা। আগে ওরা কিছুই বলেনি। ভেবেছিলাম বিয়ে না বিয়ে।

রাজিয়া বলল—এখনও তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তোমার সব মিথ্যা আমি ধরতে পারব। ভেবো না চোখে ধুলো দিলেই মানুষ চিরকাল অন্ধ থাকে। বাহারপুরে তোমার স্কুল। ওরা তোমাকে চাপ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। মুখ দেখানির

ষড়যন্ত্র সেই কথাই বলে। তুমিই ডেকে নিয়ে গেলে, অথচ তুমি নিপাত্তা। তুমি জানতে সেইদিন কী ঘটবে। জানতে না ?

—বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক....

—তুমি নবীনার বর। তুমি এত ছোটলোকী করে বেড়াও, স্কুলে মাস্টারী করো। ভাবা যায় না। এরপরও তুমি বিশ্বাস করতে বলো। ছিঃ ছিঃ, তুমি কি মানুষ ?

সাদিক কথা বলে না। চুপচাপ চা খায়। চোখ তুলতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা পায়। বলে—বিশ্বাস করুন।

—না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। কালই রাস্তায় কোর্টের কাছে বাহারপুরের লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বোধহয় জমির মামলা, নয় বউ তালাকের কেস। হিন্দুরা বলে, এ-দেশে মুসলমান না থাকলে কোর্ট উঠে যেত। ঠিকই বলে। সাদিক চমকে উঠল। থতমত করে বলল—ওরা কী বলল আপনাকে ?

—সবই বলল। আমি কি বানিয়ে বলছি নাকি ?

—দেখুন, ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা ভাল লোক নয়। ওরা সব পারে। সব ক্রিমিনাল। রাজিয়া বাঁকা হাসে—বটে। সব ক্রিমিনাল। কিন্তু তুমি খুব ভাল। শুদ্ধ লোক। তাই না ? আমার সামনে এইভাবে সাধু সাজবার চেষ্টা করো না সাদিক। ভাল চাও তো, সব কথা খুলে বল।

—সবই বলছি আপনাকে। সব বলব বলেই এসেছি ছোটমা। গোপন করব না। আনোয়ার যে এতবড় খ্যাঁকশিয়াল তা জানতাম না। তলে তলে আপনার এত ক্ষতি করে, তবু আপনি ওকে বিশ্বাস করেন। বাহারপুরের কাশেম আলি ওর বেয়াই, জানেন তো।

—জানি।

—চয়ন সরদার কাশেম আলির দোস্ত।

—হ্যাঁ।

—জানেন নাকি ?

—না। কথা বলো, শুনছি। মোদ্দা কথা কী ?

—সেটাই বলছি ছোটমা।

—এক ফোঁটা মিথ্যা বলবে না।

—না। বলব না। সব রিয়্যাল ফ্যাক্ট বলব।

—অত ভুল ইংরেজি বলতে হবে না। ফ্যাক্টই বলো। ঘটনা বলো।

সাদিক আরো লজ্জা পায়। রাজিয়া বলে—বায়াত্তর সালের গণ টুকাটুকির বছর পাশ করেছ তুমি। ইংরেজি বলো না। বাংলা বলবে।

—তাই বলছি।

—হ্যাঁ, তাই বলো। দোস্তের উপকার করতে চায় কাশেম আলি।

—জী। কারণ কাশেম আলির ঘরে আনোয়ারের কালো মেয়ে মজুদ। সেটাও আপনার মুখ-দেখানিতে বিয়ে হয়। ছেলে বলছে, বউ ছেড়ে দেবে। বাপের সম্মানে ছাড়তে পারছে না।

রাজিয়া বলল—আনোয়ারের মেয়ের বিয়ে আমার মুখ দেখানিতে হয়নি। ওটা এম্নিই হয়েছে। ঘটনা হয়েছে চয়নের ছেলের বেলা। জয়েদ বোধহয় নাম। রাগ তারই। ময়েদ ছোটভাই। ময়েদালি। রুহানির বিয়ে এই ময়েদালির সঙ্গে। আমি যেটুকু বুঝেছি, রুহানির কোন বিয়ের কথাই হয়নি। সেটা সাজানো ঘটনা।

—হ্যাঁ। আমাকে বলল.....

—কে বলল ?

—আনোয়ারই বলল ওর মেয়ের ছাড়ান হয়ে যাবে, কাশেম আলি ভর করছে। ছেলে নাকি শুনছে না। এই অবস্থায় ময়েদের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ে দিলে চয়নের ছেলে জয়েদ ঠাণ্ডা হয়। কারণ জয়েদের বন্ধু কমর। কাশেমের বেটা কমর আলি। আনোয়ারের জামাই। সব অ্যান্টিসোসাল, ক্রিমিনাল।

রাজিয়া একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল—অত জটিল করে বলছ কেন ? সব কারসাজি জয়েদের। জয়েদ তার বন্ধু কমরকে দিয়ে চাপ করিয়েছে মেয়ে ছেড়ে দেবার। তাই তো ?

—জী।

—কারণ ওর ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়।

—জী।

—তাহলে উপকার কাশেমের করছে চয়ন। কাশেম কারো উপকার করছে না। তখন ভুল বলেছিলাম।

—না। কাশেমও উপকার করছে। তার বেয়ায় আনোয়ারের উপকার করছে।

—বেশ। মেয়ে কালো বলে তালাক হয়ে যাবে, ছেলে লাফাচ্ছে, এই অবস্থায় তার দোস্তের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সব কুল রক্ষা পায়।

—জী।

—তাহলে এবার বলো, জয়েদকে তুমি কী কথা বললে ? ও যখন অ্যান্টি-

সোসাল। তোমার স্কুলে এসে সেদিন জয়েদ কী বলেছিল ?

—না। স্কুলে বসেনি। আপনাকে বলেছে শয়তানটা।

—দ্যাখো সাদিক। তুমি যে অ্যান্টিসোসালদের থানিদার এ-কথা আমরা জানি। কিন্তু আমি ছোট মা বলে তোমার একটা চক্ষুলজ্জা আছে মনে করতাম। নবীনা এ সব কথা জানে ?

—না।

—দাঁড়াও ওকে আমি চিঠি লিখছি।

—জী না। সেটা করবেন না। ও খুব দুঃখ পাবে।

—আমি যে খুব দুঃখ পাচ্ছি সাদিক।

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ? গতকাল আনোয়ারের মেয়ে তালাক হয়ে গিয়েছে। জয়েদ তালাক করিয়ে দিয়েছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

—কেন ?

—বলা তো যায় না।

—ও। তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ!

—জী না। তা নয় ছোট মা। খারাপ লাগলেও বলছি, আপনি কোথাও বিয়ে করে ফেলুন।

—কেন ?

—অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, এখন একটা ভাল বিয়ে হবে। করে ফেলুন। এভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন বলেই চারিদিক থেকে সবাই ছোবলাচ্ছে। জয়েদের রোখ খুব খারাপ। ওরই চাপে পড়ে আনোয়ারের এই হেনস্থা, আমি ছোটলোক হয়ে গেছি। চায়ের কাপ পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সাদিক। বলল—মিলু ভাইকেই সব কথা বলব ভেবেছিলাম, মবিন ডাক্তার বললে......

—কী বললে ?

—আপনাকেই বলতে বললে।

—ও।

সাদিক বেরিয়ে চলে গেল। রাজিয়া খাটে স্থির মূর্তির মতন বসে রইল অন্যমনস্ক। একসময় আস্তে আস্তে উঠে রান্নাঘরে এল। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছিল। আঁচে আগুন গনগন করছে।

রান্না করতে করতে রাজিয়া বারবার চিন্তার চাপে ক্লিষ্ট আর অন্যমনস্ক হয়ে

পড়ছিল। চামড়া কালো হওয়া যেমন কষ্টের, গরিবের জীবনে সাদা চামড়াও কোন গৌরবের নয়।

গরিবের ঘরে ধনসম্পদ সহসা সঞ্চিত হলে, তা পাহারার ব্যবস্থা তার থাকে না। হয় তাকে দ্রুত বড়লোক হয়ে ঘর সামলানোর আভিজাত্য গড়ে নিতে হয়, নয় সম্পদের অভিশাপে তাকে পথে বসে কাঁদতে হয়। তেমনি এক সম্পদের নাম রূপ। গরিব মেয়ের চামড়া সাদা হলেও আপন মাংসে হরিণীর আপন বৈরিতা দেখতে হয় তাকে। বৈদ্যবাটির কালো রূপের মধ্যে যে বর্ণবিদ্বেষজাত সঙ্কট জমা ছিল, রাজিয়া সেই সঙ্কটের ঘানি টেনেছে জীবনের কোন তাগিদে, মানুষকে বোঝাতে পারে না। সৌন্দর্য যখন কারো সম্পদ হয়, তখন সেই সৌন্দর্যেরও অপমান সইতে হয় কাঙাল পৃথিবীর কাছে মানুষকে। মনে হয় বৈদ্যবাটি কালো আর কাঙাল বলেই হিংসুক। আর রাজিয়া সুন্দর বলেই অপমানিত। আজ সেই সরল হিসাব না করে রাজিয়া কোন দিশে পায় না। কেন আমি রূপ নিয়ে জন্মালাম? কেন নবী মুসলমানকে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে বললেন? কেন বললেন কচি আর সুন্দরী বালিকা বিয়ে করো। কেন নবী বৃদ্ধ অবস্থায় ছ বছরের নাকি ন বছরের আয়েষাকে শাদী করেছিলেন? আয়েষার সঙ্গে দৌড়তে পারতেন না নবী। হাঁপিয়ে পড়তেন। দৌড়নর খেলা খেলে হজরত আয়েষা খুশি হলেও আমি যে পারিনি কখনও। কেন মেনে নিতে পারিনি। কী ছিল মনের আড়ালে? হজরত আয়েষা পারলেন। আমি কেন পারলাম না? আমি তো আয়েষার চেয়ে গুণী নই। নিসার হোসেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে দৌড় প্রতিযোগিতার ধুলি খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। দৃশ্যটা কল্পনা করে রাজিয়া। দৌড়তে দৌড়তে জিভ ঝুলে গেছে বৃদ্ধের। ধোঁকাচ্ছেন তিনি। তাঁকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে রাজিয়া। চলে গিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠছে। হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু কেন আমি তাঁর সেই সাধ পূরণ করিনি? নিসার হোসেন কি আমারই শোকে মৃত্যুর আগে অমন শুকিয়ে গিয়েছিলেন? নাকি অন্য কোন পাপবোধ ছিল? তিনি যে হাজেরা আর মাবুদকে কত অসহায় করে তুলে কষ্ট দিলেন, সেই নিগ্রহের পরও আমায় পেলেন না, সেই পরিতাপ কি তাঁকে শুকিয়ে মেরেছে? হায় খুদা! আমি এ সব কী ভাবছি?

চমকে উঠল রাজিয়া। হাঁড়ির ঢাকনা ভাতের ফ্যান উথলে দিচ্ছে ফরফরিয়ে। সেই শব্দে চমকে উঠল সে। তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

মিল্লাত আজ পুরনো চারজনের বেতন পেল। দুশো টাকা। ভাবল, আজ কিছু কেনাকাটা করবে। মাত্র দুশো টাকায় আক্রার কালে কীই বা এমন কেনা

যায় ! একখানা ভাল শাড়ির দাম এই টাকায় কুলবে কিনা সন্দেহ। কুলবে না। অতএব কী কেনাকাটা করবে। ভাবতে ভাবতে সে একটা পরিচিত কাপড়ের দোকানেই ঢুকল। সেখানেই নন্দকিশোরের সঙ্গে দেখা। মিল্লাতের নিচের তলায় ভাড়া থাকেন। নন্দবাবু ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্টে চাকুরি করেন। তিনিও ছেলেপুলের জন্যে কেনাকাটা করছিলেন। মিল্লাতকে শাড়ির দর করতে দেখে পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললেন—গিন্নিকে সঙ্গে করে আনতে হয় ব্রাদার! পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য শাস্ত্রের কথা। কিন্তু পতির পছন্দে খুব কম সতীই পছন্দ করেন শাড়িগহনা। যেটাই দেবেন বলবে এটা কি রঙ না প্রিণ্ট! পুরনো আর ম্যাড়মেড়ে। আজকাল কত বাহারী জিনিস উঠেছে। একটু দেখে নিলেই এই দামে কত ভাল জিনিস পাওয়া যায়। হেঃ হেঃ ! তা কী কিনলেন বলুন ! আমি রঙটা চয়েস করছি !

—হ্যাঁ, দেখুন তো ! কী কেনা যায় ! তাঁতের কাপড়ই ভাল। সিন্থেটিক পরলে ওর ফের.....

—এলার্জি।

—গায়ে কী সব ঘা মতন....

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার গিন্নিরও তাই। ও ভাই, তাঁত দেখাও তো !

—আপনার অফিস কেমন চলছে ?

—আর অফিস !

—চাকুরি একখানা করছেন বটে আপনারা। এত আরাম !

—যা বলেছেন !

—আমি কিন্তু গিন্নির জন্য কিনছি না !

—গিন্নি তাহলে রাগ করবেন ! নতুন গিন্নি, মুখে বলবে না, কিন্তু পরে দেখবেন মুখ ভার। তাঁর জন্যও কিনে নিয়ে যান। মেয়েদের চেনেন না।

—আপনি একটু ভুল করছেন নন্দবাবু !

—অ্যাঁ !

—ভুল করছেন ! উনি গিন্নি নয়।

—তাহলে ?

—থামলেন কেন ? পছন্দ করুন ?

—গিন্নি নয় বলছেন !

—গিন্নি নয় তাই গিন্নি নয় বলছি। উনি আমার আত্মীয়া।

নন্দবাবুর যেন আগ্রহ কমে গেল। দমে গেলেন তিনি। তবু একখানা রঙিন

বেশ জমকালো পছন্দ করে দিয়ে বললেন—আমরা ভাবতাম আপনার বিয়ে হয়েছে। নন্দবাবু কেমন অবাক হয়ে গেলেন। শাড়ির প্যাকেট নিয়ে মিল্লাত দোকান ছেড়ে চলে এল। একটি নারকেল কৌটো, একটা ফেস ক্রীম। একটা জুতোর কালি। দুশো টাকা উড়ে গেল। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে বাড়ি ঢুকল।

স্নান খাওয়া করে মেঝেয় জুতো কালি করতে বসল। নিজের জুতো কালি করে নিয়ে রাজিয়ার চটি কাল করল। টেবিলের তলায় পাশাপাশি দু জোড়া পালিশ করা জুতো চিকচিক করছে। এক জোড়া স্যু, একজোড়া লেডিস স্যাণ্ডেল। পাশাপাশি। মনে হচ্ছে, জুতো জোড়াগুলি স্বামীস্ত্রীর মতন নিরুদ্বিগ্ন সহাবস্থান করছে। মানুষ দুজনই ঠিক সেকথা বুঝেও বুঝছিল না, বলেই দুজন দুজনকে সেকথা বলতে পারেনি। জুতোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে গম্ভীর কণ্ঠে রাজিয়া বলেছিল—সকালবেলা সাদিক এসেছিল। মিল্লাতের খুশি মুখ মুহূর্তে পানসে হয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। তথাপি শুধিয়েছিল—সিন্থেটিক পরলে তোমার এলার্জি হয়?

—না তো!

মিল্লাত হো হো করে হেসে উঠেছিল। এবং চুপ করে গিয়েছিল।

॥ দশ ॥

হো হো করে হেসে উঠে রিয়াজ বলল—ওরা তবে মা আর ছেলে, আই সি! কিন্তু সে কথা তো সেদিন বললে না?

মবিন বলল—বলার আর সময় হল কোথায়? তাছাড়া বলারই বা কী ছিল? সমস্যা যা দাঁড়িয়েছে, সব অবস্থার সামাল আমাদেরই দিতে হবে। ওদের গতিবিধি ভাল নয়। ওরা কী করছে, দুজনই বুঝতে পারছে না। এভাবে একত্রে থাকা, সাজগোজ করে বাইরে বেরনো বিপজ্জনক। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলো। বন্ধু হিসেবে আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কিছু সামাজিক দায়িত্বও আছে।

—যথা?

—রাজিয়ার সত্বর বিয়ে হোক।

—তুমি করবে? পারো না? রাজী থাকলে বলো, আমি কথা বলব।

—না। আমাকে মিল্লাতও প্রস্তাব করেছিল। আমি 'না' করে দিয়েছি।

—কেন?

—সেটা সম্ভব নয়।

—কেন ?

—না। মানে। সম্ভব নয়। তার আবার কেন কিসের ?

রিয়াজ গম্ভীরভাবে মবিনকে দুচোখ ছোট করে দেখছিল। বাগানের চেয়ারে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে। রিয়াজ দুটি হাত আঙুলের গ্রন্থিলগ্ন করে ঠোঁটের উপর তুলেছে। একটি তর্জনী ঠোঁটে ঘষছে। তালুতে তালুতে আঙুলে আঙুলে যুক্ত হাত কোন প্রার্থনার নয়, প্রতিজ্ঞার নয়, চিন্তার। কারণ আঙুলের ফাঁকে আঙুল জড়িত। চোখ দুটি বিমর্ষ। বলল—তোমার পছন্দ নয় ? আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগল সেদিন। আজ ওদের দুজনকেই দেখতে এলাম এখানে। অনেক পুরনো সামাজিক লোকজন আসবে, রাজিয়াকে নিষেধ করে দিলে, নইলে সে সেজেগুজে আসত। এলে পর, আমি দেখতে পেতাম, তোমার সমাজ কী প্রচণ্ড পেলব।

—পেলব ?

—হ্যাঁ পিচ্ছিল।

—তার মানে ?

—মানে কীরকম হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি ?

—তুমি ঠাট্টা করছ ? এটা কি ঠাট্টার জিনিস ? আর সমাজটা কি তোমার নয় ? কেন ঠাট্টা করবে ? রিয়াজ তর্জনী দিয়ে ঠোঁটে মৃদু মৃদু আঘাত করছিল। বলল—না। ঠাট্টা কেন করব ? আমি আগেই চিনেছিলাম, সেদিন ওদের লুক্‌স্ দেখেই মনে হয়েছিল, ওদের কিছু সমস্যা হয়েছে। রিয়াজ 'সমাজ' কথাটিকে এড়িয়ে গেল। মৃদু তপ্ত মবিনও আর প্রশ্ন তুলল না। বলল—মেয়েটা বরাবরই ঐরকম সাজতে ভালবাসে। যেহেতু ও জানে ও খুব সুন্দরী। হাজীর মৃত্যুর দিন খালাস চাইতে গিয়ে ঐরকম সেজেছিল। ফলে বলছি, ওর বিয়ে হওয়া উচিত। তুমি মিল্লাতকে বুঝিয়ে বলো। দাঁড়াও, আমি ভেতর থেকে ঘুরে আসি একফোঁটা। নবীনা এল বোধহয়।

—নবীনা কে ?

—মিলুর বোন। নানীও এসে গেছে।

—প্রচুর লোক হবে মনে হচ্ছে।

—তা কিছুটা হবে বৈকি !

মবিন ভেতরে চলে গেল। রিয়াজ চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দ হাসি আর চিন্তায় জড়িয়ে গেল। চিত হল। পাঁচ মিনিট মতন কেটে গেল। এমন সময় মৃদু ডাক

শোনে—রিয়াজ! এখানে একা?

চোখ খুলল রিয়াজ। সামনের চেয়ারে মিল্লাত। সোজা হয়ে বসে রিয়াজ। বলে—তুমি কি একা এলে?

মিল্লাত উত্তর দেয়—না। একা নই। রাজিয়া এসেছে। মানে ছোটবউ।

রিয়াজ বলে—ভেরি গুড। তারপরই বিস্মিত গলায় উচ্চারণ করে—ছোটবউ?

—হ্যাঁ। ওকেও আনলাম। হাসতে হাসতে বলল মিল্লাত।

মৃদু মিষ্টি হেসে 'ছোটবউ' বলার মর্ম রস শুষে নেয় রিয়াজ। বলে—ভাল করলে। কিন্তু এখানে আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। উপহার দেব। খাব। চলে যাব। তোমার বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেব।

—তাই হবে।

—হ্যাঁ। সেটাই করবে। আর শোনো, মবিন রাজিয়াকে বিয়ে করতে চাইছে।

—তোমায় বলল!

—বলেনি ঠিক। তবে তাই যেন মনে হল।

—আমি সেইরকমই চাইছিলাম। একটা খুব ভাল খবর শোনালে তুমি। মিল্লাত উল্লসিত হয়। রিয়াজ বলে—খবর যাই হোক। বিয়ে করবেই এমন কোন কথা নয়। করতেও পারে। তবে তোমরা দুজন একত্রে আছো বলে মবিনের ভারি লজ্জা।

মিল্লাত হেসে ফেলে শুধাল—তুমিও কি লজ্জা পাচ্ছ?

—আমি? তা কিঞ্চিৎ পাচ্ছি। পাব না? মুসলমান হলে লজ্জা নিশ্চয় পাব। খারাপ লাগে। কষ্ট হয়।

—বুঝলাম না।

—বোঝার কথা তো নয়। যাও ভেতরে গিয়ে মবিন আর রাজিয়াকে ডেকে নিয়ে এসো। রাজিয়াকে একলা ছেড়ে দিয়ো না। ঠোকরাবে সবাই। কাকের দল মচ্ছব করবে, সেখানে ময়ূরী কেন যাবে? নিয়ে এসো। দুখানা চেয়ার আনবে। আর বলবে, ভেতরে খুব হৈচৈ। আমরা একটু আলাদা থাকব। বাগানটা বেশ নির্জন। মবিন একটা বেশ বেহেস্তি ব্যবস্থা করেছে। যাও তো।

রাজিয়া আগের দিনের চেয়ে আরো বেশি আলোকিত। নতুন শাড়িতে গহনায় আরো বেশি রাজেন্দ্রাণী। ঠোঁটে অব্দি রঙ দিয়েছে। পায়ে আলতা। ঝলমল করছে গন্ধে আর সুষমায়। কাজলটানা চোখ আরো দীঘল ও উজ্জ্বল ছায়াময়। সেদিকে চেয়ে মবিনের বুকটা কেমন চনমন করে উঠল। নবীনা

রাজিয়ার কাছে এসে বলল—চিনতে পারিনি। তুমি আমাদের ঘরের বউ। ছোট-মা। একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—কী রকম ?

—মনে হচ্ছে কারুকে জয় করতে বেরিয়েছ।

—তাতে কি পাপ হয়েছে ?

—মোটেও না।

এমন সময় ওদের কথার মধ্যে মিল্লাত এসে দাঁড়ায়। বলে—চল নবীনা আমরা বাগানে গিয়ে গল্প করি। মবিন, তুমিও এসো। রিয়াজ হৈচৈ-এর মধ্যে আসতে চাইছে না। দুখানা চেয়ার দাও। মবিন বলল—ভাবুক বলে কথা। নির্জনতা খুঁজছে। কিন্তু এটা ভাই খানাবাড়ি, লোকজনের চাপাচাপি সইতে হবে। বেশ, চেয়ার দিচ্ছি। এবং তোমাদের একটা আলাদা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। বাগান থেকে এসে ঐ ঘরটায় ঢুকে যাবে। আমি পরে বাগানে যাচ্ছি।

দু হাতে টিনের চেয়ার ঝুলিয়ে আসে আগে আগে মিল্লাত। পে'ছনে পেছনে রাজিয়া আর নবীনা বাগানে চলে আসে। চেয়ার পেতে দিয়ে ওদের বসতে নির্দেশ করে মিল্লাত। পরিচয় করিয়ে বলে—আমার বোন নবীনা। রিয়াজ হাত তুলে বলে—সালাম। নবীনাও হাত তুলে প্রতি-সালাম জানায়। হাসি মুখে-সামনের চেয়ারে বসে। মিল্লাত শুধায়—সাদিক এল না ?

নবীনার হাসি মুখ গম্ভীর হয়। নিচু গলায় বলে—না। আমি এসেছি। ওর সঙ্গে আমার একমাস দেখা নেই। দূরে স্কুল বলে বাহারপুরেই থাকছে। শুনতে পাচ্ছি, ওখানেই বিয়ে করে থেকে যাবে। সীতাহাটি আসবে না।

মিল্লাত বলল—গতকাল আমার ওখানে এসেছিল। দেখা হয়নি। ওকে ভয় দেখিয়ে গেছে। রাজিয়ার দিকে চোখের ইশারা করল মিল্লাত। নবীনা রাজিয়াকে একবার দেখে নিয়ে শুধাল—ভয় কিসের ?

—পরে বলব তোকে। এখন থাক। মিল্লাত বলে। রিয়াজ রাজিয়ার সৌন্দর্য দেখছিল। বলল—তুমি ভাই কামাল করেছ, এত রূপ নিয়ে কী করবে এখন ?

—মরব।

—সত্যিই বলছ নাকি ?

—মনে কি হল, আমি বাঁচতে চাইছি ?

—তোমাকে কিন্তু আমি বেঁচে থাকার কথাই বলছিলাম। বাড়িখানা পেয়েছ, এবার একটা বিয়ে করতে হবে।

—কাকে ?

—কোন একজনকে।

—সেটা কে? বয়স কত? কটা পক্ষ?

—সে কি?

—হ্যাঁ। তামাম বৃত্তান্ত জেনে, তবেই।

—নিশ্চয়।

—আমি আর ছেলেমানুষ নই।

—আলবাৎ।

—তাহলে বলুন, লোকটি কে?

—নামটা এখনই বলছি না

—আমি বলি। মিল্লাত বলে উঠল।

রিয়াজ বলল—তুমি তার নাম বলতে পারবে না। রিয়াজের কথায় সবাই নিশ্চুপ। মিল্লাত বুঝতে পারল, রিয়াজ অন্য কোন বিয়ের কথা ভাবছে। মিল্লাত বলল—কিন্তু মবিন তো রাজী হয়েছিল।

—রাজী হয়নি। তবে হয়ত রাজী হয়ে যাবে। রিয়াজ জানায়। বলে—সেইজন্যই বলছিলাম লোকটি কে এখনও ঠিক হয়নি।

—তুমি ওকে বোঝাও।

মিল্লাতের গলা গাঢ় হয়। নবীনা বলে—আমি একবার বলে দেখব? আমার কথা শুনতেও পারে।

—বলবি। নিশ্চয় বলবি।

—রাতে এখানেই থাকছি। কথাটা এক ফাঁকে তুলে দেব। নবীনা জানায়। —জৈগুনখালা? মিল্লাত শুধায়।

—তাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার। মহিলার টাকার লোভ খুব। এতবড় একখানা বাড়ি পাচ্ছে।

—আপনারা গল্প করব বলে ডাকলেন। কিন্তু আমার মরণের আগে সেই গল্প শুরু হবে না দেখছি। রাজিয়া বলে ওঠে। রিয়াজ লজ্জিত গলায় বলে—কিন্তু আমরা তোমার মৃত্যুর আগের গল্পটা শুরু করেছি।

—আপনি আমার কিছুই জানেন না। গল্প করবেন কী দিয়ে?

—প্লিজ! তাহলে শোনাও! রিয়াজ উৎসুক। মিল্লাত বলল—তাহলে শোনো। আমি কিছুটা বলি। ওর একটা রুক্মিণীকুমার ছিল। ওর নাম রাধারানী।

—বেশ। রিয়াজ উৎকর্ণ।

নবীনা বাধা দিয়ে বলে—সত্যিই গল্প। আমার বাপজান ওকে পাননি। বৃথাই বিয়ে। তিন দিন বিয়ের পর আমাদের ওখানে ছিল। বাপ আর ওর কোন সম্পর্কই হয়নি। জোর করে বিয়ে হয়েছিল।

—বেশ! আবার 'বেশ' বলে রিয়াজ। শুধায়—তাহলে বাসর হয়নি?

—না। নবীনা জোর দিয়ে বলে।

—তাহলে ফেরেস্তারা তাবত রাত অশ্রুপাত করেছে। হাদীসের কথা। এবং আজও করে চলেছে।

—কী বলছ এসব? মিল্লাত অসহিষ্ণু।

রিয়াজ বলে—ঠিকই বলছি মিলু। শোনো কথা। আবু হোরায়রা বর্ণনা করছেন। মুসলিম বা বুখারী যে কোন হাদীসেই দেখতে পাবে। যখন কোন রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং স্ত্রী অস্বীকার করে, তখন স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়—সেই রমণীকে সেই অবস্থায় সকাল পর্যন্ত ফেরেস্তারা অভিশাপ দেয়।

নবীনা বলল—ঐ জন্যে আব্বা ওকে মেরেছিলেন। আগুনের আঁচে পড়ে গিয়ে ওর কনুই পুড়ে গিয়েছিল। তবু ও ঘরে গেল না। ভয়ানক সেই যুদ্ধ।

রিয়াজ বলল—স্বামী তার স্ত্রীকে কী জন্য প্রহার করেছে তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে। আবু দাউদ। বর্ণনায়—ওমর (রাঃ)। অতএব বোন রাজিয়া, তুমি অভিশপ্ত।

—বলুন, তবে আমি কী করব? ভীষণ আকুল শোনাল রাজিয়ার কম্পিত! কণ্ঠস্বর। বাতাস ভারি হয়ে গেল।

—বলুন, আমার কী মরে যাওয়া উচিত নয়? বলুন আপনি? রাজিয়া ককিয়ে ওঠে। মিল্লাত অসহিষ্ণু। বলে—এইজন্যেই কি তুমি বিয়ে করতে চাও না? ছিঃ! তাহলে সেদিন অমন রাধারানীর গল্প শোনালে কেন? তুমি কী চাও? দ্যাখ নবীনা, সমস্ত দুঃখের জন্য ও নিজেই দায়ী। কেউ ওর ক্ষতি করেনি। সাদিক যে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, তা খামকা করছে না। ও ঠিক মরবে। তোমার মরাই উচিত। হ্যাঁ, মরো তুমি। রুক্মিণীকুমার তোমার জন্য এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলবে না। সে তোমাকে কখনও চিনতে পারবে না। তুমি নিজেই বলেছ, তার কোন চিহ্ন নেই তোমার কাছে। এমন একটা জটিল মেয়েকে আমার বন্ধু কেন বিয়ে করবে। না। অসম্ভব।

মিল্লাত কথা বলতে বলতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নবীনা বলে—তুমি এত ক্ষেপে ওঠো ভাইয়া যে সব কথা বলা যায় না। সবই যদি ওর

দোষ, ও তো বিয়ে করতে চায়নি। জোর করে ওর ভাইয়েরা বিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া আগে তোমার সঙ্গেই ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। দাদীর সেই প্রস্তাব আব্বা ভেবেও দেখলেন না এক দণ্ড। বদনা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। ওঠ ছুড়ি তোর বিয়ে বলে বিয়ে করে ফেললেন। এর কোন হাদীস নেই ? বলুন রিয়াজজী, মুখ খুলুন !

রিয়াজ স্মিত হেসে বলল—বলছি। শোনো তবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা (প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, কিন্তু হাদীস-সিদ্ধ। হায়েজ অর্থাৎ মাসিকের সঙ্গে মুসলমান বালিকার বয়ঃপ্রাপ্তির সম্বন্ধ আছে।) রসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে বলল যে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছে। রসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিবাহ বাতিল করার স্বাধীনতা দান করলেন। আবু দাউদ। বর্ণনায়—ইবনে আব্বাস (রাঃ)। বুখারী শরিফেও অনুরূপ ঘটনা আছে। তার মানে এই বিয়ে হয়নি। দ্বিতীয়ত আবু হোরায়রা খুব কড়া করে বর্ণনা করেছেন, বুখারী বা মুসলিম যেখানে খুশি দেখতে পাবে : কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত যেন তার কোন মুসলমান ভাই সেখানে বিবাহের প্রস্তাব না করে। অতএব এ বিয়ে হয়নি। কেমন ?

মিল্লাতের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল—তাহলে কিসের সংস্কার ? বাধা কোথায় ? বিয়েই যখন হয়নি, তাছাড়া সম্পর্ক ছিল না, মবিন কেন বুঝছে না, ফ্রেশ মেয়ে....ইয়ে ওকে একবার ডাকব ? এর চেয়ে ফ্রেশ মেয়ে আর কী হতে পারে ?

মিল্লাত উঠতে যাচ্ছিল। নবীনা বলল—সত্যিই তো বাধা তো কোথাও নাই।

মিল্লাত সঙ্গে সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলে বোনকে সমর্থন করে বলল—আমি ডাকছি।

রাজিয়া শক্ত গলায় বলল—না। কারুকে ডাকতে হবে না। তুমি কিছুই বোঝো না। শুধু বন্ধুর জন্য ফ্রেশ মেয়ে খুঁজে বেড়াও।

কথাটা নবীনার কাছেও হঠাৎ খুলে গেল। রিয়াজ মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল। সেই হাসির দিকে চেয়ে সহসা নবীনার মুখ কেমন কালো হয়ে যেতে যেতে করুণায় ছেয়ে যেতে লাগল। সবার কথা থেমে গেছে। মিল্লাত সবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝতে চাইছে কী হল ! বুঝতে পারছে না। সেই অসহায়তা চোখেমুখে ফুটে উঠছে। নবীনা উঠে পড়ে কিছু না বলে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। রাজিয়া বিপন্ন গলায় বলল—দোষ কী বলুন ! আমি কে ? রাধারানী না কি আয়েষা ? বলুন কে আমি ? বলুন না ? আমি কী করব ? আপনি কথা

বলছেন না কেন ?

রাজিয়া বলতে বলতে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। সেই আকৃতির সুর থেকে অন্তরের দুর্বোধ স্থানে আলো ঠিকরে পড়ে মিল্লাতের। ক্রমশ সে শিরদাঁড়ায় একটা শীতল স্রোতের ভাষা অনুভব করে। সেখান থেকে দ্রুত বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। নবীনা কেন যেন হঠাৎ ভাইয়ের দিকে ভাল করে চাইতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়। এদিকে বাগানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর রিয়াজের। বলে—যা সত্য তাই সুন্দর। তোমাদের সম্পর্কের কোথাও কালিমা নেই। আমি নবী হলে তোমাদের বিয়ে দিতাম। মুসলমানের বিয়ে কলেমাব বিয়ে নয়। অর্থাৎ মন্ত্র পড়া বিয়ে নয়। সেটা একটা সামাজিক চুক্তি। মেয়ের পূর্ণ 'এজিন' মানে সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয় না। হাজীর সঙ্গে তোমার বিয়েটা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। অবৈধ। তোমাকে বিয়ে একমাত্র মিল্লাতই করতে পারত। কিন্তু সমাজ সে কথা শুনবে না। যাও। তুমিও ওঠো। আমি একটু একলা থাকি।

রাজিয়া চুপচাপ উঠে বাড়ির ভেতর চলে আসে। সহসা তার মধ্যে আশ্চর্য পাপবোধ ক্যারমের বিভ্রান্ত স্ট্রাইকারের মতো মাথা ঠুকে ঘুরতে থাকে। মনে হয় সমস্ত বাড়ি ফিসফাস করে কানাকানি করছে। সবাই অপাঙ্গে তাকে দৃষ্টিবাণ ছুঁড়ে মারছে। জৈগুনখালা তাকে যেন গরলের দৃষ্টিস্নান করাচ্ছেন।

এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে এল নবীনা। রিয়াজকে বলল—আপনি কিন্তু কাজটা ঠিক করলেন না। রিয়াজজী! খুব অন্যায় হয়ে গেল। ওদের ঐভাবে উৎসাহ দিলেন ?

—ওরা ছেলেমানুষ নয়।

—খুব ছেলেমানুষ। ভালবাসা গেরস্তর বুদ্ধি নয়, ব্যাপারীর দরদাম নয়, খুব কাঁচা জিনিস। এখন কীভাবে ওদের ফেরাবেন ? সব পাপ আপনাকে বইতে হবে। আপনি ওদের সুস্থ করে তুলুন। আমি পায়ে পড়ি।

নবীনা ভেঙ্গে পড়ল। বলল—লোকে কী বলবে একবার ভেবেও দেখলেন না ?

রিয়াজ কথার কোন উত্তর দিল না। বলল—চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।

রাজিয়া ভোজবাড়ির অনেকেরই দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। দুটি কারণে। এক তার রূপের ঝলকের সঙ্গে গহনার উপদ্রব। দুই, সে জনৈক বিত্তবান প্রসিদ্ধ হাজীর ৪র্থ বউ। আরো একটু কুহেলি ক্রমশ যুক্ত হচ্ছিল—মেয়েটি এখন

ছেলের কাছে থাকে। মেয়ে ভাল নয়। অতএব তার আকর্ষণ দুর্বার। কিন্তু কথাটা প্রাপ্তবয়স্কর মধ্যে মৃদু ছড়িয়ে দিয়েছেন জৈগুন। সবাই জানে না এই মুহূর্তেই ক্রমশ চাউর হতে থাকবে। খানাপিনা চলছে দ্রুত লয়ে। মবিন ব্যস্ত। তবু তার চোখ দূর থেকেও রাজিয়ার রূপ-বলয় প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে দৃষ্টির জেট বিমানে নিঃশব্দে। রাজিয়া সেই দৃষ্টি লক্ষ করেছে। কারণ সে এইধারা একটি সঙ্কল্পের জন্য নিজেকে সাজিয়েছে যে, লোকটি সব অপমানের কিঞ্চিৎ জবাব গ্রহণ করুক। এই জেদকে রাজিয়া কখনও পোষ মানাতে পারেনি। এই জেদ কখনও তাকে সুখী হতে দিল না।

যে ঘরখানি রিয়াজ মিল্লাত রাজিয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, ওরা সেই ঘরেই নবীনাসহ খাওয়া-দাওয়া করে নিল। নবীনা সঙ্গে বাচ্চা আনেনি। মায়ের কাছে রেখে এসেছে। এই ঘরেও জানালায় চোখ ঘুরে যাচ্ছে, দরজায় চাপ হচ্ছে। রিয়াজ বুঝছিল, কেন ঐসব হচ্ছে। আর ওর মনে আগুন ধরে যাচ্ছিল। বিকাল হয়ে আসছে। এবার চলে যেতে হবে। খাওয়া হয়েছে। উপহার দেওয়া হয়েছে। একটু সুপুরি মুখে দিল রিয়াজ। চৌকিতে এক কোণে বসল। মিল্লাত আধো-শোয়া হয়েছে। অন্য চৌকিটা ছোট।

সেখানে নবীনা আর রাজিয়া বসে পান খাচ্ছে।

এমন মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন জৈগুন। পেছনে অনেকেই ঢুকে এল। সব মহিলা বাহিনী। তারই মধ্যে মবিনের নানীও আছেন। বয়েস হয়েছে, চোখে চশমা সত্ত্বেও ভাল দেখেন না। কানেও খাটো। হাত তছবী গুনছেন। ঢুকছেন হাজীর বউ দেখতে। কারণ সে কথা জৈগুনের মুখে শোনা যাচ্ছে। বলছেন—এই নাও, হাজীর বউ দেখবে তো, নাও চোখ ভরে দ্যাখো?

ব্যাপারটায় বোধ হয় কোথাও অপরিচ্ছন্নতা ছিল। নানীকে ঠিকমতন বোঝানো হয়নি। তিনি সহসা একটি নাটক তৈরি করে ফেললেন। রাজিয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কনের থুতনিতে হাত দিয়ে যত্ন করে ছুঁয়ে সেই হাত আপন ঠোঁটে স্পর্শ করে চুমু খেলেন। সবাই সচকিত। মিল্লাত কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। নানী বললেন—আমার মতন বয়স পাও মা। বউ খুব ভাল হয়েছে। লক্ষ্মী বউ হয়েছে। কৈ হে নাতী তুমি অমন করে হেঁদো বলদের পানা গড়া মারছ যে! পাশে এসে বসো! তোমাদের এক সঙ্গে দেখি! কোনটা আমার নাতী হে! দাড়ি-অলা, নাকি ওটা?

বাচ্চারা হি হি করে হেসে ফেলে। বড়রা হাসতে পারে না। মিল্লাত ধসমসিয়ে ওঠে। তা দেখে নানী বলেন—তাহলে তুমিই সেই পালোয়ান। নেমে

এসো, দুজনে কদমবুশি (প্রণাম) করো। আশীর্বাদ নেবে না ? ওঠো। ওঠো !

দর্শনপ্রার্থীর সকলের গলায় ধীরে ধীরে চাপা গুঞ্জন ওঠে। জৈগুন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতন স্তব্ধ ও কম্পিত। মিল্লাত উঠে বসে হতভম্ব হয়ে গেছে। নবীনা বাকরহিত। রাজিয়ার মুখ ফ্যাকাশে। জৈগুন মাকে বিরক্ত হয়ে হাত ধরে পেছনে সামান্য সরিয়ে দিয়ে বলেন—তুমি কাকে কী বলছ ? তোমায় না তখন বললাম, ওটা হাজী বিশ্বাসের বউ। বউ মানে স্ত্রী। বিশ্বাসের চার নম্বর।

বুড়ি নানী ফোকলা হেসে বললেন—বউ মানে স্ত্রী একথা কে তোমায় শিখিয়েছে ?

ও কথাটার দুটো মানে। হাজীর বউ মানে হাজীর বউ-মা। আমরা এতকাল এই রকমই বুঝতাম। ঐ হাজী হারামজাদা ছেলের বউকে নিকে করেছে, তা কী করে জানব ! এমন কচি মেয়ে যে ছেলেরই স্ত্রী হয়। বউমা হয়। চোখে সেটাই সহ্য হয়। হাজী একটা মস্ত অন্যায় করেছে। লোকটার কোন কালচার ছিল না। একটু দম নিয়ে নানী বললেন—দ্যাখো তোমরা, চেয়ে দ্যাখো ! ওদের কি মা-ছেলে মনে হচ্ছে ? মা আর ছেলে এক সঙ্গে দাঁড়ালে মা ছেলে মনে হবে, তবেই মা হল ছেলে হল ! খোদা তুমি পাপ নিও না। লোকটার আস্পদ্দাকে বলিহারি।

আমি বলব, খোদা কোথাও ভুল করেছেন। নিশ্চয় কোথাও তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছে। মেয়েমানুষ যদি টাকায় বিক্রি না হত, তবে কারো এই দশা হয় না। ক পয়সায় তোকে কিনেছিল লোকটা ? তুই নিজেই হয়েছিলি, নাকি তোকে কেউ বেচে দিয়েছিল ! হ্যাঁ রে মা। কথা ক !

আবার দম নিয়ে নানী বলেন—খোদারও ভ্রম হয় বৈকি ! নইলে যা মানায় না, তা কেন করবেন মকরাল্লাহ্। খোদার মক্কর সামলাও এখন। যা মানায়, যা স্বাভাবিক, তাই তো সুন্দর। নাকি হে দাড়ি-অলা ভাই ? কিন্তু খোদা কেন তা সহ্য করেন না ? ছিঃ ছিঃ, এ কি সর্বনাশ হয়েছে। দাও, আমায় পথ ছেড়ে দাও। আমি হাজীর বউকে আশীর্বাদ করতে পারব না। এই দেখে আমার বুকের ব্যথা আরো বেড়ে যাবে মা। ওদের চলে যেতে বলো। বুড়ি নানী ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে ওজু করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি কত নোংরা দূষিত গ্লানির পাঁক সাফ করছিলেন। আছরের নামাজে দাঁড়ালেন তিনি। ভীড় ভেঙ্গে গেল।

মবিন ব্যস্ততার মাঝেই একবার বিদায়ের সময় এক ফাঁকে বন্ধুদের সামনে দাঁড়াল। বলল—তোমরা যাচ্ছ তাহলে ! এত ঝামেলার মধ্যে কথা হয় না।

পরে একসময় তোমার কাছে যাব রিয়াজ। কথা হবে। তুইও কি চলে যাচ্ছিস মিলু?

মিল্লাত বলল—হ্যাঁ, একসঙ্গেই যাচ্ছি। এসো। রাজিয়াকে চোখের ইশারা করে মিল্লাত।

নবীনাকে বলে—কাল একবার আমার ওখানে আয়। সব কথা আলোচনা করা যাবে। কথা বলবি খুব সাবধানে। দুনিয়াটাকে আমরা সবাই চিনি না।

মবিন আশ্চর্য হল। মনে হল, বন্ধু কোনভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

ওরা বাইরে আসে। মবিন আর নবীনাও এল। বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে। সহসা রিয়াজ বলল—দাঁড়াও তোমরা। আমি একটা প্রণাম সেরে আসি। তোমরা কেউ কদমবুশি করলে না। দাড়ি-অলা ভাইটির কাছে এটি তাঁর পাওনা আছে।

রিয়াজ চোখের পলকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। আছরের নামাজ স্বল্প সময়ে পড়া হয়। নানী জায়নামাজ গুটিয়ে তুলছেন। এমন সময় পায়ের কাছে নিচু হল রিয়াজ। মুখে বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছিলেন নানী। দোয়ার ফাঁকেই কথা বললেন—তোমার নাম রিয়াজ। এভাবে দাড়ি ছাঁটলে কেন ভাই? দীর্ঘজীবন হোক তোমার। আমার কথায় রাগ করোনি তো?

—না। খুশি হয়েছি নানীমা। ছোট করে দাড়ি ছাঁটতে বাধ্য হয়েছি। সুন্নীদের কায়দায় রাখিনি। খানিকটা ফ্রেঞ্চ আর কিছুটা ঐ শিয়াদের মতন।

—কেন?

—যাতে করে মুঠোয় পাকড়ে কেউ আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে আছড়ে না মারে। হজরত আলি সৈনিকদের দাড়ি এই ধারা ছেঁটে রাখতে নির্দেশ করতেন। জানেন তো।

—জানি। কিন্তু যুদ্ধটা কোথায়?

—চারপাশে জীবনে সর্বত্র। জানি না ওদের কী হবে।

—কাদের কথা বলছ?

—রাজিয়া আর মিল্লাত।

—ওদের কী হবে বলছ কেন?

জায়নামাজখানা ঘরের কোণে রাখলেন নানী। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলন্ত নড়ন্ত ভীড়ের প্রবাহে একবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় শুধোলেন—ওদের কি ভাব হয়েছে? ওদের কোথাও পালিয়ে যেতে বলো।

—কোথায় যাবে ওরা? পালাতে বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ বলছি। মানে রস করছি। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এই ঘটনা আমার জানা। ভাব হয়ই। হবে না তা বলা যায় না। বাপ তো সুখ দিতে পারে না। বুড়ো হাড়ের যাতনাই বা সইবে কেমন করে? জোয়ান ছেলের দিকেই চোখ চলে যায়। কিন্তু ঘটনা চাপা থাকে। সবাই জানতে পারে না। যাদের ভাব হয়, তারাও ভয়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। কারো বা মনের মধ্যেই ব্যাপারটা ছটফট করে। একসময় বিয়ে-সাদী হয় ছেলেটার। তখন সেটা আর মাথা তুলতে পারে না। আমি ভাই অনেক ঘটনা জানি। কারুকে বলা যায় না। তুমিও চেপে থাকো। যাও। চলে যাও।

রিয়াজ বেরিয়ে আসে। আর দাঁড়ায় না। মিল্লাত আর রাজিয়াকে তাড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। নবীনা রাস্তা অব্দি নেমে এসে রিয়াজকে বলে—আপনি নানীকে কদমবুশি করলেন?

—করলাম।

—সেটা কিছুতেই ঠিক করলেন না।

—কেন?

—না।

—উপায় ছিল না মিসেস সাদিক। সালাম।

রিয়াজ ছুটতে শুরু করল। পেছনে বাকি দুজন এগিয়ে গেল। কিছুদূর আসার পর হঠাৎ রিয়াজ একখানা রিকশা থামিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। বলল—চললাম মিলু। চললাম ভাই রাজিয়া। তোমরা গল্প করতে করতে এসো। আমার অন্য তাড়া আছে। আজ আর আড্ডা হল না। পরে আসব একদিন। তোমরা যেও কিন্তু। চলো হে!

রিকশাঅলাকে তাগিদ দিল রিয়াজ। রিকশা ছেড়ে গেল। রাস্তায় দণ্ডায়মান দুজন পরস্পরের দিকে চেয়ে অবাক বিস্ময় প্রকাশ করল মাত্র। কথা বলল না। তারপর হেঁটে অগ্রসর হতে লাগল।

খৎনার ভোজবাড়ি রাত্রি গভীর হলে শান্ত হয়ে গিয়েছে। আত্মীয়স্বজন ফিরে গেছে। নানী শুয়েছেন মেয়ের সঙ্গে। মবিনের বাবা ঢাকায় চলে গিয়ে কোন এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেখানে তাঁর দ্বিতীয় সংসার। বছরে দুবার প্রথমা পত্নীর কাছে মেহমান হয়ে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান। মবিন বাপের উপর খুশি নয়। কিন্তু সেই অখুশির কথা বাপকে কখনও বলতে পারেনি। বাপ খুব সম্মানিত মানুষ। মবিনের ধারণা বাপ চলে না গেলে সে আরো ভালভাবে মানুষ

হতে পারত। হাতুড়ে ডাক্তারী আর ঔষধের ব্যবসায় তার সম্মান যতখানি, তা অধ্যাপকের সন্তানকে তুষ্ট করেনি। ....রাত্রি গভীর হয়েছে। বাইরে নিবিড় অন্ধকার। বিশ্বচরাচর চৈত্রের উদাসী হাওয়ায় এলোমেলো করে যাচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। মবিন বারান্দায় মাদুর ফেলে শুয়ে গিয়েছিল। খাটুনি গেছে বেশুমার। সবাই জানে, মবিনের শরীর ঘুমিয়ে পড়লে জাগবে না। ভোর রাতে খৎনা হবে ভাগ্নের। সেটা যেন বাড়ির লোকজন আর দু'চারজন আত্মীয় মিলে সেরে নেয়। ঘুমিয়ে থাকলে কেউ যেন অযথা তাকে ডাকহাঁক না করে। ডিসপেনসারীর বারান্দায় প্রতিবেশী দুজন ছোকরা আর দুজন দূরসম্পর্ক আত্মীয় বিছানা পেতেছে। ভোররাতে খৎনার সময় ওরা উঠে আসবে। হাজামও তাদের কাছে শুয়ে আছে। বাড়ি নির্জনই বলা যায়। মায়েরা তখনও গল্প করছে। একলা একটি ঘরে শুয়ে আছে নবীনা। বারান্দা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে আসে মবিন। নবীনা একখানা বই শুয়ে শুয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। উপুড় হয়ে পড়ছে। হাতের তালুতে আঙুলে বই ধরা। মবিন এসেছে দেখে বই ফেলে উঠে বসল। বলল—এসো।

মবিন চৌকিতে বসল এসে। অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়েই। শুধাল—ঘুম আসছে না?

নবীনা বলল—কৈ আসছে ঘুম। মন খারাপ করছে। ভাইয়াকে বাঁচাও। তুমি বিয়ে করো।

—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ বলছি। তুমি আমার কথা শোনো। খালাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু মা কি শুনবে?

—নিশ্চয় শুনবে। আমি তেমন করেই বলব।

—কী বলবে?

—সে তোমাকে শুনতে হবে না। আমার ভাষা আছে।

—তোমার সব ভাষা যে বোঝা যায় না নবীনা। আগে কেন বুঝিনি, তুমি আমাকে চাও।

—আমারই আপসোস মবিন, বিয়ের আগে তোমাকে বলতে পারিনি। এখন ভাবলে কষ্টই বাড়ে। তুমি সীতাহাটির ডিসপেনসারী তুলে দিলে কেন?

—দিলাম বুদ্ধি করেই। কেননা, সাদিক আমাদের সু-চোখে দেখছিল না।

—ভয় পেয়েছিলে?

—তা কিছুটা।

—এখন তো তোমার সঙ্গে ওরই ভাব আলাপ।

—আসে মাঝে মাঝে।

—কী কথা হয়?

—ভাল নয়। বাহারপুরে ওর মনের মানুষ জুটেছে।

—জানি। এই দেহের দিকে টান নেই। অথচ এই দেহ দেখেই ও একদিন পাগল হয়েছিল। আজ তো সবখানি জানা হয়ে গিয়েছে। এখন পানসে লাগে। মধুও আর মধু থাকে না। সব পুরুষই কমবেশি যৌন-চোরা।

—মেয়েরা কি নয়?

মবিন সহসা তার একখানা হাত বাড়িয়ে নবীনাকে স্পর্শ করে। নবীনা কিছু বলে না। চোখ তুলে পাশের লোকটিকে দেখে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয়। মবিন তাকে আকর্ষণ করে। নিজের দিকে। নবীনা এবার গা টেনে নেবার চেষ্টা করে বলে—জ্বালাবে না। বাইরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। সবাই জেগে আছে।

—কিন্তু আজ যে মন চাইছে তোমাকে। কতকাল পাই না।

—আমাকে তো নিজের করে চাওনি কখনও?

—চেয়েছিলাম নবীনা।

—তা হলে পেলে না কেন, সে কি শুধু আমারই দোষ?

—সে কথা থাক এখন।

—আজ তবে সব কিছুই থাক মবিন। শুয়ে পড়ো। এইভাবে চুরি করার যাতনা সইতে পারি না। কেন এমন হল?

—সাদিক তোমাকে ভালবাসেনি কখনও। শুধু সম্পত্তির লোভে ছাড়তে পারছে না।

—তোমারও কি লোভ কম?

—আমি যে ভিখিরি। শরীরের দয়া চাই। মন পেলাম না।

—মন পেয়েও তো সুখী হওনি। তাই ভিক্ষের নাম করে কষ্ট দাও। দাও। এর একটা শেষ আছে মবিন। এভাবে চলে না। তুমি বিয়ে করো।

—বেশ। তাই হবে।

—তবে হাত টেনে নাও।

তখনই আরো জোরে আকর্ষণ করে মবিন। 'আহ্' বলে মৃদু শব্দ করে নবীনা। কতখানি বিরক্ত বোঝা যায় না। বলে—রাজিয়া আমার ছোট-মা। তার সঙ্গে বিয়ে হবে। এরপর এইসব চাওয়া ঠিক না। পাপ হবে।

—বিয়ে তো হয়ে যায়নি।

—গা ছুঁয়ে বলো, বিয়ে করবে।

—বেশ। কথা দিচ্ছি। এবার এসো।

—না।

—না কেন?

—পাপ হবে।

—তা হলে চলে যেতে বলছ?

—আজ তাই বলছি মবিন। পায়ে পড়ছি তোমার।

মবিন ক্ষুব্ধ মনে উঠে চলে যায়। নবীনা তখনও বলে—লোকে বলবে, বাপ কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া। নিন্দে করবে সকলে। ভাইয়া যে পাগল হয়ে গিয়েছে।

মবিনের ঘুম আসে না। মায়ের ঘরের জানালায় এসে বলে—আমি ছাতে যাচ্ছি। আমায় ডেকো না।

গল্প থামিয়ে জৈগুন বলেন—রাতে ঠাণ্ডা লাগবে। একখানা চাদর নিয়ে যেও। নবীনা সেই শব্দ শুনতে পায়। কিছুক্ষণ পর নবীনাও ছাতে উঠে আসে। মবিনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে। ওরা সংলগ্ন হয়ে যায়। মিলনের মুহূর্তে ওদের কথা হয় নিম্নরূপ:

ন। আজই শেষ। আর কোনদিন নয়।

ম। ওদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে শীগগিরই। নইলে বদনাম। তখন মাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না।

ন। সে ব্যবস্থা আমিই করব।

ম। সাদিক বাহারপুরেই বিয়ে করছে।

ন। তোমায় আর কখনও পাব না।

ম। জয়েদ রাজিয়ার ওপর রিভেঞ্জ নিতে চাইছে।

ন। তুমি বিয়ে করলে মেয়েটার জীবনটা বাঁচে। ভাইয়াও সুস্থ হয়।

ম। আমরাও কি এখন সুস্থ নবীনা। হাঃ হাঃ!

ন। চুপ করো। হেসো না। শুনতে পাবে। পাপের কথা গাইলে পাপ আরো বেড়ে যায়।

ম। সাদিক বুঝি পাপী নয়?

ন। আমি আর ভাবতে পারছি না।

ম। রাজিয়া কিন্তু সত্যিই সুন্দরী।

ন। আমার চেয়েও ওর শরীর বেশি নরম। বিয়ে করবে তো?

ম। হুঁ। চুপ করো।

মবিন নবীনার শরীরে রাজিয়াকে সোহাগ করতে থাকে। রাজিয়ার বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। নবীনার দেহ অন্ধকারে কোথায় ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। নবীনা বুঝতে পারে না। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে নামতে থাকে। অন্ধকার রাত্রির পেটে হাওয়া দাপিয়ে বেড়ায়।

নবীনা একসময় নিচে নেমে আসে। রাত আরো বেড়ে গেছে। জৈগুন ঘুমে সম্পূর্ণ লিপ্ত। নানী বয়সজনিত কারণে ঘুমোতে পারছেন না। হঠাৎ তিনি কান পেতে বোঝার চেষ্টা করেন, কেউ কোথাও কাঁদছে যেন! ফুঁপিয়ে কাঁদছে কিছুক্ষণ। চুপচাপ সেই কান্না—কান্না কিনা বুঝতে চেষ্টা করেন। তারপর উঠে পড়েন। নবীনার ঘরে এসে দেখেন ঘরের দরজা সামান্য ফাঁকমতন, দুয়ার আঁটা নেই। সেই ফাঁকে অন্ধকারে তাঁর হাত পড়ে। ভেতরে ঢুকে পড়েন। আলো জ্বেলে দেখেন, কাত হয়ে শুয়ে নবীনা ফুলে ফুলে কাঁদছে। গায়ে হাত দিয়ে নাম ধরে ডাকতেই নবীনা জেগে ওঠে বসে। আঁচলে চোখ মুছতে থাকে। নানী পাশে বসে গায়ে হাত রেখে বলেন—কাঁদিস নে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

নবীনা কান্নার আবেগ দমন করতে করতে বলে—আমরা বড় পাপ করেছি নানী। বড় পাপ করেছি। আব্বাজী আমাদের রক্তে অনেক দোষ রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের যত অনাচার আমাদের জীবনভর দুষবে।

নানী সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—এভাবে ভাবতে নেই পাগলী। শান্ত হ। আমি দেখছি। কী করা যায়। না হয় নাতীর সঙ্গেই হাজীর বউয়ের নিকে হবে। আমি দায়িত্ব নিলাম।

—ঠিক, কথা দিচ্ছ আমাকে? নবীনা কান্নার গমকের দোলায় শুধিয়ে ওঠে। নানী নবীনার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলেন—জীবনটা যে পাপ থেকেই সৃষ্টি মা। পাপ কিছু নয়। এখন ঘুমো।

নবীনা ফের শুয়ে পড়ে। নানী আলো নিভিয়ে চলে যান। নবীনা সব পাপের কথা নানীকে বলতে পারল না। বললেও নানী বুঝবেন না। বলা তো যায় না খুলে। বুকের ভিতর এক আশ্চর্য তুফান বইছে।

॥ এগারো ॥

আশ্চর্য তুফান বইছে। রিয়াজের মনে হচ্ছিল ঝড় উঠছে। বড় অদ্ভুত একটা ঘটনার সামনে দাঁড়াতে হল আজ।

রঁদার কিছু ভাস্কর্য আলোকচিত্র করে একখানি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। দুজন তরুণ ভাস্কর্য-শিল্পী প্রবন্ধ দুটি লিখেছেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করছিল রিয়াজ। আলোকচিত্রগুলি নিরীক্ষণ করছিল। সব মূর্তিই নগ্ন। কিন্তু কোথাও দুই চোখকে পীড়িত বা প্রতিহত করে না। প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে এই নগ্নতার শক্তি সৌন্দর্যগত। নগ্নতাই সুন্দর। নগ্নতাই শক্তিশালী। সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান করেছে নগ্নতার বিশুদ্ধ চেতনা। শিল্পী চেতনা। রঁদার দেশের মানুষ একদিন এই চেতনা-স্তরে নিজেদের তুলে আনতে না পারায় শিল্পীকে নিন্দা ও তিরস্কার করেছে। শিল্পীর প্রদর্শনী অবধি বন্ধ করে দিয়েছে। রিয়াজ ভাবছিল, সৌন্দর্যের ধারণা কী অদ্ভুতভাবে বদলে যায়। অজন্তা ইলোরা খাজুরাহোর নগ্ন মূর্তির মিথুন ভাস্কর্য যে সৌন্দর্যবোধ জাগায়, তার নিন্দা করার মানুষ আজ বড় একটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু সৌন্দর্যের তরফে কথাটা যারা পত্রিকা আর বই লিখে প্রচার করেন, তাঁরা মস্ত আহাম্মক। হয় তাঁরা নিতান্ত হিন্দু নয়, নয় মুসলমান কাফের। মুসলমান, ধর্মেই হোক আর শিল্প-সৌন্দর্যেই হোক, সর্বত্রই মূর্তিবিরোধী। হজরত মহম্মদের কোন মূর্তি পৃথিবীতে নেই। আল্লার নূরে নবী পয়দা। পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্যের অর্ধেক কি বারো আনাই খোদা নবীর সৌন্দর্য রচনায় খরচ করেন। বাকি সিকি ভাগ দিয়ে দুনিয়ায় অবশিষ্ট সৌন্দর্য তৈরি। রঁদার সৌন্দর্য তারই অন্তর্গত। নবীর মূর্তি নেই। রূপের সবচেয়ে আকুল সৌন্দর্যও বিগ্রহ ধারণ করেনি। বাকি যা রইল সেদিকে চেয়ে দেখার সামান্য তাগিদ তাহলে মুসলমান পাবে কোথায়? রঁদার নগ্নতার সৌন্দর্য তো কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু রিয়াজ সেই নগ্নতার শক্তি আর আকুলতা দেখতে পাচ্ছে। যেমন দেখতে পাচ্ছে মিল্লাত আর রাজিয়ার প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্যের বিহার। রঁদার নগ্নতা দূষিত। রাজিয়ার প্রেমও তেমনি দূষিত। রঁদার মূর্তির মতোই এই প্রেমকে মুসলমান অন্ধকারে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চাইবে। একে প্রকাশ্য পথের উপর কোনদিনই প্রতিষ্ঠা দিতে চাইবে না। রঁদার দেশের মানুষ একদিন চৈতন্যবশত রঁদার সৌন্দর্য চিনতে পেরেছিল, কিন্তু মিল্লাত রাজিয়ার প্রেম যে সত্যিই সুন্দর এবং সুন্দর বলেই তার প্রতিষ্ঠা দেওয়া দরকার, সে কথা কখনও কেউ ভেবেও কি দেখবে না?

নিসার হোসেন যা ঘটিয়ে গিয়েছেন তা যে কোন বিচারেই সুন্দর ছিল না, একথা তীব্র ভাবে বোঝা না গেলে, এই দুই মানব মানবীর প্রেমে সৌন্দর্য আবিষ্কার করাই যায় না। মনে হয়, ছিঃ ছিঃ! এই উলঙ্গ প্রেম হটাও, লুকিয়ে রাখো, ফেলে দাও, কবরে পুঁতে ফেলো।

কিন্তু নানী এই নগ্ন প্রেমের সৌন্দর্য দেখেছেন। তাঁর বিচারতত্ত্ব বড় বিস্ময়কর। মা আর ছেলেকে পাশাপাশি রেখে দেখতে হবে, তারা মা-ছেলে কিনা। স্বামী আর স্ত্রীর বেলাতেও সেই একই বিচার। হিন্দুরা এই বিচার করেছে রামমোহনের যুগে। আশি বছরের বৃদ্ধের পাশে চৌদ্দ বছরের কিশোরীকে যখন পত্নীরূপে দেখতে গিয়ে ভয়ানক অসুন্দর মনে হল, সেদিনই সতীদাহের বর্বরতায় প্রথম আঘাত পড়ল। সৌন্দর্যের ধারণা বদলে যেতে থাকল। সৌন্দর্যগত এই বিপ্লব ছাড়া দুনিয়া বদলায় না। বাল্যবিবাহ ঘুচলেই চলে না, সৌন্দর্যের প্রহার করে বিধবার মনে যে তৃষ্ণা চাপা পড়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলে রমা রমেশের কাহিনী লিখতে হয়। বলতে হয়, ইহাই সুন্দর। নানীর এই বিচারতত্ত্ব মুসলমান সহ্য করতেই শেখেনি। নইলে মবিন রাজিয়ার প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে পেত। ভয় পেত না। লুকিয়ে রাখাই শুধু নয়, দরকার হলে ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দিত না।

রিয়াজ ভাবল, মবিনকে কী করে বোঝানো যায়, শুধু খালাস বা তালাক হয়নি বলেই রাজিয়া কারো মা হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়লেই তা সুন্দর লাগে না। বরং তা ভয়ানক কুৎসিত। কী করে এ কথা বোঝানো যায় আর পাঁচজনকে?

রিয়াজ গতকালই মবিনের নেমন্তন্ন থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার পর শহরের বিখ্যাত মৌলবী আকবরজীর সঙ্গে দেখা করে। তাঁর কাছে সে একটি মছলা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিল। শুধু মছলা সংগ্রহই তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজিয়া-মিল্লাতের ঘটনা আকবরজীর মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটায় সেটা অনুধাবন করা। রিয়াজ রাজিয়া বা মিল্লাতের নাম চেপে রেখে বর্তমান ঘটনার একটি কাল্পনিক রূপ আকবরজীর সামনে বানিয়ে বলেছিল। ঘটনা শুনে আকবরজী প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর চিন্তা করে নিয়ে বললেন—আপনি কী আপনার পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিতে চাইছেন?

রিয়াজ বলেছিল—ধরুন কতকটা সেই ধারা অভিপ্রায় আমরা যদি পোষণ করি, তাহলে তার কিনারা কোথায়?

মৌলবী নিঃশব্দ হাসিতে ঠোঁটের রেখা পূর্ণ করে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—দেখুন, আপাতত কোন কিনারা আমি দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটি যদি

স্বামীর কাছে তালাক হয়ে যেত তাহলে বোধ হয় কিছুটা ভাববার অবকাশ ছিল। বোধ হয় বলছি এ কারণে যে ওরা যে স্বামী-স্ত্রী ছিল, সেটা সমাজ মেনে নিয়েছে, যৌন সম্পর্ক হয়েছে কি হয়নি সেটা তারা দেখতে চাইবে না। বাস্তব অবস্থাটা আপনাকে ভাবতে হবে। যেহেতু এখানে একটা রুচির প্রশ্নই খালি উঠবে না, অধিকারের প্রশ্নও উঠে যাবে। লোকে বলবে, বাপের বউকে কি বিয়ে করা যায়? বরং বিয়ের পর পরই যদি তালাক হয়ে যেত, তখন মানুষেরই মনে হত, ওদের সম্পর্কই হয়নি, ছাড়াছাড়ি হয়েছে ইত্যাদি এবং ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তো আগেই ছিল, অতএব, বিয়ে হয়েছে, বড় অঘটন বটে, তথাপি কী আর করা যায়। আমার মনে হচ্ছে, বাস্তবে এইভাবে জিনিসটা মানিয়ে যেতে পারত। অবশ্য রুচির নিন্দা তাতে ক্ষান্ত হত এমন বলা যায় না। তবু একটা জলচল মতন হতে পারত। কিন্তু এখন যদি এইসব ঘটে যায় তবে আপনারা বয়কট হয়ে পড়বেন। আপনার পাত্রপাত্রী সুখী হবে না।

রিয়াজ মনে মনে রেগে উঠলেও শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু ওদের তো কোন যৌন সম্পর্কই হয়নি। এটার কি তা হলে কোন গুরুত্বই নেই?

মৌলবী আবার হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, গুরুত্ব অবশ্যই আছে। ঠিক এই ঘটনার হাদীস কি আমার জানা নেই। যদ্দূর ধারণা এই ঘটনার পক্ষে হাদীস থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বল বা মৌজু হাদীসই হবে। কারণটা ফেকায় খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। ফেকাহ এক্ষেত্রে খুব স্ট্রং বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সেটা আমি পরে বলছি। তার আগে যৌন সম্পর্কর ব্যাপারে একটা ছোট হাদীস বলি। শুনুন।

আকবর একটু দম নিয়ে বললেন—তিরমিজী শরিফে ওমর বিন শোয়াইব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যদি কোন লোক কোন নারীকে বিবাহ করে তার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তার কন্যাকে বিবাহ করা তার পক্ষে বৈধ নয়। যদি সঙ্গম না করে থাকে তবে (তার পূর্ব পক্ষের) কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। এখানে লক্ষ করুন, যৌন সম্পর্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই বলছিলুম, গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। কিন্তু ওমর বিন শোয়াইবের (রাঃ) বর্ণনার বাকি অংশ আরো লক্ষণীয়। তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, বিবাহিত নারীর সঙ্গে সঙ্গম হউক বা না হউক, তার মাকে (শাশুড়ীকে) যেন সে বিবাহ না করে। নবীর বিবাহনীতির কঠোরতা এখানেই। মা বা মাতৃস্থানীয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবার জো রাখেননি তিনি। আপনার এই জিনিস প্রাক্-ইসলাম যুগে নিশ্চয়ই ঘটত আকছার। সেখান থেকে সমাজটাকে উপরে ঠেলে তুলতে গিয়ে তাঁকে খুব কঠোর হতে হয়েছিল। আপনি

খুব বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে খুব ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলা দরকার, আর পাঁচজন অশিক্ষিত মৌলবীর মতন আমি তেড়েফুঁড়ে উঠতে পারি না। তাই না? শুনুন তা হলে। আবার দম নিলেন মৌলবী। বললেন—ফেকায় এক জায়গায় বলা হচ্ছে, কামপরবশ হয়ে যে স্ত্রীর গোপন অঙ্গে দৃষ্টি করা হয়েছে তার মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, দৌহিত্রী, কাউকেই বিয়ে করা চলবে না। তারা প্রত্যেকে অবৈধ। বুঝুন, কামপরবশ হয়ে কোন নারীকে দেখলে, বাপ যখন তা দেখছে তখন তার দিকে সন্তান এই অবস্থায় দৃষ্টি দেয় কী করে? যৌন সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু বাপের দৃষ্টিটা কেমন ছিল, এক্ষেত্রে সেটাও বিচার্য। মুসলমান এই জায়গা থেকেই সবটুকু বিচার করতে চায়। অতএব আপনাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আপনি বিপদে পড়বেন।

রিয়াজ গম্ভীর হয়ে চুপচাপ কিয়ৎক্ষণ বসে থেকে বলল, ঠিক আছে। আজ উঠি। কাল সকালে আসব। আপনি ফেকাহ্ হাদীস থেকে বিয়ের নির্দেশগুলো টুকে রাখবেন একটা কাগজে। আমি নিয়ে যাব। আমার উ৷কার হয়।

আকবর বললেন, বেশ, রাখব। কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ছেলেমেয়ে দুটির জন্য আপনার দরদ হচ্ছে, কিন্তু ঐ বুড়ো বাপটির জন্য হচ্ছে না কেন? হাদীস ফেকার কঠোর নির্দেশ জানা থাকলে আপনি এত উতলা হতে পারতেন না। আমার এক বৃদ্ধ বন্ধুর জীবনে এই প্রকার একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি চারবারের বেলা এক শিক্ষিতা সুন্দরীকে সাদী করে ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলেন। ঠিক এই ধরনেরই হয়েছিল। মেয়েটি তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই কষ্ট তিনি মৃত্যু অব্দি ভুলতে পারেননি। আমার কাছে এসে প্রায়ই দুঃখ করতেন।

রিয়াজ শুধাল—অকে আপনি কী বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

রিয়াজের স্বর একটু বেঁকে যায়। আকবরজী বলেন—না। আমি তাঁকে কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করিনি। কারণ তিনিই হজরত আয়েষার সঙ্গে নবীর প্রণয়ের বাখান জুড়ে দিয়ে চোখের পানি ফেলতেন। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন রিয়াজ সাহেব! বিয়ের পর নবীকে জানুর ওপর মাথা রেখে শুইয়ে নিয়ে আয়েষা গল্প করতে করতে নবীর দাড়িতে বিলি দিতে দিতে উনিশটা পাকা দাড়ি গুণে বার করেন। সেই বৃদ্ধ নবীর সঙ্গে তিনি ৯ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত দৌড়তেন, খেলা করতেন। হজরত আয়েষার মতন বিদুষী সেকালে আরব ঢুঁড়ে পাওয়া যেত না। কিন্তু তাঁদের ঐ খেলাধুলার ভালবাসা কি কম সুন্দর ভাই। ভাবলে চোখে জল ভরে আসে। নিসার হোসেনও তো কম বিদ্বান ছিলেন না। আবার

বন্ধু নিসার সীতাহাটির বিখ্যাত মানুষ···· । চমকে উঠল রিয়াজ । সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—তাহলে আসি মৌলবী সাহেব । কাল ফের····

—হ্যাঁ, আসুন । আছছালামো আলাইকুম ।

রিয়াজ কোনমতে উচ্চারণ করল—ওয়ালেকুম আসসালাম ।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল রিয়াজ । পেছন থেকে শুনতে পেল আকবরজী বলছেন— একটি কচি কিশোরী চঞ্চল পাখির মতন বৃদ্ধের চোখের সামনে খেলা করে ফিরছে, সেই উদ্দীপনা কি তুচ্ছ হতে পারে ? বয়স নিয়ে টানাটানি করছেন, কিন্তু বেহেশতে গিয়ে সেই বুড়োই তো বাইশ বছরের যুবা হবে, সেই যৌবনই তো অনন্ত ভাই রে ! হজরত আয়েষা সেই কথা জানতেন বলেই নবীকে ভালবাসতে পেরেছিলেন । আজকের মেয়েরা·······

আকবরজীর কথা রিয়াজ পথে বাঁক নিতেই দেওয়ালের আড়ালে পড়ে যায় । রিয়াজ আর শুনতে পায় না । হনহনিয়ে হেঁটে চলে ।

আজ ভোর আটটার দিকে আকবরজীর গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল রিয়াজ । তারপরই ভূত দেখার মতন চমকে উঠেছিল । কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে বাড়ি থেকে মবিন বেরিয়ে আসছে । মৌলবী ওকে পিছু পিছু এসে বিদায় দিচ্ছেন । ঐ দৃশ্য দেখেই রিয়াজ দ্রুত আড়ালে সরে আসে । উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসতে থাকে । ওরা রিয়াজকে দেখতে পায়নি ।

রিয়াজ রঁদার ভাস্কর্য, পাতা উল্টে পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে ভাবতে থাকে, কী দেখলাম ? কী দেখলাম আজ সকালবেলা ? আকবরজীর সঙ্গে মবিনের সম্পর্ক কী ? কতদিনের ? কেন এসেছিল মবিন ?

বাথরুমে নবীনা স্নান করছে । ভোরবেলায় মবিন স্নান করে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে চলে গেছে বাড়ির কেউ জানে না । নবীনাকেও কোন কথা বলে যায়নি । নবীনা ভোরের দিকেও অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল । ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুম এসেছে মনে করতে পারে না । এখন তাবৎ দেহের যন্ত্রণা পীড়িত অস্বস্তি ধুয়ে ফেলতে চায় সে । যন্ত্রণা ধুয়ে কখনও শেষ হয় না । তবু যন্ত্রণা ধুযে ফেলতে হয় । স্নান করতে করতে দেহের সর্বত্র হাত বুলোতে বুলোতে স্নান-সিক্ত নবীনার চোখে সহসা চমকিত অশ্রু ভরে যায় । স্নান শেষে বাথরুমে পোশাক বদলে বাইরে আসে । চোখে মুখে স্নিগ্ধ বিষণ্নতা । এগারোটা বেজে গেছে । দেরি হয়ে গেল । ভাবতে ভাবতে নবীনা খেয়ে নেয় । কারু সঙ্গেই মনোযোগী হয়ে কথা বলতে পারে না । খেয়ে উঠেছে এমন সময় মবিন ফিরে আসে । বলে—তুমি কি তাহলে চলে যাচ্ছ ?

মবিন বলে—মিল্লাতকে এখন কী বলবে ভাবছ ?

নবীনা শুধায়—বলো কী বলতে হবে ?

মবিন বলে—সেটা তুমিই ঠিক করো। আমার কথা হচ্ছে, ওদের আর একসঙ্গে থাকা ঠিক না। কিছুতেই উচিত হবে না।

—বলব।

—দরকার হলে আমার কাছেই এসে থাক মিলু।

—হ্যাঁ।

অন্যমনস্ক হয়ে সমর্থন করে নবীনা। বলে—দলিলে কার কী অংশ, সেটা আমরা ভাইবোনেরা এখনও হিসেব করিনি। সমাজ করে দলিল দেখাদেখি হবে। কবে হবে বুঝতে পারছি না। আব্বা মরে গিয়েছে, এখন ভাগ বাটোয়ারা হবে। তিন মা তিনদিকে ছড়িয়ে যাবে। একসঙ্গে থাকবার আর কোন ধৈর্য কারো নেই। সব দলিল দস্তাবেজ, যদি কোন উইল থাকে, তবে সেই উইল, একটা বড় মতন কাঠের সিন্দুকে তালা-বন্দী হয়ে রয়েছে। চাবি আছে বড় ভাইয়ের কাছে। ভাই চাইছে, আমরা আরো কিছুদিন একসঙ্গে থাকি। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

মবিন বলল—তা হলে বলছ, মিলু হয়ত মাঠান-সম্পত্তির কিছু ভাগ পেতেও পারে ?

নবীনা বলল—জানি না আব্বা কী উইল করেছে। ভাইয়া যদি কিছুই না পায়, তবে ও দাঁড়াবে কোথায় ? আশা হচ্ছে, হয়ত আব্বা কিছু দিয়ে গিয়ে থাকবে, কারণ সত্যি বলতে তার চেয়ে বঞ্চিত আর কেউ হয়নি। যদি জমি কিছু পায়, সেটা বেচে দিয়ে শহরে মাটি কিনতে পারে। বাড়ি করতে পারে।

—তা হলে সিন্দুক খোলাই তো উচিত।

—ভাবছি বড়ভাইকে সেই কথাই বলতে হবে। তার আগে তুমি বিয়ে করে ফেলো। কিন্তু তার আগেই ভাইয়াকে ঐ বাড়ি থেকে আমি চলে যাবার জন্য বলতে পারব না। ঐ বাড়িটার ওপর ওর খুব মায়া। ভাববে, আমরা ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নবীনা আর কোন কথা না বলে আয়নায় নিজেকে ফলিত করে তৈরি হয়। কাপড়চোপড় গুছিয়ে নেয়। চামড়ার বাক্স গুছিয়ে নিয়ে তালা লাগায়। মবিন সব চেয়ে দেখতে দেখতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলে—একটা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়লে তোমায় যে কথা দিলাম, তার কী হবে ? আমি মিথ্যাবাদী হব। আমার ভয় সেখানেই। নইলে এত নিষ্ঠুর আমিও নই।

বাক্স হাতে তুলে নেয় নবীনা। বলে—আমায় একটা রিকশা ডেকে দাও।

মবিন নবীনার হাত থেকে বাক্সটা নেয়। বলে—চলো, তুলে দিচ্ছি। মায়েদের বলে এসো চলে যাচ্ছো। আমি রিকশা ডাকি।

মবিন বাক্স হাতে বাইরে চলে যায়। নবীনা নানী ও জৈগুনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলে—মবিন রাজী হয়েছে, এইবেলা। তৎপর হোন খালামা। পরে যদি হঠাৎ মন ঘুরে যায়, সিধে করতে পারবেন না। ভেবে দেখে একখানা চিঠি লিখে আমাকে বলবেন। আমি ছোট মাকে রাজী করাবো। একবার ওর ওখান হয়েই যাচ্ছি। ভরসা দিলে আমি কিছুটা কথা বলে রাখব।

নানী বললেন—সেই ভাল জৈগুন। ও গিয়ে কথা বলে যাক। পুরুষের মন বলা তো যায় না।

জৈগুন বললেন—আমায় দু দিন সময় দে নবীনা। ভেবে দেখি।

নানী বললেন—এতে এত ভাববার কী আছে ? ও মেয়ে নষ্ট নয়। খারাপ মেয়ের চোখেমুখে ছাপ থাকে।

—ওর ভালমন্দ কি তোমার কাছে শিখব মা ? আমি বলছি, মিলুর সাথে ঐ মেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নানী দুঃখিত গলায় বললেন—মুখে লাগাম দিয়ে কথা বল জৈগুন। পাপে পুড়ে মরবি। নানীর চোখমুখ শাসিয়ে উঠল। মায়ের এই মূর্তি দেখে জৈগুন চুপ করে উঠে উঠোনে নেমে কী যেন খুঁজতে শুরু করলেন। নবীনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে বাইরে চলে এল। নানী পিছু পিছু ওকে এগিয়ে দিতে এসে বললেন, বিয়ে তোকে দিতেই হবে নবীনা। দোমনা করিস না।

নবীনা অন্যমনস্ক সুরে বলল—ছোট মা জীবনে সুখ পায়নি নানী। খালার হাতে পড়ে যদি স্বস্তিটুকুও চলে যায় !

নানী বললেন—সুখ তো স্বামীর কাছে মা !

নবীনা রিকশায় উঠল। মবিনকে বলল—রাজিয়া যদি ভাইয়াকে তাড়িয়ে দেয় তবেই আমরা বাঁচি। আমি ভাইয়াকে আঘাত দিতে পারি না মবিন।

মবিন বলল—রাজিয়া যে তাড়িয়ে দিতে চাইবে না। কিন্তু বুদ্ধি থাকলে উপায় হয় ; তুমি সেটা ভেবো। আমি তোমার ওপর দায়িত্ব দিলাম। ভালবাসার শপথ, আমি তোমার জন্য রাজী হচ্ছি। নবীনা ম্লান হেসে বলল—ভালবাসা বস্তুটা আমি কখনও চিনতে পারিনি মবিন। সেটা ভারি মিছে কথা। রিকশা চলতে শুরু করল। নবীনা রাজিয়ার বাড়ির সামনে এসে রিকশা থামায়। কিন্তু নামতে পারে না। রিকশাঅলাকে বলে, চলো।

বাস স্ট্যাণ্ডে রিকশা আসে। সেখানেও না নেমে নবীনা ফের রিকশা ঘুরিয়ে

রাজিয়ার বাড়ির কাছে এসে ফের বলে—লাইব্রেরি যাব একটু। চলো সোজা।

রিকশাঅলা আশ্চর্য হয়। নবীনা লাইব্রেরি এসে ঘড়িতে চেয়ে দেখে দুটো বাজেনি। অনেক দেরি। ১২টা বেজে ১৩ মিনিট হয়েছে। এততা সময় কীভাবে কাটবে। রিকশা ছেড়ে দিয়েছে। এমন সময় চারজন লোককে সে একসঙ্গে লাইব্রেরির দিকে গেট পেরিয়ে ঢুকতে দেখে। বুঝতে পারে, লাইব্রেরি আজ আগেই খুলে গিয়েছে।

রিয়াজ রঁদার পত্রিকাখানা ফের খুলল। উল্লেখিত চারজন যুবকের জন্যই সে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছিল। নবীনা আসবে ভাবতে পারেনি।

ঐ চারজন যুবকের পিছু পিছু নবীনাও দোতলায় উঠে এল। রিয়াজ চোখ তুলে ওদের চারজনের পেছনে নবীনাকে দেখতে পায়। চোখের ইশারায় চার যুবককে বসতে বলে। নবীনাকে চেয়ে দেখে চোখমুখের বিষণ্ণতা লক্ষ করে। বলে—আসুন। খুব ভাল সময়ে এসে পড়েছেন। আমি ওদের জরুরি আলোচনার জন্য ডেকেছি। আপনিও কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করবেন। বসুন। ডানদিকের ঐ চেয়ারটায় আরাম করে বসে পড়ুন। আমার কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন।

নবীনা চেয়ারে ইতস্তত করেও বসে যায়। বলে—তার আগে আমার কিছু কথা ছিল যে! আমি খুব উদ্বিগ্ন রিয়াজজী!

রিয়াজ বলে—আমি সে কথা জানি। কিন্তু আমারও উদ্বেগ কম নয়। তোমরা বসো। এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ওরা রিয়াজের সামনের টানা বেঞ্চে ধীরে ধীরে বসতে থাকে। কোন কথা বলে না। প্রত্যেক যুবকের চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। বোঝা যায় লেখাপড়া করেছে। রিয়াজের ঘনিষ্ঠ। নবীনা ফের কথা বলে। উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠস্বর—সারা রাত ঘুম হয়নি। আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন। মবিন বিয়েতে রাজী হয়েছে।

রিয়াজ শুধায়—আমি ওদের কী করে বোঝাবো, কী করতে হবে? মবিন রাজী হয়েছে, সে কথা বলতে হবে? কিন্তু মবিন রাজী কি রাজী নয়, তাতে রাজিয়ার কী এসে যায়?

নবীনা বিস্ময়-চকিত সুরে বলে—এসব কী বলছেন আপনি? আপনার উচিত ছোটমাকে ভাল করে বোঝানো। পাগলামী করলেই কি ওর ভাল হবে? নিতান্ত ছেলেমানুষী না করে জীবনটাকে সহজ করা দরকার। এটা একটা পারভারসন।

লোকে বলবে। মন বিকল হয়ে গিয়েছে।

—আ রে বাপ্। আপনি দেখছি.....না.....কীই বা বলব, মনে কিছু করবেন না, ক্ষমা করবেন, ওদের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে যেরকম চর্চা আমরা শুরু করেছি, তাতে মনে হচ্ছে তাবৎ মুসলমান জাতটাই পারভারটেড। খানাবাড়িতে হরদম গুজগুজ ফুসফুস। জৈগুনখালা পারেন না যে একটা মাইক নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েন, সবই তো লক্ষ করেছি মিসেস সাদিক। পারভারসন কথাটি কি মবিন আপনাকে শিখিয়েছে ? ডোণ্ট মাইণ্ড, আমার ধারণা, এরকম ইংরেজী আপনি তৈরি করতে পারেন না। নবীনার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। কথা ফুটতে চায় না। নিচু সুরে বলে—লেখাপড়া জানি না বলেই কি ইংরেজী বলতে পারি না রিয়াজজী ?

রিয়াজ বলে—এভাবে কথাটাকে 'মিন' করছেন কেন ? পারভারসন বলতে কী বোঝাতে চান আপনারা ? বিকৃতি ? বিকার ? মবিন যদি এই মেক-আপ-এ কথা বলে থাকে, তাহলে তাবৎ জাতটাকেই সে অত্যন্ত ছোট করে দিয়েছে। আপনি নিজে বলুন, এটা কি পারভারসন?

নবীনা বলল—জানি না। আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতেও পারছি না, জিনিসটা খুব ভাল হচ্ছে। ইংরেজী শব্দটা মবিনই বলেছে বটে, কিন্তু কথাটা কি লোকে একেবারেই উড়িয়ে দেবে মনে করছেন ?

রিয়াজ বলে—না। মনে করছি না। বরং মনে করছি, কথাটা লোকে সমর্থন করবে, করতে শুরু করেছে। গতকাল মৌলবী আকবরজীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি তার কণ্ঠস্বর আপনার মতন সফস্টিকেটেড না হলেও একই গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোন সুন্দর সম্পর্ককে এভাবে দুর্গন্ধযুক্ত করছি আমরা। কেন করছি ? এর জন্য দায়ী কে ? ওদের দুজনকে এমন করে ফাঁদে ফেলেছে কারা ? আমি ওদের উৎসাহ দিচ্ছি বলে আপনি অভিযোগ করছিলেন। কেন করলেন ? যারা মা-ছেলে নয়, তাদের মা-ছেলে সাজানোর ছদ্মবেশ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সমাজ দিয়েছে। আমি বলছি, এই নোংরা অশ্লীল পোশাকটা ওরা খুলে ফেলুক, আপত্তি কেন করছেন ? এটা কি **পারভারসন**? আমি মনে করি সুন্দরকে সুন্দর বলতে না পারাটাই **পারভারসন**। ভালকে কুৎসিত বানানোই **পারভারসন**। এর জন্য রাজিয়া বা মিল্লাত দায়ী নয়। আমি কাকে বোঝাবো এ কথা, কে বুঝবে ?

রিয়াজের কণ্ঠস্বর হাহাকার করে উঠল। নবীনা মাথা নিচু করল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে নবীনা বলল, মবিন বিয়ে করতে চাইছে, কথাটা কেন যে

আপনি পছন্দ করছেন না, মাথায় ঢুকছে না। সবই বুঝলাম। প্রেম বস্তুটাকে আপনি বড় ভালবাসেন। কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া মুখের কথা নয় রিয়াজজী। মাফ করবেন। আপনার পাগলামী দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটাকে নিয়ে গোল টেবিল করা আমি **পারভারসনই** বলব। বলব এইজন্য যে, আপনার কথা সমাজ শুনবে না। পাঁচটা বন্ধুবান্ধবকে জড়ো করে কী করতে চান আপনি? রাজিয়াকে রক্ষা করাই যেখানে কর্তব্য, সেখানে এই প্রেম বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। চারজন যুবক চমকে উঠল। নড়েচড়ে বসল। রিয়া'জ থম মেরে চুপচাপ কিছুক্ষণ কথাই বলল না। পরে আস্তে করে ঠাণ্ডা সুরে কথা বলে উঠল, বেশ তাই হোক। কর্তব্যই হোক। কিন্তু আমার কথাগুলি আপনি বুঝলেন না। রাজিয়াকে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে চায় সে কেন মিল্লাত রাজিয়ার সম্পর্কের মধ্যে নোংরামির খোঁজ করে? আমার রুচির অপমান ঠিক এই স্থলে মিসেস সাদিক। আমি অপমানিত। প্রথমে ভেবেছিলাম, মবিন বিয়ে করলে তো খুব ভালই হয়। আমি নিজেই সেই প্রস্তাব তুলেছি। কিন্তু যখন সে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাজিয়া মিল্লাতের চলাফেরার নিন্দা শুরু করল, তখনই বুঝেছি মবিন আজীবন রাজিয়াকে সন্দেহ করবে, নিগ্রহ করবে। আমরা এই বিয়েকে সমর্থন করে বড়জোর রাজিয়ার মৃত্যুর ব্যবস্থা পাকা করতে পারি। এ কথা রাজিয়াও জানে। বরং রাজিয়া না জানলে তাকে কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

নবীনা বলল—না। ভুল করলেন। মবিন নিন্দা করে ভুল করেনি। কারণ বিয়েটা আপনি করছেন না। করছে মবিন। দায়িত্ব তার। সমাজকে সে ভয় পায়। ভয় পাওয়াটা অন্যায় নয়। অহেতুকও নয়। এক্ষেত্রে তারও মনের অবস্থাটা বোঝা দরকার। কারণ জৈগুন খালা সম্পত্তির লোভে রাজী হচ্ছেন, কোন দয়া করে নয়। যত দয়া মবিনেরই, যত আপদ তার। কোন হঠকারিতা করে তো লাভ নেই। ভেবে দেখুন, ভালবাসার কারণেই ভাইয়া আর ছোট মায়ের দূরে সরে যাওয়া উচিত কি না। আমি উঠলাম। আশা করি আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন। আমি যাচ্ছি।

নবীনা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে এল। সিঁড়ি ভেঙে চলে এল নিচে। রাস্তায় এসে রিকশা ডাকল। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। বুকের মধ্যে পাপের স্ট্রাইকার মাথা ঠুকছে আর ঘুরছে। ঘুরছে আর মাথা ঠুকছে। মাথা ঠুকে চলেছে। ভাবল, সব কথা জানিয়ে মবিনকে একখানা চিঠি লিখতে হবে। বাড়ি পৌঁছেই নবীনা দুখানা চিঠি লিখেছিল।

বাড়ি পৌঁছেই নবীনা ওর মায়ের কাছে রেখে যাওয়া বাচ্চাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য আসে। বড় ভাই আদিল বিশ্বাস ওকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বলেন, একটা খুব বাজে কাজ হয়ে গিয়েছে নবীনা। খুব মনস্তাপী কাজ। বলি বলি করি, পারি না। কত আর চেপে থাকি। ঢের ভেবেচিন্তে তোকেই বলব স্থির করেছি। আব্বাজী যখন উইল করে, আমি ছাড়া কেউ সেখানে ছিল না। সমস্ত উইল পড়া হল। কোথাও মিল্লাতের নাম নেই। ভাবলাম, আব্বাজী এত বড় ফাঁকি দিলে ছেলেকে। শুনছিস তো ? আবার রাজিয়ার কথাও কিছু নাই। নবীনার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কোন প্রকারে ধরা গলায় 'হ্যাঁ' উচ্চারণ করে। আদিল বিশ্বাস বলেন, ফাঁকি কিন্তু পড়েনি মিলু। ফাঁকি পড়েছে ছোট বউ রাজিয়া। রাজিয়ার নামে যে দলিলের নামগান হয়, সেটা মিছে। এক সম্পত্তি দুবার রেজিস্ট্রি করেছে আব্বাজী। সেটা আইনে টেকে না। আগেই মিলুর নামে শহরের বাড়ি দলিল করা আছে। সেই দলিল আমি ঢুঁড়ে পেয়েছি সিন্দুকের তলায়। সমাজ যখন হবে, ঐ দলিল দেখাতে হবে। এখন কী হবে, তাই বল্। খুব তো আনোয়ার গলা উঁচা করে কথা কইছিল। এখন বোনটা দাঁড়ায় কোথা ? দলিলখান দেখবি এক নজর ?

শহর থেকে হঠাৎ ফিরেই এমন অবিমৃষ্যকারিতার কটু আর রসালো বিদ্রূপ শোনার জন্য মন একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাবৎ মুখের রক্ত বিকালের জানালা বাহিত অস্তগামী আলোয় টগবগ করে ফুটছিল। নবীনার কণ্ঠ নিঃস্বর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নবীনার সুন্দর মুখখানি স্বল্প ঘামে সিক্ত হয়ে যায়।

রাত্রে ঘরে ফিরে বাচ্চাকে দুধ মাখা ভাত মুখে ঠেসে দিতে দিতে নবীনা ভাবতে থাকে, চিঠি লিখতে হবে। মবিনকে চিঠি লেখার চেয়ে রাজিয়াকে চিঠি লেখা অধিক জরুরি। তাছাড়া মবিনকে চিঠিতে কীই বা লেখা চলে ? যা লিখবে মনে করে শহর থেকে সে মনস্থির করেছিল, এখন সেকথা অবান্তর মনে হচ্ছে। মবিন রাজিয়াকে সম্পত্তির লোভে দয়া দেখাতে পারে। কিন্তু নবীনার প্রেমের খাতিরেও রাজিয়াকে গ্রহণ করার কোন তাগিদ তার মতো ভীরুর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ভালবাসার বিয়ে এ তো নয়। তাহলে সত্য কথা লেখা ভাল। রাজিয়াকে বৈদ্যবাটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। সব নাটক স্তব্ধ করে দেওয়া ভাল। ভাইয়াকে শাপমুক্ত করার দলিলখানা এখন নবীনার হস্তগত হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও নবীনা মবিনকে লিখল, প্রিয়তম মবিন, আমার চেয়ে ছোট বউয়ের শরীর বেশি নরম। আব্বা বা মিল্লাত ওকে স্পর্শ করেনি। বিনে পণে বিয়ে করলেও

তুমি ঠকবে না। ভিখিরি হলেও ছোট বউ সুন্দরী। শিক্ষিতা। ভাইয়াকে আমি দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। তুমি দ্রুত বিয়েতে সম্মত হও। দেরি করো না।

নবীনা পুরো চিঠিটা ছিড়ে ফেলল, লিখল, পাকজনাবেষু রিয়াজজী,

রাজিয়ার বিবাহ অন্যত্র দিতে হবে। না কোন মবিন, না কোন মিল্লাত, ওর জীবনে যেন না প্রবেশ করে। আমার অনুরোধ। সব কথা লিখতে পারছি না। পরে একদিন দেখা করে সব কথা জানাব।

তারপর নবীনা লিখল, ছোটমা, তুমি দয়া করে কিছুদিন আমাদের এখানে বেড়াতে এসো। কথা আছে। ভাইয়াকে একলা থাকতে দাও। বিপদ ডেকে এনো না। একত্রে বসবাস কি ঠিক হচ্ছে ? বাড়িটা তোমার হলে আমরাও তোমার। তাই ডাকছি। অথবা তোমার বৈদ্যবাটি যাওয়া ভাল। পরে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে। তোমার কপাল তো কেউ কেড়ে নেবে না। ভাইয়ার সার্টিফিকেট জোগাড় করছি। তুমি চলে এসো। আসার সময় দেখা করতে পারিনি। সীতাহাটি এলে কথা হবে প্রচুর। তোমার জন্য সত্যিই বড় কষ্ট পাই ছোটমা। তারপর এ চিঠি কেটে ছিড়ে শেষ করে নবীনা লিখল, ভাইয়া তুমি রিয়াজ সাহেবের ওখানে গিয়ে থাকো। রাজিয়াকে বিপদে ফেলো না। মবিন তোমাদের একত্র থাকা পছন্দ করে না। পারো যদি ছোটমাকে বৈদ্যবাটি পাঠিয়ে দাও। নতুবা মবিনের কাছে গিয়ে থাকাও অনেক নিরাপদ। তোমার সার্টিফিকেট পরে পাঠাচ্ছি। ইতি নবীনা।

চিঠি লিখে ফেলে সেই চিঠি হাতে করে নবীনা শব্দ হয়ে ওঠা কান্নাকে ঠোঁট চেপে দমন করতে গিয়ে ডুকরে উঠল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওর বাচ্চাটা মাকে কাঁদতে দেখে আচমকা কেঁদে উঠল ভয়ে।

॥ বারো ॥

ছেলেমানুষী গল্প যেমন (রাধারানীর গল্প) তেমনি অভ্যাসও কিছু ছিল রাজিয়ার। সে নিজেকে কাঁদানোর এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছিল। যখনই তার কাঁদতে ইচ্ছে হত, তখনই সে বাক্সের ভেতর থেকে সাপ-লুডো বার করত। সেদিন দুপুরে সেই সাপ-লুডো বার করল বাক্স থেকে। খাওয়া-দাওয়ার পর তার হাতে সাপ-লুডো দেখে মিল্লাত চমৎকৃত হয়। রাজিয়া বলে—খেলবে নাকি ? এসো দু'জনে খেলি। জীবনে কখনও টারগেট ছুঁতে পারিনি ; ভয় নেই আমি জিতব না। সাপে খাবে। ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে বৈদ্যবাটিতে আমি

খেলতাম। একাও কিন্তু খেলা যায়। মইয়ে চড়ি। সাপে খায়। একা খেলতে খেলতে কী যে হাসি পায়। এসো না দু'জনে খেলি আজ!

মেঝেয় লুডো পাতে রাজিয়া। একলা চাল দেয়। মিল্লাত খাটে শুয়ে ঝুঁকে দেখে কী অদ্ভুত এই মেয়েটা। একলা দিব্যি খেলে যাচ্ছে। বলে—একাই খেলতে থাকো। আমি দেখছি। মইয়ে চড়ে পাঁচ মিনিটেই রাজিয়া মাথায় উঠে গেল। একটা মাত্র সাপ পথে পড়ে। তারপরই শেষ ঘর। যদি একটা পয়েন্ট হয় তাহলে সাপের মুখে পড়ে। তাহলেই একেবারে তলায় এসে ঠেকতে হয়। যদি চার হয়, তাহলেই নিশ্চিন্দি গোল। রাজিয়া চাল ফেলতে গিয়ে বলে—এক আর ছয় সহজে হয় না। কিন্তু দ্যাখো, 'এক' অনিবার্য। কপাল!

সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই 'এক' হয়। হাসতে হাসতে রাজিয়া ঘুঁটি হাতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে ওঠে। মিল্লাত নিচে নামে। বলে—আমাকে দাও। রাজিয়া লুডো গুটিয়ে ফেলে বলে—সেটি হচ্ছে না মশাই। খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি কে যে তোমার সঙ্গে খেলব? তোমার দানে জিতে কী লাভ? খেলায় কোন দোস্তী দিয়ে জেতার নিয়ম নেই। সাপ-লুডোর খেলায় পার্টনার হয় না। ছাড়ো মশাই, খুব হয়েছে! এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। জোরে জোরে হাসলেই এই ধারা ঘুম আসে। রাজিয়া লুডো ঢুকিয়ে ফেলে বাক্সে। মেঝেয় শুয়ে যায়। মিল্লাত খাটে উঠে সোজা হয়ে শোয়। কাৎ থেকে চিৎ হয়। বলে—এই খেলার কী মানে হয়? তুমি খুব ছেলেমানুষ।

—আমার বেলা খুব ছেলেমানুষ বলছ! কিন্তু তোমার বাপ যখন বদনা হাতে বিয়ে করল, তখন সেটা খুব বয়স্ক খেলা ছিল বুঝি? আর মবিন, আমি সেজেছিলাম বলে ভাবল, এটাও বুঝি খারাপ খুব। কিন্তু সেটাও তো খেলা মনে করতে পারে। মানুষ কোথায় যে ছেলেমানুষ বলবে, আর কোথায় ভাববে বয়স হয়েছে 'খেলাধুলা করো না', বুঝব কী করে? তোমার বন্ধু ঘেন্নাও করে, ভালবাসে, আবার দয়াও করে। লোকটি ভারি পছন্দ আমার। খেলতে চাইলে, 'না' বলব না। কিন্তু তাবলে বিয়ে করতে পারব না।

—এই খেলার কী মানে হয়?

—হয় না? বারে! তুমি আমার জোর করে বিয়ে দেবে নাকি?

—সেই ক্ষমতা আমার আছে নাকি?

—কী জানি, থাকতেও তো পারে!

—তার মানে?

—মানে তো খুব সহজ। আমার তো কোন আশ্রয় নেই মিল্লাত। কোন

গার্জেন নেই। তুমিই আমার সব কিছু। শত্রু মিত্র বাপ মা। কথা দিচ্ছি, তুমি যা বলবে, তাই হবে। তাড়িয়ে দাও, চলে যাব। কিন্তু আজীবন দুষব তোমাকে। তুমিও একজন ভিখিরি মেয়েকে ঠাঁই দিতে পারোনি।

মস্তিষ্কের ভেতর থেকে কেমন একটা অপ্রস্তুত ধাক্কা খেয়ে খাটে শুয়ে-থাকা অবস্থায় মিল্লাত চমক খায়। উঠে বসে। দেখে, রাজিয়া ওর দিকে নিষ্পলক কেমন চোখ করে চেয়ে আছে। কষ্ট, বিমর্ষতা মেদুর স্বপ্ন আর বিহ্বল তৃষ্ণা মিশে এক ভীরু চাউনি। সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নেয় মিল্লাত। আবার শুয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে।

—এটা আমার দুর্গ মিল্লাত। এত ভাল আশ্রয় কখনও ভাবিনি।

চোখদুটি আবার খুলে যায় মিল্লাতের। মিল্লাত তীরবর্গার দিকে চোখ রেখে বলে—তুমি কি মনে করো কেউ তোমাকে এই বাড়িখানা দয়া করে দিয়েছে? তোমার কোন অধিকার ছিল না? তুমি কারু কাছে ছিনিয়ে নিয়েছ? তাহলে কিন্তু ভুল করবে ফুলবউ। আমি জানি, এই একখানা বাড়ি মোহরানা পেয়েছিলে বলেই আজ মবিন বিয়েতে রাজি হচ্ছে। নইলে ওর মায়ের সামনে বিয়ের কথা তোলাই যেত না।

রাজিয়া বলল—জৈগুন বিবি আমাকে ছোটলোক মনে করে। ভিখিরির বেশি কিছুই ভাবে না। আমি ফ্যানভাত খেয়ে পরের দুয়ারে মানুষ হয়েছি, আমার কোন বংশমর্যাদা নেই। মুসলমান এইসব খুব দ্যাখে। আমার সেসব কিছুই নেই। ওদের ধারণা আমার মতো মেয়ে কিছুতেই ভাল হতে পারে না। তবু তুমি মবিনকে ভালবাস, বন্ধু তোমার। বিয়ে হলে তুমি খুশি হও। মনে করো, এই বিয়ে দিয়ে তুমি কর্তব্য সমাধা করবে। তোমার মন চিনতে আমি ভুল করিনি। আমি চাই না, আমার কারণে তুমি কষ্ট পাও।

—তাহলে তুমি বিয়েতে কবুল হচ্ছ?

—না। কবুল কিছুতেই নয় মিল্লাত। কবুল কেন হব!

—তাহলে রাজি হচ্ছ কেন?

—রাজি কোথায় হলাম। তুমি বলছ বলেই কথাটা ভাবতে হচ্ছে।

—মবিন কি তোমাকে কোন মর্যাদা দেবে না, সেও কি তোমাকে ছোটলোক মনে করে?

রাজিয়া চুপ করে থাকে। কোন জবাব করে না। মিল্লাত ফের শুধায়—কথা বলছ না কেন? সে-ও কি শুধু দয়া করতে চায়? আমি তার বন্ধু বলেই বিয়েতে রাজি হচ্ছে?

রাজিয়া বলে—তুমি নবীনাকে বিয়ের জন্য বারবার এমন কাতর হয়ে বলছিলে, কোন ভিখিরিও অমন করে বলে না। এইভাবে কারো পায়ে পড়ে বিয়ে করতে চাওয়া কি উচিত ? আমাকে এভাবে তোমার একটা মস্ত সমস্যা করে তুলবে, নিজেকে দায়গ্রস্ত করবে, আমি তা চাইনি। আমি শুধু একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম। তুমি দিয়েছ। আর তো কোন কিছুই চাইছি না আমি।

—তাহলে কীভাবে জীবন কাটবে ?

—আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—আমার হচ্ছে।

—সব গার্জেনই তাই বলে।

—আমিও বলছি।

—তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও মিল্লাত। আমায় একলা থাকতে দাও।

—তাই হবে। কিন্তু তোমার বিয়ের পর।

—তবে তো বিয়ে না করে কোন উপায়ই নেই। কিন্তু আবার বলছি, এ-বিয়েতে আমি কিছুতেই সুখি হব না। মবিনকে আমি ভালবাসতে পারব না।

—কিন্তু কেন ?

—এক কথা বারবার বলা যায় না।

—তুমি কেন ভালবাসতে পারবে না, সেকথা বলোনি।

—বলেছি। আমি তেমন সতী সাধ্বী নই যে পতির পদ-সেবা করলেই সুখী হতে পারি। আমারও একটা মন আছে মিল্লাত।

—সেই মনটাই তো গোলমাল করছে।

—সেটা যখন বুঝেছ, তখন চুপ করে থাকো।

—কিন্তু ঘটনা যে চুপ থাকতে দিচ্ছে না।

—তার জন্য আমায় দায়ী করছ কেন ?

—তোমার মনের স্বভাবই তো তার জন্য দায়ী।

—আমি তো সেই মন নিয়ে একাই থাকতে চাইছি। তোমায় তো কোন উৎপাত করিনি। কেন অমন করছ তোমরা ? কী অন্যায় করেছি তোমাদের ?

রাজিয়ার গলা ধরে আসে। মিল্লাত বলে—অন্যায় কিছু করোনি। কিন্তু একটা যুবতী মেয়ের একলা থাকাটাই অন্যায়।

রাজিয়া নিঃশব্দ বাঁকা হেসে বলে—জীবনের এমন ব্যাখ্যা অন্তত তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি। অন্যরকম ভেবেছিলাম।

—সেটা ভুল করেছ।

—দ্যাখো, ভালবাসা তো জোর করে হয় না।

—ভালবাসতে তো বলিনি। বিয়ে করতে বলেছি।

—সেটাই খারাপ লাগছে, কেন বলছ? এ-কথা সমাজের পাঁচজন বলবে, তুমি বলবে কেন?

—সমাজকে এতদিন চিনতাম না। এখন ক্রমশ চিনতে পারছি।

—এত ঘটনার পর, এতদিনে? আগে চেননি? হঠাৎ আজ চিনলে, আগে চিনতে না, এ-কথা আমি মানব না। ভয় পেয়েছ, তাই একলা ফেলে পালাতে চাইছ। দায়িত্বের নাম করে দায়িত্ব এড়াতে চাইছ। আমি কিন্তু তোমাকে একটা সহজ পথ বাতলে দিতে পারি। শুনবে?

—বলো।

—তুমি বিয়ে করো।

—বিয়ে?

—হ্যাঁ। সংসারী হও। আমার কথা ভেবো না। যে-দায়িত্বের কথা সমাজের মুখ চেয়ে ভাবতে হচ্ছে, বিয়ে করেও সেই দায়িত্ব পালন করা যায়।

—বেশ। বিয়ে আমি করলাম। তারপর? তারপরের দায়িত্বটা কী? তুমি তখন কী করবে?

—যেমন আছি তেমনি থাকব।

—এইভাবে?

—হ্যাঁ। যেমন আছি।

—সেটা কল্পনা। অবাস্তব। অসম্ভব।

—খুব সম্ভব মিল্লাত। তুমি বুঝবে না।

—কেন বুঝব না?

—কারণ তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।

—তুমি রাধারানী।

—সেটা গল্প।

—জানি সেটাই তোমার জীবন। গল্প নয়।

—তারপর কথা কেন?

—শুধু কল্পনায় তো জীবন চলে না।

—চলে। যদি সেই কল্পনাকে জীবিত রাখার ব্যবস্থা হয়।

—কীভাবে?

—তার জন্যও তো কল্পনা দরকার। ভাবতে পারার সক্ষমতা দরকার। তুমি

সেটা পারছ না বলেই জোর করে আমার বিয়ে দিতে চাইছ। আমার কল্পনাশক্তিকে অপমান করছ। যদি বলি, পাওয়া না পাওয়া ধারণা মাত্র। আমি পেয়েছি, যা পেয়েছি, সেটা বুকে করে থাকতে দাও। সমাজকে টেনে এনে বিরক্ত করো না। আমি সমাজের কোন ক্ষতি করিনি।

—করেছ। তুমি অলঙ্কার পরেছ, আতর মেখেছ। তোমাকে সমাজ বিশ্বাস করে না। ক্ষতি না হোক, সমাজ তোমাকে ভয় পায়।

—তুমিও পাও তাহলে ?

—পাই। কারণ আমার বউ সেই ভয় পাবে। বিশ্বাস করবে না।

—তোমার বউ বিশ্বাস করবে না ?

—করবে, যদি বিয়ের পর তাকে নিয়ে অন্য গ্রহে চলে যেতে পারি।

—তুমি চলে গেলে আমি যে বাঁচব না। তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারো না ? মবিনরা যা করে, যেমন করে ঘৃণা করে, তুমি তা করলে না কেন ?

মিল্লাত বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসে। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। রাজিয়া কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে। কাঁদতে পারে না। মনে মনে বলে—আমার যে কোন বাড়তি ভালবাসার ক্ষমতা নেই মিল্লাত। আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। নতুন করে ভালবাসার জন্য আমি কোন আলাদা নতুন জীবন পাব না। আমার পুনর্জন্ম নেই। আমি হিন্দু নই। মুসলমানকে একবারই ভালবাসতে হয়, এই ক্ষুদ্র জীবনে যা পাওয়ার আদায় করে নিতে হয়। যত পাপ, যত পুণ্য একখানা ক্ষুদ্র জীবনের জন্য। আবার এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসার কোন বিধান নেই। বেহেস্তের ভালবাসা আমি কী করব ? পৃথিবীর ভালবাসা পৃথিবীতেই রেখে যেতে হবে। বেহেস্ত কখনও পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। রোজকেয়ামতের দিন আমি মিল্লাতকে চিনতে পারব না। মিল্লাত আমায় চিনবে না। এই দুনিয়ার ভালবাসার শক্তি বেহেস্ত অব্দি পৌঁছয় না। কারণ বেহেস্তে গিয়ে মানুষ এই মাটির পৃথিবীকে ভুলে যায়। এখানকার ভালবাসার পাপে মানুষের দোজখ হবে, কিন্তু সেই পাপ করতে আর একবার যদি মন চায়, মন সেই সুযোগ পাবে না। এখানকার মতন সেখানকার জীবনও অসহায়। সেখানে গিয়েও আমাকে নিসার হোসেন বা মবিনের সেবা করতে হবে। আমার জন্য আমার ভালবাসার হৃদয় সেখানে অপেক্ষা করবে না। এই জীবনের সব পুরস্কার সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মিল্লাতকে পাওয়া যায় না। খোদা যদি আমার জন্য একটি মাত্র পুরস্কার ঘোষণা করতেন, আমি তাহলে মিল্লাতকে চাইতাম। বলতাম, যে-সুযোগ দুনিয়ায় ছিল

না, সেই সুযোগ দাও। পাপ করার সুখ আমাকে দাও। শুনেছি, সেখানে সব সম্ভব। কিন্তু মনের মতন পৃথিবী সেখানে নেই। মানুষ এত বোকা যে বেহেস্তে পৌঁছে একবারও এই মাটির পৃথিবীর জন্য কাঁদে না। হায়! কাঁদে না কেন?

রাজিয়ার সমস্ত চিন্তা তোলপাড় করতে থাকে। রাজিয়া উঠে বসে। চিন্তার ভারে তাবৎ মুখমণ্ডল থমথমে হয়ে গিয়েছে। মিল্লাত আবার ঘরের মধ্যে ফিরে আসে। খাটে এসে দুই পা ঝুলিয়ে বসে। মনে মনে বলে—মবিন তোমাকে ঘৃণা করে এ-কথা সত্য নয়। মবিন ভয় পায়। তার ভয় পাওয়া অমূলক নয়। মিথ্যা নয়।

রাজিয়ার গভীর শান্ত চিন্তা-পীড়িত মুখচ্ছবি যেমন করুণ, তেমনি বেদনা-নিষিক্ত সৌন্দর্যে আশ্চর্য লোভনীয়। স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয়, ভাবলেই বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। একসময় মনে হয়, ছুঁয়ে দেখে যদি বলতে পারা যেত, কেঁদ না, আমি আছি। আমি থাকব। মিল্লাতের হঠাৎ এইসব ভাবনা কোথা থেকে আসে বুঝতে পারে না। কোন পাথর-চাপা জলরাশি যেভাবে উদগত উৎসারিত হয়ে কোন কোন ছিদ্রপথে পাথরের পাশ বেয়ে গা বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে, উচ্চকিত লাফিয়ে ওঠে, মনের মধ্যে তেমনি কোন তৃষ্ণা হঠাৎ উল্লসিত হয়। মনে পড়ে কোন এক অন্ধকারে বৈদ্যবাটি ফেরত অপমানিতা অসহায় রাজিয়া মুহূর্তের জন্য তার দেহে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আকস্মিক ঘটনা কম নয়। খুব তুচ্ছ নয়। শরীরে কোথায় অতলে সেই উষ্ণ শীতল নম্র আকুল স্মৃতি থেকে গিয়েছে। সেটি সে শরীর থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। সেই চাপা অসহ্য স্বেদ, স্নেহ, কোমল স্পর্শে নিঃশ্বাসের সুগন্ধে যে মুহূর্ত-লিপ্ত দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ঘটে গিয়েছিল, প্রতি রক্ত-কণিকা প্রতিটি রোমকূপে এসে আরো একবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বলে, আবার এসো। আর প্রশ্ন করে, রাজিয়া খুব দ্রুত তার অবসন্ন দেহ তুলে নিতে সত্যিই কি সামান্য ইতস্তত করেনি? করেছিল কিনা, সে-কথা রাজিয়ার শরীরে এখনও কি খুঁজলে পাওয়া যায়! একথা তো সচেতন রাজিয়া বলতে পারে না। তেমন মগ্ন তেমনই লিপ্ত, অবসন্ন ব্যাকুল অসহায় রাজিয়া জীবনে হয়ত একবার কোনক্রমে আসতে পেরেছিল অন্ধকার নিভৃত ঘটনায়। সে তো আর আসবে না। কিন্তু সে যে আর আসবে না, তাই রক্ষে। কিন্তু যদি কখনও কোন ভ্রান্তির পথে, কোন যাদু বশে, দেহের কোন বিভ্রম থেকে কোন মায়ায় চলে আসতে চায়। মিল্লাত তাহলে সেই আকুলতা ঠেকাবে কী করে? ভাবতে ভাবতে রাজিয়াকে চেয়ে দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে ওঠে মিল্লাত। গলা শুকিয়ে যায়। কেমন বিপন্ন মনে হয়

নিজেকে। রাজিয়া মিল্লাতের দিকে না চেয়েও টের পায়, মিল্লাত তাকে দেখছে। রাজিয়ার দৃষ্টি প্রসারিত অর্ধ-উন্মুক্ত দরজার দিকে। একটু আগেই রেলিং থেকে মিল্লাত ঘরে ফিরেছে, দরজা ঠিক মতন ভেজিয়ে দেয়নি বলে আধখোলা অবস্থায় দুটি কাঠের পাল্লা খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। রাজিয়ার দৃষ্টি সেইদিকে। মিল্লাত রাজিয়াকে দেখছে পাশ থেকে। ডান গাল নাক একটি চোখ ঠোঁটের প্রায় তিন ভাগ, গলার অধিকাংশ দেখতে পাচ্ছে। রাজিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে মিল্লাতের দিকে স্পষ্ট হয়। দুটি চোখ সম্পূর্ণ মিল্লাতের চোখে ন্যস্ত হয়। রাজিয়া চোখ ফেরায় না। মিল্লাতও চেয়ে থাকে। রাজিয়ার দৃষ্টি-স্নেহ মিল্লাতের চোখের গভীরে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মিল্লাতের বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। ঠিক যেভাবে দাদীর অলঙ্কার পরার দিন চোখে চোখ পড়ে দৃষ্টি আটকে যাওয়ায় বিদ্যুৎ হেনে ছিল, ঠিক সেই ধারা একই উপলব্ধি চমকে উঠছে। রাজিয়ার ঠোঁটে তেমনি এক নিঃশব্দ তৃষ্ণার্ত হাসি ফুটে ওঠে। রাজিয়ার কী হচ্ছে, ঠিক কী ধরনের অনুভূতি হচ্ছে, মিল্লাত জানে না। জানতে পারবে না কোনদিন। রাজিয়া নিষ্পলক চেয়ে থেকে বলল—ঘৃণা করতে পারো না?

মিল্লাত বলল—করি। আমি এখান থেকে চলে যাব ফুলবউ।

রাজিয়া অপরাধীর মতন দৃষ্টি নামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। লজ্জা নয়। স্পষ্ট অপরাধের অভিব্যক্তি স্ফুট হয় দেখতে পায় মিল্লাত। তখন বুকের মধ্যে এক ধরনের কষ্ট বেজে ওঠে। খাট থেকে নেমে বাইরে খোলা ছাতে চলে আসে সে। বাবু-বাগানের অজস্র মুকুলে গুটি ফলে আচ্ছন্ন গাছপালার দিকে চেয়ে থাকে। আকাশ ঘোর হয়েছে। মনে হচ্ছে বাগানের মাথায় ধুলোর ধূসরতা। ও-গুলো কি মেঘ? মনে হচ্ছে মেঘই সম্ভব। ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমশ উপরে ঠেলে উঠছে। বৃষ্টি হবে কি না বলা যায় না। কেমন ভারি সোঁদাগন্ধ মেশানো হাওয়া বাগান ছুঁয়ে মিল্লাতের গায়ে সহসা ঝাপটা দিয়ে চলে যায়। শরীর বলে ওঠে, বৃষ্টি আসছে। অজস্র মুকুল আর ফল নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরে মাথায় হাতে বৃষ্টির ভারি ফোঁটা পড়ল বেশ কয়েকটি। হাওয়া আরো ঘন হয়। মন কোথায় হারিয়ে যেতে থাকে। এইসময় মানুষের অদ্ভুত জন্ম ও জীবনের জন্য মন-খারাপ-করা অস্ফুট বেদনার কথা মনে হয়। কী সেই বেদনা বোঝা যায় না। কী করতে হত! হয়নি। কী যেন করতে হবে, অথচ হবে না। কী যেন কাহিনী ছিল, শুরু হয়েছিল, থেমে গেছে। সব ভুল হয়ে গেছে। কোথায় সে আলোকিত নগরী মাটি ফুঁড়ে উঠতে চেয়েছিল। কোন এক উৎসবের রাতে। তারপর আকাশে সেই কল্পনার বাড়িঘর আতসবাজির মতন মিলিয়ে গেল। ঝড় এল। বৃষ্টি এল।

তারপর আকাশ শান্ত হয়ে গেল। অজস্র নক্ষত্র উঠল সেই বৃষ্টিস্নাত আকাশে। তাদের ভাষা মানুষ বুঝতে পারে না। মানুষ কেবল সেই নক্ষত্র উজ্জ্বল গভীর কালো আকাশে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটা ছুটে এসে মিল্লাতের চোখে-মুখে বিঁধিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই বৃষ্টির ছোঁয়া মুকুল, গুটিফল, ও শরীরের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু মিল্লাত ঘরে ছুটে যেতে পারে না। নিসর্গ মানুষকে এইভাবে আটকে রাখে। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে মিল্লাত। মনে পড়ে। একদিন লোডশেডিং হয়েছিল। তার ঘুমের মধ্যে। তখন সন্ধ্যার পর বেশি রাত হয়নি। লোডশেডিং-এর স্পষ্ট সংকেত থাকে না। বা থাকলেও তখন সে ঘুমন্ত। আলো চলে যাবার আগে লক্ষ করলে বোঝা যায়, লোডশেডিং হয়েছে, আলো চলে যাচ্ছে। কিন্তু তখন সে ঘুমন্ত। কারণ লোডশেডিং হবে তা সে বুঝতে পেরেই সুইচ অফ করে দিয়েছিল। সেই সুইচ অন্ করেছিল রাজিয়া। রাজিয়ার কোন দোষ ছিল না। তবে দোষ কার ছিল? কারো নয়। যা ঘটবার কে যে ঘটিয়ে গেছে, কেউ জানে না। এইভাবে রাজিয়া মিল্লাতের বুকের মধ্যে চলে এসেছিল। কিন্তু কখনও আর আসবে না। কোন নির্দোষ অবকাশ তৈরি হবে না। এখন যা ঘটাবার নিজেদেরই ঘটাতে হবে। সচেতনভাবে কোন কিছু ঘটানোর সাহস কারো নেই। বরং সচেতনভাবে এখন কোথাও চলে যাওয়া জরুরি। নির্দোষ অবকাশ কে চায়? কেউ না। প্রতিটি নির্দোষ অবকাশ যেভাবে চলে আসে, তার জন্যও সমাজ মানুষকে দায়ী করে। রাজিয়াকে কে এনেছে এখানে? কে চেয়েছিল তাকে? কেউ না। কে পাঠালো এভাবে সহসা অপ্রস্তুত মিল্লাতের জীবনে? মিল্লাত তো চায়নি। তবে এল কেন? চলে যাও। ফিরে যাও। কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে? জীবনের ঘটনা থেকে লোডশেডিং গহনার বাক্স রাধারানী তো ফিরে যেতে পারবে না। বরং সে বারবার অবকাশ চেয়ে ফিরবে। বনফুলের মালা, টাকার নোট, অন্ধকার বাদলার রাত্রি সে না চাইতেই এসেছিল। গহনার বাক্স, লোডশেডিং আপনা থেকেই এসেছিল। অবকাশ আসেই। নৈসর্গিক বা যান্ত্রিক, কারণ যাই হোক, আসে সেই নির্দোষ সময়। কোন গোলযোগ থেকেই হয়ত চলে আসে অতর্কিত। এই অঘটন কোন উপন্যাসে ঘটলে লেখককে দায়ী করা হয়, কিন্তু জীবনের দায় টানবে কে? মিল্লাত ভাবল, জীবনটা কী আশ্চর্য উপন্যাস!

বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ সে বৃষ্টির বাইরে পালাতে পারছে না। ক্ষতি হবে জেনেও নয়। রাজিয়া তাকে চিৎকার করে বারবার ডাকছে। প্রবল বৃষ্টি নেমেছে।

মিল্লাত সাড়া দিতে পারছে না। রাজিয়া জানে, এই শুকনো দাবদাহে জ্বলন্ত তৃষ্ণার্ত দেহ চৈত্র বৈশাখে বৃষ্টি ভালবাসে। যেমন ভালবাসে মাটি। মানুষের দেহ নাকি সেই মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে। দোষ কার ? কারো নয়। বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ হলে কে দায়ী হবে ? রাজিয়ার কণ্ঠে সেই অভিযোগ। মিল্লাত কান দেয় না। কিন্তু একসময় সে আপনা থেকেই বৃষ্টিতে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে দাঁতে দাঁত বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে আসে। টস্‌টস্‌ করে গা বেয়ে জল ঝরছে মেঝেয়। রাজিয়া বলে—ভারি ছেলেমানুষ! চোখে তিরস্কার আর স্নেহ মাখামাখি হয়। রাজিয়া তোয়ালে এগিয়ে দেয়। গা চুল হাত পা মুছে ফেলেও মিল্লাতের কাঁপুনি থামে না। শীত ধরে গেছে। এই পাগলা হাওয়াটাই কেলেঙ্কারি করেছে। একখানা চাদর দরকার। চৈত্রের গোড়ায় এখনও শীত আছে। মাসের আজ কত তারিখ ? না। গোঁড়া নয়। মাঝামাঝি বোধহয়। কি তারও বেশি। তা সেই শীত হাওয়ায় মিশে গেছে। রাত্রের শীত, ভোররাতের ঠাণ্ডা দিনে জাগ্রত করেছে বৃষ্টি, বাড়িয়ে দিয়েছে। একখানা চাদর দরকার। রাজিয়া তার মেয়েলি ছোট চাদরখানা মিল্লাতকে এগিয়ে দিয়ে বলে—ভাল করে জড়িয়ে নাও। আমি চা করে আনছি।

রাজিয়া একখানা কাঁসার থালা মাথায় চাপিয়ে কিছু ঢাকা কিছু উন্মুক্ত বারান্দা পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার মুখের সামান্য ফাঁক, যেখানে আকাশের ফোঁকর আছে, সেটুকু লাফিয়ে পেরিয়ে যায়।

মিল্লাত ভাবে, অতএব চলে যেতে হবে। মবিনের ভয় অমূলক নয়। সে বড় সামাজিক মুসলমান। তার কোন অন্যায় দেখি না। কোন নির্দোষ সময় আর বাঞ্ছনীয় নয়। অভিপ্রেত নয়। রিয়াজ একটি বোকা ছেলে। অযথা তর্ক করে। রাজিয়া যেন মবিনের জন্য সুগন্ধি মাখে। জীবন যা চায়। যা স্বাভাবিক। তাই সুন্দর। রিয়াজ তোমার ফরমূলা। নানীর বয়ান। শোন বলি। যা সুন্দর তাই সত্য। বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ বিউটি। আতর বা সুগন্ধি কথা বলতে পারে। সৌন্দর্য আর কামনার সমন্বয়। বিয়ের পর আমি ওদের একটি সুন্দর আতর প্রেজেন্ট করব। সিম্বল সেটা। ওদের কামনার সৌন্দর্যের সমর্থন। কিন্তু যদি সেটা আমারই সিম্বল হয় ? না। আমি কোন আতর উপহার দিতে পারি না। আমার যোগ্যতা নেই। অত ভাল প্রতীক আমার জীবনে নিষিদ্ধ হয়েছে নবীজী। তোমার সম্মানিত ফেরেস্তা অশ্রুপাত করলে বা নিন্দা করলে, কী করছে জানি না, আমি শুধু বলব, আমি কিছুই জানি না। বলব, আমি আর বুঝতে চাই না জীবনটাকে। আর, এমন কি খোদার ধর্মকেও আমি আর বুঝতে পারি না।

মিল্লাত ভাবতে ভাবতে খাটে বসে যায়। চাদরেও শীত জব্দ হতে দেরি হয়।

রাত্রে মিল্লাতের জ্বর আসে। এত অসম্ভব তীব্র জ্বর আসবে কথা ছিল না। বৃষ্টি তাকে এক আশ্চর্য জ্বর সর্দি হাঁচি উপহার দিয়ে রাত্রে নক্ষত্র ফুটিয়ে দিল। পরের দিন এগারোটা নাগাদ নবীনার চিঠি এসে পৌঁছল।

॥ তেরো ॥

হোমিওপাথি ডাক্তার জী তালিবের কাছে ঔষধের জন্য বেরিয়েছিল রাজিয়া। তার ফিরতে সামান্য দেরি হচ্ছিল। রোগীর ভিড়। টিকিট করে অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না। রাজিয়ার বর্ণনা শুনে ডাক্তার বললেন—বৃষ্টির জ্বর কি না এখনই বোঝা যাচ্ছে না। শহরে বসন্ত হচ্ছে। ঘা মতন। আজকাল তো গুটি বসন্ত নেই। তবু সাবধান হওয়া ভাল। বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন, জল-ফোস্কা হয়েছে কি না। স্বভাব নরম হলেও যন্ত্রণা কম নয়। যদি দ্যাখেন ফুটে গেছে, বিকালে খবর দেবেন।

রাজিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। রিকশা করে দ্রুত বাড়ি ফিরে এল। মিল্লাত প্রায় বে-ঘোরে শুয়ে ছিল। বিছানার বালিশের কাছে চিঠিখানা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাজিয়া চোখ বন্ধ আচ্ছন্ন মিল্লাতকে একবার নিরীক্ষণ করে চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়ে ফেলল। তারপর বুক ভরে নিশ্বাস টেনে সেই শ্বাস ত্যাগ করল। খামের মধ্যে চিঠি ঢুকিয়ে বেখে বালিশের কাছে রাখল। তারপর ঠাণ্ডা হাতখানা মিল্লাতের কপালে রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করতেই মিল্লাত চোখ খুলে দেখল ওকে। কথা বলল না। মিল্লাতের কথা বলার সম্ভবত ইচ্ছে হচ্ছিল না। জ্বরের চাপে দুই চোখ ছলছল করছে। রাজিয়ার স্পর্শ ভয়ানক স্নিগ্ধ আর মায়াবী মনে হয়। রাজিয়া কপাল থেকে হাত তুলে নেয়। চেয়ারখানা টেনে এনে খাটের পাশে বসে। পুরিয়া খোলে। মিল্লাতকে মুখ খুলতে বলে। মিল্লাত অল্প করে মুখ খোলে। রাজিয়া গা থেকে মিল্লাতের চাদর নামিয়ে দুই চোখে ভাল করে দেখতে থাকে কোথাও ফুটেছে কি না। মিল্লাত চোখ খুলে রাজিয়ার চোখের ব্যাকুলতা লক্ষ করে। হঠাৎ কী হয়, রাজিয়ার একখানা হাত প্রাণপণে চেপে ধরে আচমকা। গলার মধ্যে কেমন অস্ফুট আর্ত শব্দ করে। আকস্মিক এই আচরণে রাজিয়া বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বাধা দিতে পারে না। হাতখানা আঁকড়ে থাকে মিল্লাত। বুকের উপর দু'দণ্ড ধরে থেকে একসময় মুঠো আলগা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট শুনতে ও অনুভব করতে পারে রাজিয়া। ধীরে ধীরে

হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় সে। বলে—ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কথা শুনে ক্ষীণ ম্লান হাসে নিঃশব্দে মিল্লাত। কথা বলে না। রাজিয়া বলে—বিকালে জ্বর কমে যাবে।

সহসা মিল্লাত জানায়—আমার বসন্ত ফুটেছে ফুলবউ। অবিশ্যি সে কিছু নয়। আজকাল বসন্ত চর্মরোগের মতন। গা জ্বালা করে কিছুটা। আমি ভাল আছি। তুমি রান্না করে খেয়ে নাও। অনেক বেলা হয়েছে।

—কোথায় ফুটেছে, আমাকে দেখাও।

রাজিয়ার কণ্ঠস্বর সামান্য ভয়ে ব্যথায় ভরে যায়। মিল্লাত আঙুলের ফাঁক দেখিয়ে বলে—এখানে। রাজিয়া জল-ফোস্কা দেখতে পায়। মৃদু শিউরে ওঠে।

রাজিয়া রান্না করে না। খায় না। সবই অনুভব করে মিল্লাত। খারাপ লাগে। রান্নার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও রাজিয়া কোন উত্তর করে না। সফীকে দিয়ে কিছু ফলমূল আনিয়ে নেয়। ফল ছাড়িয়ে প্লেটে রাখে। ফল এগিয়ে ধরে মিল্লাতের মুখের কাছে। মিল্লাত আরো অসহায় হয়ে ওঠে। বলে—তুমি কিছু না খেলে আমি খাব না।

রাজিয়া স্বল্প হেসে বলে—আমি খাব। তুমি আগে খেয়ে নাও।

—কী খাবে তুমি ? কোথায় খাবার তোমার ?

—আছে।

—কোথায় আছে ?

রাজিয়া কোন জবাব দেয় না আর। তার নীরবতা দেখে মিল্লাত বিছানার উপর উঠে বসে। বলে—সফীকে ডাকো। ও খাবার নিয়ে আসবে।

—আহ্ ! তুমি শুয়ে থাকো। উঠলে কেন ? একটু বাদে সফীকে ডেকে টাকা দিচ্ছি। না খেয়ে আমি কারো সেবা করতে পারব না। আমি তেমন মেয়েই নই।

—খুব হয়েছে। তুমি কেমন মেয়ে আমার বোঝা শেষ হয়ে গিয়েছে। জীবনভর শুধু নিজেকে ফাঁকি দিতেই শিখেছ!

কথাটার গভীর মানে আছে হয়ত। কিন্তু রাজিয়া সে-কথায় কান দেয় না। বলে—আমি তো খাব বাবা। মিছেই তক্ক করছ। নাও। শুয়ে পড়ো। বসন্তে এত জ্বর হয় না। বসন্ত আর জ্বর দুটো একসঙ্গে হামলে পড়েছে। বিকালে ডাক্তার তালিবকে খবর দিতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারখানা হাতে করে ঝুলিয়ে টেনে এনে টেবিলের কাছে রাখল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল রাজিয়া। মিল্লাত চুপচাপ

চোখ বন্ধ করে খাটে পড়ে রইল। কেমন আচ্ছন্ন! বিশ মিনিট বাদে হঠাৎ কী মনে হওয়ায় জ্বর তপ্ত ব্যথাজর্জর দেহকে ঠেলে তুলে মিল্লাত খাট ছেড়ে নামল। এবং ধীরে ধীরে রান্না ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজা স্বল্প উন্মুক্ত। ভেতরে পিঁড়িতে বসে রাজিয়া আনমনা স্লাইস রুটি রাত্রের বাসি তরকারি ঠেসে গেলাসের জলসহ কোনমতে গলা দিয়ে পেটে চালান করে দিচ্ছে। চোখে মুখে কষ্ট করে গিলে নেওয়ার শুষ্ক অভিব্যক্তি ঘটছে। মিল্লাতের অদৃশ্য ছায়া পড়েছিল। রাজিয়া চমকে উঠে দরজার দিকে চোখ ফেলে কেমন লজ্জিত ধরা পড়ে যাওয়ার অপ্রতিরোধ্য ভাব করে। তখনই তার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। আরো এক গেলাস জল খায় সে। মিল্লাত সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসে। তার সহসা মনে হয়, রান্নার ঝামেলা কেবলই রাজিয়া একার জন্য করতে উৎসাহ পাচ্ছে না। তবে কি মেয়েটা কেবল তারই জন্য অর্থাৎ মিল্লাতের জন্যই রান্নাবাটা ঘরকন্নার আয়োজন মনের অজান্তে তৈরি করে প্রত্যহ? কীভাবে সে এই হঠাৎ পাওয়া জোর দখলের জীবনকে যাপন করছে একটা স্বপ্নময় রক্তাক্ত সময়ে? ভেতরে এখন কী হচ্ছে তার? চোখে কী তীব্র ব্যাকুলতা অসুস্থ মিল্লাতের পীড়ায়। ঠিক যেন মা আর মায়াবী প্রেমিকার সম্মিলিত একটা রূপ চোখের সামনে গড়ে উঠল আজই। মিল্লাত মনে মনে বলল, —না। আর নয়। আর কিছুতেই নয়। আমি কোন নির্দোষ মুহূর্ত জীবনের জন্য কামনা করি না। প্রতি পদক্ষেপে লোভ জড়িয়ে যাচ্ছে। সেখানে আত্মার এক অদ্ভুত শান্তি অপেক্ষা করে আছে। কিছুতেই আর এভাবে চলতে পারে না। না। পারে না।

বিকালে রাজিয়া ডাক্তারখানায় এল। সবিস্তারে মিল্লাতের চোখমুখের অবস্থার কথা, দেহের টেম্পারেচারের কথা, আচ্ছন্ন শুয়ে থাকার কথা এবং আঙুলের ফাঁকে বসন্ত ফুটে ওঠার কথা বর্ণনা করল। তার আকুলতা দেখে ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বসন্ত যে আজ খুব নিরীহ রোগ সেকথা পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাজিয়া সন্ধ্যার মুখে রিক্শা করে ফেরার পথে চৌমাথার ভীড়ে বাহারপুরের ষণ্ডাদের দেখতে পেল। আগের দিনের মতোই লোকগুলি তাকে পেছন থেকে ডাকতে লাগল। রাজিয়া রিক্শা থামাল না। বুঝতে পারছিল, বাহারপুর তার তাবত মর্যাদা ছিনিয়ে নিতে চায়। সুযোগ পেলে অপমান করবে। সুযোগ পেলে কত কি করতে পারে, হত্যা অবধি। বুকের ভেতরে ভয় জেগে উঠল। মনে হল, সমস্ত দুনিয়া রাজিয়ার বিপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। লোকগুলি অনেক দূর। পিছু পিছু ছুটে এসেছিল। রিকশা-অলা অবস্থার গতিক বুঝে রিকশা ছুটিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে রাজিয়া দেখল, মিল্লাত নেই। আশ্চর্য হল। জ্বর

গায়ে বেচারি টিউশানি চলে গেল নাকি ? সন্দেহ হল। জ্বর গায়ে বসন্ত ফুটেছে। মিল্লাত অত বেকুফ নয়। তাহলে ? গুমোট-ঘরখানি দরজা-খোলা অবস্থায় হাহা করছে। সচকিত হয় রাজিয়া। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে, মিল্লাত বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। আলনায় জামাকাপড় নেই এ-ঘরে এসে চোখে পড়ে। চামড়ার স্যুটকেস চোখে পড়ে না। বালিশের কাছে চিঠিখানা পড়ে আছে। খাম-খোলা। রাজিয়া খামের মধ্যে সাদা কাগজের লেখা চিঠি ঢুকিয়ে রেখেছিল। সেটি মিল্লাত যাবার আগে খুলেছে। বার কতক পড়েছে নিশ্চয়। ভেতরের বক্তব্য অনুধাবন করেছে। মবিন তোমাদের একত্র থাকা পছন্দ করে না। এ যে বড় স্পষ্ট কথা। আবার ঠিক স্পষ্টও নয়। মনে পড়ে যায়, রাজিয়া মিল্লাতের কাছে থাকছে, সে যে ভারি বিপজ্জনক কথা। মবিন বলেছিল। আবার বলেছিল, শহরে গিয়ে থাকবেন, বরং নিরাপদ। রাজিয়াকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করার পর শহরে বরং নিরাপদ বলার বৈপরীত্য দুর্বোধ্য ছিল। বড় ঘেন্না ছিল মবিনের কণ্ঠস্বরে। বন্ধু যেন দূষিত নারীর ছোঁয়ায় বিড়ম্বিত না হয়, সেই ভয়। লোকটি তাকে অত্যন্ত ছোটলোক মনে করেছিল। নেশা আর মোহে গ্রস্ত রুচিহীন বলে তিরস্কার করেছিল। জীবনে না-পাওয়ার শূন্যতার কথা বলে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। সে কারণেই রাজিয়াকে বিপজ্জনক বলেছিল। অতএব মিল্লাত চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন এত কান্না পাচ্ছে কেন ? চারিদিক এত ভয়াবহ ঠেকছে কিসের ভয়ে ?

রাজিয়া একলা ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো জ্বেলে খাটের দিকে চাইল। শূন্য। নেই। চলে গিয়েছে। পালিয়ে গিয়েছে। সেবা করার বড় লোভ জেগেছিল মনে। গা জ্বরে ধূ ধূ করছে। ভাল করে পা ফেলে হাঁটতে পারছে না। টলছে। কী অসহায় হয়ে হাত চেপে ধরেছিল। কেমন করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। শিশুর মতন দুই চোখে কী যে মায়া ফুটে উঠেছিল। একখানা চিঠির মাত্র একটি ছত্রে সব স্তব্ধ করে দিয়েছে। এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করব না মবিন। রাজিয়া ক্রুদ্ধ ভয়ে বেদনায় কেঁদে ফেলে। ক্ষমা করব না। যেন সে প্রতিজ্ঞা করে নিজের কাছে। সফী এসে বলে—রাতে আমাকে শোবার জন্য বলে গেছে ছোটসাহেব। আমি আসব ?

রাজিয়া গর্জন করে ওঠে যেন বা। না। নিজের জন্য আমি নিজেই যথেষ্ট। তুই আমাকে পাহারা দিবি ? অমন উপকার কে চেয়েছে ? চলে যা। চোখের সামনে থেকে চলে যা। আমি কারো দয়া চাইনে। একা থাকব। স্রেফ একা। কে কার বল ? কেউ কারো নয়। রাজিয়ার গলা হঠাৎ তেতে উঠে মুহূর্তে নরম হয়ে ভিজে আসে। সফী ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাচ্চা ছেলে, রাজিয়ার

আর্তনাদে সহসা কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। রাজিয়ার চোখ ঈষৎ ভিজে গেছে। সেদিকে চেয়ে দেখতে পারে না সফী। রাজিয়ার কণ্ঠে আর কোন বার্তা নেই দেখে মুখ নিচু করেই সফী নিচে নেমে চলে যায়। রাজিয়া ভাবে, এ-কেমন আচরণ তার ? এত উত্তেজনা কেন ? ছোট কিশোর সফী তাকে কী মনে করল ? অথচ কোন ঘটনাই রাজিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, মিল্লাত বড় কষ্ট পাবে। কোথায় কীভাবে থাকবে কে জানে। মিল্লাতের সকল দুর্‌বস্থার জন্য রাজিয়াই দায়ী, সেকথা রাজিয়ার মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, অকস্মাৎ এই বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। কিছুতেই মেনে নিতে মন চায় না, মিল্লাত এভাবে পালিয়ে যাবে। জীবন থেকে মানুষটা কেমন যেন অলগা হয়ে যেতে চাইছে। গভীর রাত্রে রাজিয়ার মনে হল, এ-বাড়িতে তার মৃত স্বামী আর সে, তাছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই। আসলে এ-কথা কোন কবিতা নয়। বরং সেকথা এক বিভীষিকা। রাজিয়া ছটফট করতে থাকে। ঘুমাতে পারে না।

॥ চোদ্দ ॥

ঘুমাতে পারে না মবিন। ছটফট করতে থাকে। আন নেমাও হাবালাসিত শায়াতিন। হাসীদ। মেয়েরা শয়তানের ফাঁদ। রাজিয়ার রূপের মধ্যে সেই ফাঁদ পাতা আছে। নারীকে ধরেই শয়তান মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। নারী হচ্ছে ছিদ্র। সীতাহাটিতে হাজী নিসার হোসেনের মৃত্যুর দিন রাজিয়ার দুটি বিষণ্ণ মধুর চোখের ছটায় সজ্জিত সৌন্দর্যে যে করুণঘন রূপ-ন্যাস দেখেছিল মবিন, তা ভোলার নয়। রিয়াজের লাইব্রেরিতে সেই মেয়েকেই দেখেছে আরো বিপজ্জনক। সংসারে এমন কিছু মেয়ে থাকে, যাদের বেঁচে থাকার মধ্যেই কেমন এক অবৈধতার গন্ধ তৈরি হয়ে আশ্চর্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তারা বেশ্যা নয়। বেশ্যা-কল্প। তাদের কি সামাজিক বেশ্যা বলা যাবে ? আবার এমন যে ঠিক সে বেশ্যাও নয়। আধুনিক গদ্য-কবিতার মতো কোথায় গদ্য আর কোথায় কবিতা যেমন নির্ণয় করা শক্ত, অথচ অনুভব করা যায়। তেমনি রাজিয়া কোথায় বেশ্যার মতন প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু কেমন যেন অবৈধ মনে হবে। মনে হয় মবিনের। আজকার কবিতার মতনই দুর্বোধ্য সেই প্রবৃত্তি আড়াল হয়ে রাজিয়ায় বিরাজিত। অথচ সাধারণ সে নয়। সাধারণ বেশ্যা নয়। খুবই উন্নত এক অবৈধ চূড়ায় তার সামাজিক অধিষ্ঠান। সাধারণ পাঁচজনে রাজিয়াকে খারাপ মনে করে, কিন্তু সেই মনে করার সপক্ষে যেসব যুক্তি আর বিশ্বাস ও অনুমান একত্রিত করা

হয়, তা দিয়ে আসলে রাজিয়ার অবৈধ উচ্চ চূড়াটিকে স্পর্শ করা যায় না। মবিন সেখানেই নিজেকে অসহায় মনে করে। এক কথায় খারাপ বা মন্দ মেয়েছেলে বলতে পারলে সমস্যা শেষ হয়ে যেত। যেমন আধুনিক কাব্যকে কবিতা নয় বলে ঘোষণা করে শান্তি লাভ করা যায়। অনেকে করেন। তেমন হলে কথা ছিল না। কিন্তু কবিতা নয় বলার পরই সমস্যা শুরু হয়। তাহলে আজকের কবিতা কী ? কাকে বলব আজকের কবিতা ? তাহলে বলতে হয়, কবিতা বলে আজ কিছু নেই। কিন্তু তেমন করে বলা তো যায় না। এ-যেমন এক সমস্যা। রাজিয়াকে কেন্দ্র করে ঐ ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে মবিন। সতী নারী বলা যাচ্ছে না। বেশ্যা বলা যাচ্ছে না। সাধারণ বলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ মন্দ মেয়ে ছোটলোক বলেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। মনের মধ্যে অকারণ এক উচ্চ অশ্লীল অবৈধ ধারণার সঙ্গে মিশে আছে কেমন এক তীব্র কামনা। তা শুধু রূপেরই আকর্ষণ নয়। বাড়তি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে। কবিতারই মতন। রহস্য আছে। সেটা বর্ণনার অতীত। জীবন তা সহ্য করতে পারে না। অস্বীকার করতেও পারে না। শয়তানের ফাঁদ কি এমনই করুণ ? তাহলে এখন কী হবে ?

মিল্লাতের জন্য বড়ই মায়া হয়। নবীনা কথা দিয়েছিল, ভাইয়াকে শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্ত করে যাবে। কিন্তু নবীনা আসলে কতখানি কী করতে পেরেছে বোঝা যাচ্ছে না। কোন চিঠিপত্র লিখল না। কোন খবর দিল না। মবিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ল পায়ে পায়ে। খানিক দূর হেঁটে আসার পর রিকশা ধরল।

মবিনকে এই ভোরে রাজিয়া এভাবে উপস্থিত হতে দেখবে কল্পনা করেনি। ঘরে ধূপবাতি পুড়ছিল। সফী তার শস্তা রেডিওখানা রাত্রে রাজিয়াকে দিয়ে গেছে। রেডিও-য় এইভোরে ঢাকা থেকে নজরুল-গান বাজছে খুব মৃদু গলায়। টেবিলে রেডিও গেয়ে চলেছে—'আমার যাওয়ার সময় হল, দাও বিদায়।' এবং গাইছে—'অন্ধকারে এসেছিলেম থাকতে আঁধার যাই চলে।' ঠিক ঐ পংক্তি যখন দ্বিতীয়বার গাইছে শিল্পী তখনই ঘরে প্রবেশ করে মবিন। ঘরে রেডিও ছাড়া কেউ নেই। বাথরুমে স্নান করার শব্দ কানে এসেছিল। মবিন খাটে এসে বসে। আশ্চর্য হয় মিল্লাত নেই। একটু বাদে স্নান-স্নিগ্ধ রূপসী রাজিয়া ঢুকে এসে চমকে ওঠে। তোয়ালেয় মাথার চুল জড়ানো। কেবল শাড়িতে গা-ঢাকা। মবিনকে দেখে শুধু বিস্ময়-বিদ্ধ 'আপনি' উচ্চারণ করে চুলে জড়ানো তোয়ালে ছাড়িয়ে নেয়। মবিন বলে—মিলু কোথায় ?

রাজিয়া তোয়ালেয় চুল মুছতে মুছতে জবাব দেয়—আমি ওকে তাড়িয়ে

দিয়েছি। চলে গেছে। কথাটা বলে ফেলে রাজিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য বাঁকা করে মবিনের চোখে চায়। লক্ষ করে মবিনের চোখ রাজিয়ার দেহের কাপড়ে ঢাকা আচ্ছন্নতায় অনতি লুক্কাইত রেখাগুলি খুঁজছে। রাজিয়া সতর্ক হয়ে গায়ের কাপড় টেনে নেয়। টেবিলের দিকে দূরত্ব রচনার জন্য সরে যায়। মবিন রাজিয়ার চোখে চোখ তোলে। প্রশ্ন করে—তাড়িয়ে দিলেন কেন ? ভারি অন্যায় করেছেন !

রাজিয়া বলে—উপায় কী বলুন ! ওর যে বসন্ত হয়েছে !

—বসন্ত হয়েছে !

—হ্যাঁ !

—তবু আপনি তাড়িয়ে দিলেন !

—দিলাম ! কী করব ? আমারও যদি হয়ে যায়। আমি আমাকে খুব ভালবাসি। মুখে যদি দাগ হয়, নিজেকে তখন ভালবাসতে কষ্ট হবে। সহ্য করতে পারব না।

মবিনের সহসা মাথা গরম হয়ে যায়। খাট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। ঘৃণায় দুই চোখে অগ্নি ক্ষরিত হয়ে পড়ে। কুঁচকে যায়। মবিনের এই পীড়িত বিকৃত অবস্থা উপভোগ করে রাজিয়া। মবিন এত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে যে তার মুখ দিয়ে কেমন এক দুর্বোধ্য অর্থহীন আর্ত শব্দ বার হয়। একটু নিজেকে সামলে মবিন বলে— এই অপমানের জবাব আমি দিতে পারি ! মনে রাখবেন, এই বাড়ি মিলুরই হক্ ছিল। আপনি নির্লজ্জের মতন আমার বন্ধুর 'হক্' পয়মাল করেছেন।

—করেছি। বেশ তো। এখন কী করবেন ?

—মিলুকে এখানে নিয়ে আসব। কেমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন একবার দেখতে চাই। দেখতে চাই আপনার রূপের দেমাক থাকে কোথায়, কী করেন আপনি। ছিঃ ছিঃ !

—ঘেন্না ?

—নিশ্চয় ঘেন্না করি !

—বেশ তো ! নিয়ে আসুন না একবার ! আমি পুলিশ ডাকব। বলব, আপনারা জোর করে আমার বাড়িতে একটা বসন্তের রুগীকে তুলে দিয়েছেন !

—ছিঃ ছিঃ !

—সে আপনি যত খুশি ছিঃ ছিঃ করুন, আমার কিছু যায় আসে না।

—ছিঃ !

মবিন প্রবল ঘৃণায় ছিঃ করে দেয়। দাঁড়ায় না আর। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শুনতে পায়, রাজিয়া হি হি করে গলা ফাটিয়ে হাসছে।

রাস্তায় নেমে রিকশা ধরে সোজা মবিন রিয়াজের বাড়ি এসে ওঠে। মশারির মধ্যে শুয়ে আছে মিল্লাত। ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে টেবিলে কনুই রেখে গালে হাতের পাতা মেলে থুতনি ধরে খোলা বই দেখছে রিয়াজ। অত্যন্ত গম্ভীর। পায়ে চটির শব্দ করে ঘরে ঢুকেছে মবিন। রিয়াজ ঘাড় তুলে একবার ওকে দেখে নিয়ে ফের বইয়ের পাতায় চোখ মেলে দিয়েছে। চৌকির মশারির মধ্যে বালিশের কাছে এবং মশারির বাইরে টুলের উপর কিছু ফলমূল রয়েছে। অর্ধভুক্ত কমলা বালিশের কাছে অপেক্ষমান। সবই এক পলকে দেখে নেয় মবিন। তারপর রিয়াজের কাছে এসে অন্য চেয়ারখানিতে বসে। পরে সেটি টেনে এনে মিল্লাতের মাথার কাছে আসে। মশারি তুলে চেয়ে দেখে বন্ধুকে। মিল্লাত ঘুমন্ত। মশারি ফেলে দেয়। এবং কথা বলতে শুরু করে। মবিন বলে—শেষ অব্দি তাড়িয়ে দিল। অবিশ্যি আমি খুব অবাক হইনি।

—কার কথা বলছ? রিয়াজ থুতনি আর গাল ছেড়ে ঘাড় ঘোরায়। মবিন বলে—আর কার কথা। আমি রাজিয়ার কথাই বলছি। এত স্বার্থপর দেমাকী নোংরা মেয়ে তোমার কাছে সম্মান পায় কেন আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। বসন্ত আজকাল এমন কিছু ফেটাল নয়। অথচ তারই ভয়ে বেচারিকে পথে নামিয়ে দিয়েছে। কেন চলে এল, মিলু তোমাকে বলেনি? ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! আর কেন তাড়িয়ে দিয়েছে জানো, পাছে ঐ নোংরা মেয়ের বসন্ত হয়ে রূপ নষ্ট হয়। অবিশ্যি সৎমা এর বেশি কতটুকুই বা সৎ!

রিয়াজ ফের গ্রন্থে মনোযোগী হয়। কোন কথা বলে না। মবিন আশ্চর্য হয়, রিয়াজ তার কথায় কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। বলে—মিলু তোমাকে বলেনি কেন সে চলে এল?

—বলেছে! রিয়াজ আস্তে করে বলল।

—কী বলল তোমাকে?

—ওখানে থাকা গেল না!

—কেন?

—কারণ থাকা যায় না।

—আর কিছু? কেন থাকা যায় না বলল না?

—না।

—আশ্চর্য! তুমি শুধালে না কেন থাকা যায় না।

—সে তো আমি জানি।

—কী জানো তুমি ? কী সাংঘাতিক মেয়ে, তুমি কল্পনাও করতে পারো না। বলে কিনা ঘাড় ধরে পথে নামিয়ে দেবে যদি আমরা বসন্তের রুগী নিয়ে ওর কাছে যাই। পুলিশ ডাকবে। ভাবতে পারো ?

—তাই বলল নাকি ?

—হ্যাঁ। আমি কেবল বলেছিলাম, মিলুকে তাড়িয়ে দিলে ? আমরা যদি জোর করে তুলে দিই হাজীর বাড়িতে ? ব্যস ! কী রোখ ! বুঝলে রিয়াজ, খুব সাধারণ মেয়ে। লো, ভেরি চীপ্‌ ! ওর সান্নিধ্য থেকে মিলুকে রক্ষা করা দরকার। আর সমবেতভাবে ঘৃণা করা উচিত। আমার কথা তুমি কখনও বুঝতে চাইলে না।

রিয়াজ বলল—আস্তে। ঘুম ভেঙে যাবে। সারারাত কষ্ট পেয়েছে। বসন্ত যেমনই হোক, যন্ত্রণা খুব। চলো বাইরে গিয়ে কথা বলি।

রিয়াজের কথায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হয় মবিন। কথা না বলে দু-জনেই বাইরে আসে। বাইরে বারান্দায় বেতের সাদা চেয়ারে দু-জন মুখোমুখি বসে। রিয়াজ বলে—শোনো। আমার একটা সিদ্ধান্তের কথা বলি। মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। হিন্দু বন্ধুদেরও সমস্যাটা বুঝিয়েছি। ওরা সব একমত হয়েছে। রসুলের সমাজে গোড়ায় সৎ মাকে বিয়ে করা বাপের মৃত্যুর পর নিন্দনীয় ছিল না। রসুলই সেটা অবৈধ ঘোষণা করেন। এবং বিয়ের ব্যাপারে একটা নীতি নির্ধারণ করেন। চৌদ্দটি ক্যাটেগরি ঠিক করে দেন। বলেন, এই চোদ্দটি ক্যাটেগরির বাইরে বিয়ে করতে হবে। রাজিয়া সেই চোদ্দ নারীর মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে ওদের সম্পর্ক কোথাও অসুন্দর মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখেছি, এ সমস্যা অভূতপূর্ব। সৎ মা সম্পত্তি বলে বিয়ে করতে হবে, তা ঠিক নয়। বিয়ে করতে হবে, কারণ রাজিয়া সৎ-মা নয়। বাপের বা অন্য কারো সম্পত্তি নয়। পরিবারের সম্পত্তি নয়। বরং সে মিলুর প্রেমিকা। আর এই সম্পর্ককে রিকগনাইজ করা আমাদের পক্ষে শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। তার জন্য একটা মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডল দরকার। বসন্ত হয়েছে, অথচ রাজিয়া মিলুর কাছে আসতে পারছে না কেন, আমাদের ভাবতে হবে। এই অবস্থায় আমরা যদি একটু কষ্ট পেতে শিখি, তাহলে বোধহয় ভাল হয়। আমাদের প্রত্যেকের একটা লফ্‌টি ভ্যালুজের স্বপ্ন থাকা উচিত, যেখানে প্রেমই বড় কথা। কী বল তুমি ?

মবিন হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমি বলি,

তুমি একটা মস্ত পাগল। পারভার্টেড। যা বলেছ, মনের মধ্যেই রেখো, বাইরে প্রকাশ কোরো না। খুন হয়ে যাবে। একটা সামান্য মেয়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে। তুমি সমস্যাকে জটিল করে তুলেছ। তোমার পাপে মিলু পুড়ে মরবে। এ জিনিস ক্ষমা করা যায় না। আমি চললাম। কাকে তুমি প্রেম বলছ রিয়াজ ? মবিন দ্রুত ঘর ছেড়ে পথে নেমে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে। থামে না। মিল্লাতের আচ্ছন্নতা কেটে যায়। চোখ খুলে সে রিয়াজকে খুঁজতে থাকে।

রাজিয়া অপেক্ষা করছিল। তার অবুঝ মন ভেবেছিল, মিল্লাত ফিরে আসবে। মিল্লাতকে জোর করে প্রবল ধাক্কায় ফিরিয়ে দেবে মবিন। সে তাই দেহে মনে আশ্চর্য রকম প্রস্তুত হয়েছিল। অলংকার আর শাড়ি ব্লাউজ রঙে গন্ধে সুসজ্জিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। মবিনকে সে দেখাতে চেয়েছিল এইসব সাজ-সজ্জা রঙ গন্ধ অহংকারই তার ধ্যান, সে কারো নয়। অতএব এই নোংরা মোহময়ী নারীব উপেক্ষায় মবিনের বন্ধু বড় নিরাপদ থাকবে। আসলে সে সৎমা। নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। আর তাছাড়া মিল্লাতের প্রতিও তার এক বিচিত্র অভিমান হয়েছিল। সে যেন মিল্লাতকেও দেখাতে চেয়েছিল, দ্যাখো তোমার কথাও আমি মোটে ভাবি না। কোন কষ্ট নেই আমার। আসলে সে এইভাবে অলংকৃত হয়ে নিজেকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছিল। কেউ বুঝবে না কেন সে এই ধারা অলংকার পরেছে। এবং এইসব পরে রাজিয়া জীবনের অতীত আর বর্তমানের ট্রাজেডিকে সশরীরে অনুভব ও অভিনয় করছিল। সে কথাও কেউ বুঝবে না। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গেছে, অসুস্থ মানুষটি ফিরে আসেনি। গায়ের অলংকার এক সময় রাজিয়ার গায়ে ভার হয়ে চেপে বসেছে। প্রতীক্ষা যেন একটি শিরার মতো টান টান হয়ে টেনে ছিড়ে দিচ্ছে সময়। প্রতিটি মুহূর্ত। মিল্লাত ফিরছে না। মবিনের ঘৃণিত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠছে না। দেখা যাচ্ছে না চোখের বঙ্কিম ঘৃণার শর ক্ষেপণের অগ্নিপাত। কেউ আসছে না। এমন সময় রিয়াজ এল। রিয়াজ ঘরে ঢুকেই হতভম্ব হয়ে গেল। রাজিয়া শুধাল অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে,মবিন কৈ ? আসবে না ? আসলে সে শুধাতে চেয়েছিল মিল্লাত কেন এল না। কিন্তু সেকথা বুঝবে কেন মানুষ ? রিয়াজ যত দূর বুদ্ধিমান প্রাণীই হোক, তার সব নাটক দেখা নেই পৃথিবীর। মানব মনের সমস্ত ছলনা তার জানা নেই। সে অত্যন্ত বিস্মিত আর আহত হয়। তার 'লফ্‌টি ভ্যালুজের' চূড়া ধ্বসে পড়ে। সে ভাবতে থাকে, এসব সে কী দেখছে ? কেমন দেখছে ? কোথায় কী ঘটে গেল। একদিকে পীড়িত প্রেম স্পর্শ কামনা করে, অন্যদিকে সেই প্রেম

অলংকার পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পালিয়ে যায়। আশ্চর্য পতন হয় তার। গলিত কর্দমে পুঁতে যায়। রিয়াজ আর সহ্য করতে পারে না। কাকে তুমি প্রেম বলছ রিয়াজ! কথাটা কানে চপেটাঘাত করে। তার শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে যায়। ভাবে, রাজিয়া অত্যন্ত শস্তা মেয়ে। লোভী। ঠিক কথা। অত্যন্ত নীচু রুচির বিধবা। মবিনের কথা সে এখন বুঝতে পারে। এ মেয়ে সত্যিই তবে মিল্লাতকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর এদিকে মবিনের জন্য অপেক্ষা করছে। ঘর খালি করে দিয়েছে। এইভাবে মুসলমান বিধবারা বেশ্যা হয়ে যায়। স্খলিত হয়। বুকের ভেতরটা রিয়াজের হু হু করে ওঠে। দুই চোখে আশ্চর্য ঘৃণা মিশ্রিত করুণা জেগে ওঠে। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল মেঝের মাঝখানে রিয়াজ। ঘুরে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। রাজিয়া ব্যাকুল হয়ে বলে—আপনি বসবেন না? চলে যাচ্ছেন কেন?

রিয়াজ বলে—তোমাকে আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে রাজিয়া। তোমাকে একটা আন্দোলনের কথা বলেছিলাম, সেটা খতম হয়ে গিয়েছে। মবিন নিশ্চয় আসবে। তবে বিয়ে তোমাকে ও করবে না।

—জানি।

—জানো? জেনেও এই করছ?

—কী করছি আমি? আমি তো......

—তাহলে না জেনেই সব করছ? দেহের খিদে এইভাবেই মানুষকে মাথা খারাপ করে দেয়। কত আর নিজেকে দমন করে রাখবে! দোষ খুব ছিল না তোমার। চলি।

—এসব কী বলছেন আপনি! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। চলে যাবেন না, শুনুন! একবার বলুন, মিল্লাত কেমন আছে। বলে যান আমাকে।

তীব্র আকুলতায় পিছু পিছু সিঁড়ি অব্দি ছুটে আসে রাজিয়া। রিয়াজ দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নামে। বলে—আমার কাছে আছে। ভালই আছে। আপনার যাওয়ার দরকার নেই সেখানে। ভেবেছিলাম ডেকে নিয়ে যাব। কিন্তু এভাবে অলংকার পরে ওর কাছে যাবেন না। আপনার বসন্ত হতে পারে।

বাড়ির বাইরে রাস্তায় নেমে চলন্ত রিকশা ডেকে উঠে পড়ে রিয়াজ। ফিরেও দেখে না। ধীরে ধীরে পৃথিবীতে সন্ধ্যা হয়। রাত হয়। লোডশেডিং হয়। রাজিয়ার ঘরে মোমবাতির শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। কালো চোখের অন্ধকারে সাদা শিখা ছায়া কাঁপায়। গালের এক পাশে অন্ধকার ছেয়ে থাকে। অন্য পাশে উদ্ভাসিত। কোলের উপর গহনার বাক্স। সব অলংকার সে বাক্সে ঢুকিয়েছে।

কোলে করে অসহায়ভাবে বসে আছে। বুক জোড়া তার আশ্চর্য অভিমান। দুই চোখে তার বাষ্পাকুল কান্না থমথম করছে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সে পারছে না। কারণ সেই কান্না নিজেকে শোনাতেও তার এখন ঘৃণা হয়। ভয় করে। দাদীমা তাকে এই অলংকার একদিন তার গায়ে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—তুই আমার মিল্লাতের গিন্নি। সব তোর। তোকে দেব। সব দিয়ে দেব। সেই দৃশ্য অবিকল চোখের সামনে উঠে আসে। মোম পুড়ে যেতে থাকে। হঠাৎ এক বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ডেকে ওঠে, ফুলবউ!

রাজিয়া চেয়ে দেখে এদিক ওদিক। কোথাও কেউ নেই। সব শূন্য। বাইরে অন্ধকার। মনে মনে বলে রাজিয়া—আমার বসন্ত হবে। ঠিকই তো ! আমি কখনও যাব না। রিয়াজজী, আমি কখনও যাব না তোমাদের কাছে।

—ফুলবউ ! আবার বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় রাজিয়া। ভয়ে সে আর্তনাদ করে ওঠে—সফী ! সফী ! সফী !

কেউ সাড়া দেয় না। কেউ ছুটে আসে না। আকাশে ক্রমশ মেঘ জমতে থাকে। হাওয়া ওঠে। আকাশ থেকে তারকারা লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

পরের দিন ভোরবেলা মবিন সীতাহাটি পাড়ি জমায়। তার সামনে এখন অনেক কর্তব্য তৈরি হয়েছে।

রিয়াজ ভাবতে চেষ্টা করে, রাজিয়া কেন ঐভাবে অলংকার পরেছিল। এই দৃশ্য রিয়াজ বিশ্বাস করতে পারে না। ঘৃণায় সে কুঁচকে ওঠে।

॥ পনের ॥

আকাশে মেঘ জমেছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। সকাল থেকে রাজিয়া ভেবেছে, সমস্ত ঘটনার জন্য সে নিজেই দায়ী। যতবারই মবিন তার সামনে আসতে চায় ততবারই সে কেন অলংকার পরে নিজেকে ঠাট্টা করতে ভালবাসে ! মবিন তাকে ঘৃণাই তো করবে। মবিনের কাছে শ্রদ্ধা দাবী করা বৃথা। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন আকর্ষণ জাগিয়ে মবিনকে সে তার পায়ের কাছে তৃষ্ণার্ত অঞ্জলি পেতে নতজানু ভিখিরি করতে জেদ পোষণ করেছে বার বার। রিয়াজ সেকথা জানবেন কেমন করে ? অথচ মনে হত রিয়াজ সেকথা বুঝতে পারেন। কিন্তু গতকাল সেই একই সৌন্দর্যের আশ্চর্য অদ্ভুত পরাজয় ঘটে গেল ! রিয়াজ বুঝতে চাইলেন না। বুদ্ধিমান মানুষরাও কী অদ্ভুত ভুল করতে পারেন। অলংকার পরে নিজেকে রাজিয়া মিল্লাতের পর কিনা বোঝাতে চেয়েছিল মবিনের চোখে। কিন্তু রিয়াজ

তাকে স্বার্থপর নোংরা মেয়ে ভাবলেন, এ যে বড়ই দুঃসহ বেদনার কথা। এ-ভুল ভাঙাবার দায়িত্ব রাজিয়ারই। তথাপি তার ভয়নাক অভিমান হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, রিয়াজ কেন বিভ্রান্ত হবেন ? তিনি তো অনেক বড় মানুষ। রাজিয়া ভেবেছিল। সেই ভোরে রিয়াজ মিল্লাতকে শুধাল—তোমায় কি রাজিয়া তাড়িয়ে দিয়েছে মিলু ? চলে এলে কেন ? ওকে কি একবার ডেকে আনব ?

মিল্লাত গম্ভীর আর বিষণ্ণ গলায় জবাব দিল—না। কেন আনবে তাকে। ধরো সে আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে। দেবে না কেন ? আমার তো ঐ বাড়িতে কোন অধিকার নেই। চলে আসা আর তাড়িয়ে দেওয়া একই কথা। তার কাছে এভাবে পড়ে থাকতে আমার লজ্জাই করছিল।

রিয়াজ প্রশ্ন করল—তোমায় কি সে ভালবাসেনি ? তোমার অসুখ। তার কোন কষ্ট হয় না ?

মিল্লাত ক্ষীণ হেসে বলে—ওর কষ্ট হয় কিনা জেনে কী লাভ ? বসন্ত খারাপ জিনিস। ওরও যদি হয়, সর্বনাশ হবে। মবিন ওকে রূপের খাতিরেই বিয়ে করতে চায়। সেই রূপ চলে গেলে আমি মস্ত দায়ী হব রিয়াজ। বলা তো যায় না জনগণের মা শীতলা কাকে কতখানি দয়া করে। ধরলাম আজকাল তেমন কিছু হয় না, কিন্তু যদি রাজিয়ার বেলা আলাদা কিছু হয়। আমার বড় ভয় করছিল। রাজিয়া যেমন করছিল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাজিয়া কেমন করছিল রিয়াজ আর জানতে চাইল না। অথচ সেকথা জানতে চাইলে মিল্লাত আজ সব মনের কথা বলে দিত। বসন্তে বিকার হয় মানুষের। তখন মনের গোপন বাসনার কথা বলে ফেলা যায়। মিল্লাত বলত—রাজিয়া কেমন করছিল শুনবে ? এই বুকের ওপর সে হাত রেখেছিল। বার বার বুকের কাছে ঘেঁষে আসছিল। ও নিজে থেকে আমার হাতখানা ধরে আঙুলের ফাঁকে এই গোড়ায় বসন্ত দেখল। সমস্ত মুখে ভেসে উঠেছিল মাতৃত্বের সঙ্গে প্রণয়ীর ঘন সমবেদনা। সেই শাস্তির কথা কাউকে তো বলে বোঝানো যায় না। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না রিয়াজ।

অথচ রিয়াজ চুপ করে গেছে। কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা করছে না। মিল্লাতও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল।

সমস্ত দিন ছটফট করে কাটল রিয়াজের। তার কেন যেন বার বারই মনে হচ্ছিল,কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। আরো একবার রাজিয়ার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল। অথচ দেখা করে বোঝা কি যাবে, রাজিয়া মিল্লাতকে সত্যিই ভালবেসেছিল কিনা। কিংবা হঠাৎ তার মনটা কীভাবে লোভী হয়ে উঠল। কেন

সে জীবনের কাছে এভাবে আপোস করতে চাইছে। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত্রি আটটার দিকে আজও মেঘ উঠেছিল। হাওয়া বইছিল। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। এই অবস্থায় রাজিয়া এল রিয়াজের ঘরে। রাজিয়া সব বিভ্রম দূর করতে চেয়েও অভিমানবশত কিঞ্চিৎ অন্য আচরণ করে ফেলল। মশারির একপাশ উঠিয়ে মিল্লাতের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। হাতে ধরা ছিল তার গহনার বাক্স। সেটি মিল্লাতের মাথার কাছে রেখে বলল— রুক্মিণীকুমার, তোমার জিনিস তোমাকে ফেরত দিচ্ছি। ভারি কষ্ট দিচ্ছিল আমাকে। সবাই ভাবছিল আমার খুব লোভ। আমি সবার কাছে ছোট হয়েছি মিল্লাত। যে-আদর রিয়াজজী করেছিলেন, সব মিথ্যা হয়ে গেছে। সব পাপ ঐ বাক্সের মধ্যে জমা ছিল। আমি আর ছোট হতে পারি না। ফিরিয়ে নাও। যেমন রেখেছিলে তাই রেখো। ঐ গহনা তোমাকে পর করে দিয়েছে। কিন্তু সে কথা মবিনকে বোঝানো গেল না। রিয়াজজী বুঝলেন, মবিন তা বুঝল না। চেষ্টা তো করেছি মিল্লাত। পারিনি। তোমার বন্ধু আমাকে নেবে না। আবার তোমার কাছেও রিয়াজজী পাহারা বসিয়েছেন। আমি যে তোমার পর গো। ছুঁয়ো না আমাকে। আমার রূপ নষ্ট হয়ে যাবে।

বলতে বলতে ডুকরে উঠল রাজিয়া। হঠাৎ সে কান্না দমন করে চেয়ারে বসে থাকা রিয়াজের দিকে ফণা তুলে বলল—একলা একটা মেয়েকে ফেলে চলে এলে তোমরা। একটা সামান্য রোগ তোমাদের আপন হল। একলা একটা মেয়ে যদি এখন কোন বিপাকে নষ্ট হয়, তার দায় কে কাঁধে নেয় বলুন। তাকে তো গহনা পরে বর্ম বানাতে হয়। অলংকার কি শুধুই অলংকার রিয়াজজী? আর কিছু নয়? ফের তার খোঁচায় কি রক্তও ঝরে না?

অবস্থা দেখে মিল্লাত উঠে বসে রাজিয়াকে স্পর্শ করে। রাজিয়া আঁতকে তোলে নিজেকে। বলে, খবর্দার ছুঁয়ো না আমাকে। তোমরা ভাবো নিসার হোসেন মৃত। আমি তা ভাবি না। ছুঁয়ো না। পাপ হবে। যদি সে আমাকে আজও চায়, আমার সর্বস্ব তাকেই দেব। ফেরেস্তা আজও চোখের পানি ফেলছে। আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। কী গো, হাত বাড়াও এদিকে একবার। দেখি কেমন সাহস।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাজিয়া। ঘর ছেড়ে এসে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টি শুরু হয়। বাড়িতে পৌঁছে দেখে বারান্দায় একটি প্রেতাত্মা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। প্রেতাত্মা একটু দূরে সরে যায়। মনে হয় চোখের ভুল। অন্ধকারের মূর্তিটা অন্ধকার ছাড়া কিছু নয়। কেউ

নয়। ঘরে ঢোকে রাজিয়া। সুইচ টেপে। আলো হয়।

ভেজা কাপড় জামা ছাড়তে ছাড়তে দরজার কাছে এসে বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখে নেয় মূর্তিটা মানুষ কিনা। চোখের ভুল কিনা! হঠাৎ সেই কালো মূর্তি ঘরের আলোয় চলে আসে। দরজা বন্ধ করে দেয় দ্রুত হাতে। খালি গা রাজিয়াকে আচমকা কোলে পাঁজা করে তুলে এনে খাটে ছুঁড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। বাইরে প্রবল গর্জনে বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘ ডাকছে। বাতাসে শাঁই শাঁই শব্দ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। রাজিয়া চোখ বুঁজে দেখতে পাচ্ছে গনগনে আঁচ। ফুটন্ত চায়ের কেৎলি। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সেই হাহাকার গর্জন মুখর রাত্রির অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। তখন শুনতে পায় রাজিয়া—খালাস নাই। দিব না মুই। না রে নাঃ। দিব না। সেই রাতে যা দিলি নে মালকিন, সেই ভুখ নিয়ে বেঁচে আছি। মরিনি। আল্লাজী তোর কসুর মাফ দ্যান নি, মোনাজাত কবুল করেছেন। তোর জন্য পুলসেরাতের পথ সাফা হচ্ছে রিজিয়া। সব পাপ তোর ধুয়ে যাচ্ছে রূপসী! কাঁদিস না। তোর মুক্তি, কোথায় কে জানে না। হাদীস কোরান জানে না। জানি কেবল আমি। আমিই সেই মরহুম স্বামী। ফুলে ফুলে কাঁদে না বিবিজান। শান্ত হ। অত ছটফট করলে গলা টিপে দোব'! ওরে রাবিশ কুকুরী! ঠাণ্ডা হ। ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে দে। জ্বালাস নে। প্রবল হাওয়া আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ঝাপটায়। পৃথিবীর উথাল-পাতাল-করা আর্ত গোঁ গোঁ শব্দ শুনছে পৃথিবী নিজেই। রাজিয়ার তাবৎ দেহ নিষ্পেষিত হচ্ছে প্রেতাত্মার কবলে। রক্ত কণিকায় ছুটোছুটি করছে বিপন্ন সেঁকো বিষ। চৈতন্য শিথিল হয়ে অন্ধকারে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই স্থূল দেহ ছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি সম্মান নেই। জীবনের তাবৎ আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হচ্ছে আজ। কেন এই জীবন, কেন এই রূপের মাতলামি, কেন ভালবাসা, কী সেই ধর্মবোধ মানুষের, এই জীবনই বা কোথায় যেতে চেয়েছিল, সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ হয়ে যায়, সব ফুরায় এই রাত্রির গভীরে, বিলীন হয়। প্রবল অস্তিত্বে শুধু এই দেহই তবু বেঁচে থাকতে চায়।

প্রেতাত্মা রাজিয়ার বুক থেকে নেমে ঘর ছেড়ে বারান্দা ছেড়ে বৃষ্টির মধ্যে চলে যায়। রাস্তায় নামে। হাঁটতে শুরু করে। টলতে টলতে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সেই আলোয় লোকটিকে অস্পষ্ট চিনতে পারা যায়। ভীষণ মাতালের মতো লোকটি পথ হেঁটে চলেছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া রিকশা নেই। পথচারী নেই। শুধু প্রবল বৃষ্টি লাফাচ্ছে। লোকটি সীতাহাটি গিয়েছিল। লোকটি মবিনের বাড়ি ঢুকে গেল। কাপড় ছাড়ল। মাথা

গা সর্বাঙ্গ গামছায় মুছল। পোশাক বদলালো। নানী এগিয়ে এলেন কাছে। মেঝেয় বসলেন। শুধালেন— কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

মবিন উত্তর করল না। এক সময় নানীর পাশে ঘনিষ্ট হয়ে বসল। বলল— রাজিয়ার কপাল খারাপ নানী।

নানী চুপ করে রইলেন। মবিন সহসা নানীর কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল—নানী, আমি ঢের পাপ করেছি নানী। ক্ষমা নেই···

সকাল হল। বৃষ্টি নেই। সব পরিষ্কার। রোদ টলটল করছে। রাজিয়া বালিশের কাছে একটানা দলিল দেখতে পায়। ভোরবেলায় এই সংবাদটুকু অপেক্ষা করছিল। দলিল। রাত্রির লোকটি রাজিয়ার সিথানে এই বাড়ির দলিলখানি সীতাহাটীর নবীনার কাছে থেকে বহে এনে ফেলে গেছে।

দলিলখানি পড়ে রাজিয়া।তাতে জমির দাগ নম্বর ও বিভিন্ন উপর নীচের ঘর সহ ছাতসহ বাড়ির উল্লেখ আছে। বেশ পুরনো দলিল। দাতা নিসার হোসেন বিশ্বাস। দানপত্র। আপন সন্তানকে তিনি দান করে গিয়েছেন। সেই সন্তান হল দ্বিতীয় পত্নীর প্রথম সন্তান মিল্লাত হোসেন বিশ্বাস। রাজিয়া দলিলখানি পড়তে পড়তে কোন বাজে প্রতিক্রিয়া হতে দেয় না। এক ফোঁটা বিচলিত করে না নিজেকে। খুব মনোযোগ দিয়ে বার বার পাঠ করে। এবং শেষে নিজেকে খুশি করে নিঃশব্দে ফুলের মতন হাসে। যেন সে কত কিছু জয় করে ফেলেছে। ঠিক তখনই রিয়াজের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মিল্লাত এসেছে। ঘরে ঢুকে আসে ওরা। তার আগেই দ্রুত হাতে রাজিয়া তোষকের তলায় দলিলখানি ঢুকিয়ে ফেলে। তার সর্বাঙ্গ শিথিল। বসন অসংবৃত। চোখে মুখে বিহ্বলতা। চোখের নিচে কালির আস্তরণ। পাগলীর মতন চাহনি। রিয়াজ ওকে দেখে শিউরে ওঠে।

মিল্লাত খাটে বসতে গিয়ে থমকে যায়। তামাম বিছানা বিপর্যস্ত। বিছানার চাদর জড়োসড়ো, কখনও এরূপ দেখা যায় না। খাট ছেড়ে রাজিয়া নেমে গেছে। বাথরুমে চলে গেছে। রিয়াজ ঘরের কোণের টেবিলের কাছে চেয়ারে এসে বসেছে। লক্ষ করছে মিল্লাত বিছানার চাদর টান টান করে টেনে দিচ্ছে। হঠাৎ রাজিয়া ঘরে ঢুকে এসে মিল্লাতকে বাধা দিয়ে বলে—দাঁড়াও। বসবে না। অত্যন্ত নোংরা হয়ে গিয়েছে। বসেই রাজিয়া খাটের চাদর উঠিয়ে নেয়। বলে—আপাতত নিচে বসো। স্নান করে এসে তোমার বিছানা করে দিচ্ছি। আমার গা বমি বমি করছে।

মেঝেয় মাদুর পেতে দেয় রাজিয়া। তারপর আলনা থেকে জামা-কাপড় ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে যায়। রিয়াজ ভাবতে চেষ্টা করে, রাজিয়া সারা রাত ঘুমায়নি। বিছানায় তোলপাড় করেছে। তাই বিছানার ঐ ছিরি হয়েছে। কেমন নোংরা করে রেখেছে নিজের শরীর আর বিছানা। কোন যত্ন নেই। এত কষ্ট চোখের সামনে দেখা যায় না।

স্নান করে রাজিয়া। ঘরে দু-জন চুপচাপ বসে থাকে। কোন কথা হয় না। রাজিয়া ফেরে। বাইরের তারে কাপড় মেলে দেয়। ঘরে এসে তোষকের তলা থেকে ভাঁজ করা ধোয়া চাদর টেনে বার করে। বিছানায় পাতে । মিল্লাতকে বলে, উঠে এসো। শুয়ে যাও। তুমি বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবে না।

মিল্লাত ওঠে। বিছানায় বসে। শোয় না। রাজিয়া খাটের একপাশে বসে বলে, বলুন রিয়াজজী ! আমাদের সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত করলেন ? আমরা একত্রে এইভাবে থাকব ?

রিয়াজ বলল, আমি চাইছি তোমরা চিরকাল এইভাবে একত্র থাকো। বিয়ে করো। আমি ব্যবস্থা করব। বা বিয়ে না করেও একত্র থাকতে পারো। আমি গুটিকয় বুদ্ধিমান যুবকের একটা পরিমণ্ডল রচনা করব, যারা তোমাদের ঘিরে থাকবে। যারা তোমাদের সমর্থন করে। তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে যারা সৌন্দর্য দেখতে পায়।

রাজিয়া বলে, বেশ। এই কল্পনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু সেই পরিমণ্ডল কাদের নিয়ে ? তারা কারা ? তারা কি মুসলমান ?

—হ্যাঁ। মুসলমানও কিছু আছে। আমি তাদের বোঝাতে পেরেছি। তারা বলছে, বিয়ে দিয়ে সমাজকে একটু আঘাত করা দরকার। একটা অন্যায়কে মুখ বুঁজে সওয়া যায় না।

রাজিয়া বলল, রুচিতে যদি সয়, আমরা তো দুজনে মিলে চুপচাপ বিয়ে করে নিলেই পারি, রিয়াজজী। পরিমণ্ডল কী দরকার। আপনি বোধহয় একটা সমর্থন চান। স্বীকৃতি।

—চাই।

কিন্তু, যারা সমর্থন করবে, তারা তো সমাজের কেউ নয়। সমাজ তো মবিনের। তারা বিদ্রোহ করবে। ঘৃণা করবে। আমাদের মারবে। তাড়িয়ে দেবে। তাদের ঠেকানোর শক্তি তো আপনার নেই। কেন মিছিমিছি একটা বাজে স্বপ্ন দেখছেন আপনি ! গতরাতে আমার সব আন্দোলন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি মবিনকে বিয়ে করব স্থির করেছি। একটু দাঁড়ান, চলে যাবেন না। চা করে

আনি।

রাজিয়া তোয়ালেটা টেনে নিয়ে চুল মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়। রিয়াজ লক্ষ করে মিল্লাতের চোখমুখ কালো হয়ে গিয়েছে। রিয়াজের বুকটা তীব্র বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। নিজেকে সহসা তার ভয়ানক অপরাধী মনে হয়।

রাজিয়া চা করে। ঘরে দুজন নির্বাক বসে থাকে। চা করে এনে দুজনের সামনে এগিয়ে দেয় রাজিয়া। বলে, একটু জুড়িয়ে নাও। চট করে মুখে তুলবে না। গরম করেছি খুব।

একটু থেমে রাজিয়া বলে, হ্যাঁ, শুনুন। ভাল কথা। গতরাত্রে আমি আর মবিন এই বিছানায় রাত কাটিয়েছি। আমি তোমার ভালবাসার শপথ করে বলছি মিলু, মবিন আর আমি এই বিছানায় একত্রে শুয়েছি। হ্যাঁ শুয়েছি। সব দ্বন্দ্ব মিটে গেছে। নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে রাখা বিষম বস্তু মিল্লাত। রাধারানী আর আয়েষা। লড়াইতে শেষমেষ কেউ একজন জেতেই। কী বলো তোমরা।

রিয়াজ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কী বলছ পাগলের মতো ?

রাজিয়া পানসে হাসে। বলে, পাগল তো আপনারাই। যা কল্পনা, অবাস্তব, অর্থহীন, তারই উপাসনা করেন। গাওনা করেন। কিসের সভ্যতা আপনাদের ? যা প্রাগৈতিহাসিক, ট্রাইবাল, পুরনো, সেইসব ? নিসারের সম্পত্তি বলেই আমি মিল্লাতের সম্পত্তি হতে পারি না। আমি কারো নই। আমি আমার। বাপ চেয়েছে পায়নি। ছেলে চেয়েছে, পাবে না। ব্যস। নাটক তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কৈ, চা খাচ্ছেন না কেন ? এসব কথা আপনিই বলেছেন বাপের সম্পত্তি মানে ছেলের সম্পত্তি। আরবে এককালে আমাদের মতন মা ছেলের বিয়ে চালু ছিল। তাই না ?

চায়ের কাপ মুখে তুলতে যাচ্ছিল রিয়াজ, আশ্চর্য বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়ে। চা খেতে কষ্ট হয়। তার চোখমুখের চেহারা ক্রমশ কেমন রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। অত্যন্ত ফর্সা মুখমণ্ডল অদ্ভুত করুণ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে যায়। 'একত্রে শুয়েছি' বলার যে নিরাসক্ত উচ্চারণ, তা যে কী নির্মম হয়ে বেজে উঠল রাজিয়ার কণ্ঠস্বরে, সেই প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা রিয়াজকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত করে তুলেছে মুহূর্তে। রাজিয়া নিঃসন্দেহে খুবই ভদ্র মেয়ে। তার শালীনতার মাত্রা অত্যন্ত উঁচু পর্দায় বাঁধা। কিন্তু সেই মেয়ের মুখে আজ এতবড় অশ্লীল কথা কীভাবে বার হল ভাবলে রিয়াজের তাবৎ চৈতন্য অবশ হয়ে আসে। রিয়াজের মনে হচ্ছিল, কী এক ক্রূর গ্লানি জমে যাচ্ছে মনের ভিতর। ঘটনা খুব অপ্রত্যাশিত। রাজিয়ার অপমান শুধু কোন ধর্ষণজনিত অপমান নয়। একত্রে শুয়ে থাকার লালসার

প্রহার নয়। রাজিয়া তার সৌন্দর্যকে ভালবেসেছিল তার নিজেকে এক স্বপ্নের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সে নিজেকে রাধারানী ভেবে এসেছে শুধু এক স্বপ্নের খাতিরে। সে ক্রমশ পৌঁছতে চাইছিল। ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে একটি দুর্গম চূড়ায় টেনে তুলছিল নিজেকে। আর সেই সাহস রিয়াজই তাকে দিয়েছিল। তার জীবনের গতিধারা অন্যভাবে নিরূপণ করতে চেয়েছিল রিয়াজ। একটি নির্মম সত্যের নিকটবর্তী করে জীবনের যে সংঘর্ষ আর উত্তরণ চেয়েছিল তাতে কোন পাপ ছিল না। পাপ নেই। একথা বলতে চেয়েছিল রিয়াজ। বলতে চায়। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে সব কথা আটকে যাচ্ছে কেন ? সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে যেন। গত রাত্রে রাজিয়ার দেহে এক পাপ প্রবেশ করেছে, যা শুধু ধর্ষণ নয়। ধর্ষণের সঙ্গে ধর্ম প্রবেশ করেছে। ভয় ঢুকেছে। অথবা যে ভয় ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে মরে আসছিল, তা ফের পূর্ণোদ্যমে জীবিত হয়ে উঠেছে। 'আমি সম্পত্তি হতে পারি না।' কথাটা কোন স্বাধীনতার কথা নয়। বরং কথাটা উল্টো। 'আমার কোন মুক্তি নেই। মুক্তি পাব না।' মবিন রাজিয়াকে নিটুট শক্তিতে বেঁধে রেখে গেছে। পালাতে পালাতে ধরা পড়ে গেল রাজিয়া। নিসার তাকে সেই কবে থেকে তেড়ে তেড়ে ফিরছে।

কনুই পুড়েছে তবু ত্রস্ত ভীত থ্যাঁতলানো রাজিয়া পালাতে পালাতে এসে কোথাও পৌঁছতে পারল না। তাই কি ? না। তা নয়। তা হতে পারে না। কিছুতেই তা হতে দেওয়া যায় না। রিয়াজ শক্ত হয়ে চোয়াল কঠিন করে তোলে। লজ্জা হয়, মবিন তার বন্ধু। মিল্লাতের বন্ধু মবিন। 'শোনো !' কথা বলার চেষ্টা করে রিয়াজ। চায়ে চুমুক দিয়ে রাজিয়ার নিস্তব্ধ বিষাদ আচ্ছন্ন করুণ মুখে চেয়ে থাকে। গলা তার ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে। স্বর ফুটছে না। আবার বলতে যায়, 'শোনো !' কথার বদলে শুধু ফোঁসানো শব্দ হয় গলার খাদে। অবাক। গলা ঝাড়ে। তারপর থেমে থাকে রিয়াজ। কপালে গলায় তার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে গেছে। হাত পা কাঁপছে।

হঠাৎ রাজিয়া আশ্চর্য প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা রিয়াজজী, ভাল করে গোছল (স্নান) করলে, নামাজ পড়লে কি দেহ শুদ্ধ হয় ? বিশ্বাস করুন, খুব খারাপ লাগছে আমার। আপনারা ঠিক বুঝবেন না, আমার কী হয়েছে ! মিলুকে গর্ব করে বলেছিলাম, আমি কোন পুরুষকে স্পর্শ করিনি। আর কখনও সেকথা বলব না। কেউ আমাকে খারাপ মেয়ে বললে কষ্ট পাব না। আসলে খাওয়া পরাই যেখানে সমস্যা, ঘর পাওয়ার সমস্যা, সেটা যখন মিটে গেল, তখন সতীত্ব খুব ছেঁদো কথা। সেই দাবী ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সতী হওয়ার লোভ

নয় রিয়াজজী, সেদিন মনে হয়েছিল, খুব শুদ্ধ মনে নিজেকে ভালবাসতে পারারও একটা দাম আছে। আমি সেটা চাইতাম। সেটা কি খারাপ? আপনিই বলুন?

রিয়াজ কথা বলতে পারে না। গলার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হয়। হঠাৎ কী হল, মিল্লাত সহসা সড়সড় করে সশব্দে খুব দ্রুত চা খেতে লাগল। সেই শব্দ শুনে, খাওয়ার দ্রুত ভঙ্গি দেখে দুজনেই চমকে উঠল। রিয়াজ ও রাজিয়া। মনে হচ্ছে মিল্লাত কেমন অসহায় রকম বিচলিত হয়ে উঠেছে। ফের রাজিয়া যেন আপন মনে বলে চলে, সতীলক্ষ্মী কে হতে চাইছে! যার কপালে লক্ষ্মীই অপয়া সে আর সতী থাকে কী করে? সেকথা হচ্ছে না। বলছিলাম, কুমারী মেয়েদের মনটা তো খুব শুদ্ধ হয়, ফুলের মতন হয়। সেই কথা। সেই মনটা আরো শুদ্ধ করে তোলার জন্য কোন পুরুষকে সে ভালবাসে, সেটা তো একধরনের পুজো। মনটা একটা কেন্দ্রে এসে জড়ো হয়। নামাজ পড়ার মতন ব্যাপার। আপনি একদিন বলেছিলেন, আরবে নাকি নবীর যুগেও উটকে পুজো করত মানুষ। সেকথা শুনে নবী বললেন, উটকে সিজদা করা হারাম। আল্লা ছাড়া কারুকে সিজদা করা যায় না। তবে সিজদা যদি করতেই হয়, আল্লা ছাড়া, মেয়েদের বেলা একটা হুকুম করতে ইচ্ছে হয়, মেয়েরা যেন তার স্বামীদের সিজদা করে। না তাও নয়। মেয়েরাও একমাত্র খোদাকেই সিজদা করবে। ইচ্ছে হয় যে বলি, স্বামীকে মেয়েরা সিজদা করুক। নবী সেই কথা বলতেন। তো, কুমারী মেয়েরা মনে মনে খোদা ছাড়া যাকে সিজদা একবার করে ফেলে, সেই তো দেবতা। তারই পুজো করে সে। ব্যাপারটা এমন কেন হয়? কারণ সেটা খুব দামী আর পবিত্র কাজ। আচ্ছা, এই মনের সঙ্গে সতীত্বের কী যোগ আছে বলুন! নেই। আমি বলছি, নেই। সেই মনকে যখন নষ্ট করে কেউ। বলুন, সেটা কি কোন পাপ নয়?

—পাপ। নিশ্চয় পাপ। কিতাবী ধর্মে সেটা গুনাহ্ কিনা জানি না। মানুষের ধর্মে সেটা নিশ্চয় পাপ। একশ বার। রিয়াজ দৃঢ় গলায় বলে উঠল।

মিল্লাত বলল, সেই মন আমার মায়েদের ছিল না রিয়াজ। আমার সমাজে সেই মনের কদর হবে না। সেই মন ভিনদেশী, আমি সেই মনকে চিনতে চাই না। তোমাকে খুব স্পষ্ট বলছি ছোটবউ,মন নিয়ে কখনও আর কথা তুলবে না। আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। নাটক শেষ হোক। সত্যিই হোক। আমি অসুস্থ। তোমরা কথা বলা বন্ধ করো।

সেই থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেল। রিয়াজ উঠে চলে গেল। মিল্লাত ঘুমিয়ে

পড়ল। দুটি চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগল রাজিয়ার। ঘৃণায় অপমানে আত্মধিক্কারে ছলছল করে উঠল দুটি বিষণ্ণ ভীত চোখ। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল রাজিয়া। সেই কান্না পৃথিবীর কেউ শুনতে পেল না।...

নিসারের প্রেতাত্মা যেদিন রাজিয়ার বিছানায় এল, সেদিন মবিন সীতাহাটি গিয়েছিল। ঘরে একা নবীনা। একাই কাটছে তার দিনরাত্রিগুলি। সাদিক বাহারপুরে থাকে। আসে না। লোকমুখে শোনা, সাদিক দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন করেছে। মেয়েটি কালো, স্বাস্থ্য ভাল। সাদিক মেয়েটিকে টিউশানী পড়াত। একদিন দুপুরবেলা পড়ার ঘরে দুজন সঙ্গমবদ্ধ হয়। বাড়ির লোক দেখে ফেলে। মেয়েটির বাড়ি সাদিক জায়গীর থাকত। ফলে গাঁয়ের লোক নিকে পড়িয়ে দিয়েছে। সেই কলঙ্কিত প্রেমিক বাহারপুর ছেড়ে সীতাহাটি আসবে কোন্ মুখে! কিন্তু সাদিক একদিন নবীনার কাছে এসে ক্ষমা চেয়েছে। নবীনা তাকে ক্ষমা করেনি। ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে, তুমি আর এসো না। আমি তালাকের মামলা করব। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। চলে যাও। সাদিক চলে গিয়েছে বটে। কিন্তু তালাকের মামলা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে বলেছে, তৌবা, তা কি হয নবীনা। আমি যে স্বামী তোমার। তোমার লাভার।

বলতে বলতে নবীনা মবিনের সামনে কেঁদে ফেলে। নবীনা একা। একাই তার দিনরাত্রিগুলি অতিবাহিত হচ্ছে। মবিন নিচু সোফায় বসে কথা শুনছিল। চোখের সামনে নরম ভারি তোষকের নিচু খাটে বসে আছে নবীনা। গরমের কাল। বিকাল হয় হয়। তবু গরম কমছে না। চৈত্র ফুরিয়ে এসেছে। কোন কোন বছর চৈত্রেই কালবৈশাখী হয়। কালবৈশাখী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও ঝড়জল হবে মনে হচ্ছে। ঝড়জলের রাতে নবীনাকে একা পেলে রাতটা বেশ তোফা কেটে যায়। সেই কথা ভেবে প্রস্তাব করে মবিন, আজ থেকে যাই তোমার কাছে? তুমি খুব একা হয়ে গিয়েছ!

কথাটার মর্ম বুঝতে অসুবিধা হয় না নবীনার। বলে, জীবনভর একাই থাকব স্থির করেছি মবিন। ভালবাসা পেয়েছি। স্বামীর সংসারও করেছি। ছেলেও আছে। সব স্বাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার একাই বেশ কেটে যাবে। দোকলা হতে মন চায় না। আব্বাজীর দোয়া খোদা কবুল করলেন। খোদাকে এখন বলি, আমায় তুমি সাহস দাও হে মেহেরবান। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে। নবীনা বলে, যে আশায় রাতে থাকবে বলছ, তা হবার নয়। শেষ কথা তোমার সঙ্গে

হয়ে গিয়েছে। এই নাও দলিল। চলে যাও। ভাইয়াকে দলিলখানা পৌঁছে দিও। অন্য কোথাও বিয়ে করে নিও। আমায় ভুলে যেও।

দলিলখানা হ্যারিকেনের আলোয় পড়ে নেয় মবিন। চমকে ওঠে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, তাহলে এখন উপায় ?

নবীনা বলে, উপায় আর কী ? মেয়েদের নসীব তো খোদা বানায় না। মানুষ তৈরি করে। সেই বরাত খোদা পুরুষকে দিয়েছেন। তোমরা সব পারো। তোমাদের ঈমান খেলা দেখে মনে হয় খোদার লীলা তো পুরুষেরই হাতে। খোদা একটা পুতুল। তোমরাই বাজিকর। তুমি যখন আমার দেহ নিয়ে মাতলামি করো, আমার গা থেকে নাকি মিষ্টি গন্ধ পাও। পাও না ? আমার হাতের রুটি খুব পাতলা, তুমিই বলো। বলো না ?

মবিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে। তখন নবীনা গলা ভারি করে বলে ওঠে, কিন্তু আমার বর রুটি মোটা হয় বলে চাষা বলে গাল দিত। মেরেছেও দুদিন। শেষ যেদিন ওর পাশে শুই সেদিন রাতে ওর নাকে নাকি দুর্গন্ধ লেগেছিল। আমার গায়ে খারাপ গন্ধ আছে। সাদিকের ধারণা পরপুরুষের পাশে চুরি করে শুলে খারাপ গন্ধ হয়। চাষা কে জানি না। তবে সেটা একটা লীলাই বটে। আমি চোর। কিন্তু তারপর ?

তারপর ? মবিন উৎসুক গলায় কুণ্ঠিত হয়। নবীনা বলে, মুসলমান মেয়ের তো গয়া কাশী নেই। আছে মক্কা মদীনা। যাব একবার সেখানে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু আমার সম্পত্তির একটা মোহরও সাদিককে ছুঁতে দেব না। এক দেরহামও না। আর এই দেহও কোনদিন চেও না তুমি। বিয়ে করো, শান্ত হও। রিয়াজজীকে বলবে, আমি একদিন তাঁর কাছে যাব। মানুষের সত্যিকার ধর্ম কী আমি জানতে চাই।

কামার্ত মবিন সহসা নবীনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই নবীনা ওকে কামড়ে দেয়। বলে, কুকুরের মতো করো না। আমি বেশ্যা নই। জোর করলে লোক ডাকব।

মবিন ভয় পেয়ে যায় নবীনাকে ছেড়ে দেয়। নবীনার এমন স্বভাব কল্পনা করতে পারে না। কী হয়ে মনটা বদলে গিয়েছে, কী হয়েছে, বুঝতে পারে না। আচমকা নবীনা হুহু শব্দে কেঁদে ফেলে। তারপর বলতে থাকে, আমায় তুমি মাফ করে দাও মবিন। পায়ে পড়ি। বড় ঘেন্না গো। এতই কি সস্তা আমি, এতই কাঙাল ! বলো তুমি ? আমার চেয়ে অনেক সুভোগ্য নরম আর রূপবতী রাজিয়া, সেকথা তো শুনলে না। এখন সেই মেয়ে ঐ দলিলের ধাক্কায় আমার চেয়েও

সস্তা হয়ে গেল। হায় কপালপুড়ী, মর তুই, মরে যা!

সস্তা। ভারি সস্তা। ঠিক কথা। মবিন নবীনার বাড়ি ছেড়ে অন্ধকার রাস্তায় নেমে এল। আকাশে মেঘ জমছে। হাওয়া বইছে। পা চালিয়ে দিল মবিন। বাস স্ট্যান্ডে এসে বাস ধরল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল দু চারটি। মবিন তখন যৌন-তাড়নায় আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হল, রাজিয়া নবীনার চেয়ে একা। মবিন বাস থেকে নেমে সহসা প্রেতাত্মায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। জোর বৃষ্টি শুরু হয় হয়। হাওয়া সবেগে ছুটে আসে। নবীনার অপমান রাজিয়ায় যৌন-প্রহারে চালিত করে মবিন। কারণ নাকি সত্যিকার পুরুষ কোন ধর্মের ভয়েই নারীর অপমান হজম করে না। শোধ নেয়। মবিন পাগল হয়ে যায়। মবিন বলে, হায় নবীনা, তুমি এত কষ্ট দিলে কেন? রাজিয়ার শরীরে মবিন নবীনাকে ধর্ষণ করতে থাকে।

॥ ষোল ॥

মেয়েরা শয়তানের ফাঁদ। আন-নেসাও হাবালাতিস শায়াতিন। ভাবছিল মবিন। তার সত্যিই বড় কান্না পাচ্ছিল। ভাবছিল, তার কী দোষ? নবীনা অমন যাচ্ছেতাই করল কেন? মেয়েদের যে কিছুতেই বোঝা যায় না। হাদীস তো আর এম্নি ওম্নি তৈরি হয়নি। বাঁকা হাড়ে তৈরি যে নারী, তা যে কিছুতেই সোজা হয় না। একবার বেঁকে গেল তো সিধে করে কোন্ শালা! মোসলেম হাদীসে বাঁকা হাড়ের বয়ান স্পষ্ট করে লেখা। অতএব ফাঁদে পড়ে গেল মবিন। মবিন কোন দোষ করেনি।

একদিন মবিন রিয়াজের কাছে এল। বলল, আমি বিয়ে করব। রাজিয়ার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেছে। ভেবে দেখলাম, মেয়েটির কোন ঠাঁই-কিনারা নেই, অসহায়। তুমি একদিন প্রস্তাব করেছিলে। মিলুও তার ছোট মায়ের জন্যে আমায় কতরকম করে বলেছে। আকবর সাহেবকে কথাটা বলতেই উনিও খুব খুশি হলেন। সীতাহাটি বৈদ্যবাটির দু চারজন মোড়লকেও বলেছি বৃত্তান্ত। তারাও বেশ সুমত দিয়েছে। বাকি কাজ তোমার। মা নানী সবাই রাজি।

রিয়াজ গম্ভীর হয়ে শুধাল, আমার কী কাজ?

মবিন বলল, একটা দিন স্থির করে দাও। আকবরজী বিয়েটা পড়িয়ে দেবেন। তুমিই এখন রাজিয়ার অভিভাবক।

কথা শুনে রিয়াজ পানসে করে হাসল। মনে মনে খুব আশ্চর্য হচ্ছিল। শুধাল, তুমি তো সকলকে রাজী করালে। বিয়েতে রাজিয়া যদি রাজী থাকে, আমার মতন শুকনো অভিভাবকের আপত্তি কিসের! হঠাৎ আমায় তুমি অভিভাবক বানিয়ে ঠাট্টা করছ কেন! রাজিয়া কী বলেছে তোমাকে।

মবিন বলল, কী আর বলবে! কিছুই বলেনি। আমরা দু'জনই তোমার ওপর নির্ভরশীল। রাজিয়ার তো কেউ নেই। গতকাল আনোয়ারের সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। লোকটা চাঁড়াল, একেবারে কষাই বলতে হয়। রাজিয়ার ব্যাপারে একদম নির্বিকার। কোন জবাবই করল না। তবে আদিল বিশ্বাসের দয়ামায়া বেশি। বেচারি খুব খুশি হয়েছে। আর আমি যে সত্যিই বিয়ে করছি, নবীনা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। একটা গোপন কথা বলি তোমাকে, আমি নবীনাকে ভালবাসতাম। জীবনে পাইনি। গ্রহণ করতে পারিনি। সেই দুঃখের শেষ নেই। তুমি ঠিক বুঝবে না, নবীনার ভালবাসার সম্মানে এই বিয়ে করছি আমি।

রিয়াজ ঈষৎ বিরক্ত হয়। বলে, ঠিক বুঝলাম না। ভালবাসার সম্মান মানে?

মবিন নিঃশব্দ হেসে ফেলে। বলে, হ্যাঁ, নবীনা এই বিয়ের জন্য আমায় বাধ্য করেছে। আমি তার কথা ঠেলতে পারিনি। সম্মান বলো, জোর বলো, যা খুশি বলতে পারো।

—ও! রিয়াজ টেবিল থেকে তুলে নিয়ে নতুন কেনা চশমাটা চোখে লাগায়। তারপর একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ সামনে মেলে ধরে সংবাদ খুঁজতে থাকে। মনে হচ্ছিল, সে যেন কী একটা হাতড়ে ফিরছে। যেন সে দম পাচ্ছে না। লাইব্রেরিতে এখন কেউ নেই। সকাল দশটা বাজছে। ইদানীং জীবনের কোন এক গভীর ও নিঃসহায় তাগিদ থেকে রিয়াজ ঘরে না থেকে গ্রন্থের কাছে থাকতে চাইছে। তাই ভোর বেলাতেই লাইব্রেরি চলে এসেছে। মবিন আজ সেই লাইব্রেরিতেই রিয়াজকে কথা বলার জন্য খুঁজে পেয়েছে।

মবিনের মাথার ঠিক ছিল না। সহজে যার মাথা খারাপ হয় না, ঘটনাগতিকে তারও বেহেড-দশা যখন হয়, বুঝতে হবে, ঘটনা গুরুতর। কেন যেন কেমন এক ক্ষীণ অপরাধবোধ মবিনের মধ্যে ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছিল। সে বোধহয় নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছিল নিজের নির্দোষ সত্তায় নিজেকে সাব্যস্ত করার জন্য। রিয়াজ সহসা এক আশ্চর্য প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা মবিন, একটা সত্য খবর আমায় দাওতো! শুনেছিলাম রাজিয়ার ভাইয়েরা এক রাতে বুড়ো নিসারকে বাগে পেয়ে গোপন টিপছাপ করিয়ে রাজিয়ার তালাক করিয়ে

নিয়েছিল। কথা কি সত্যি ?

মবিন বলল—সেকথা এখন তুলছ কেন ? নিসারজীর মৃত্যুর ফলে সবই তো নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া টিপছাপ কথাটা নিশ্চয় রটনা। কারণ বৃদ্ধ টিপছাপে যাবেন কেন, তিনি তো লেখাপড়া জানতেন।

—হ্যাঁ। তা বটে। তাহলে ওটা গুজব ? প্রশ্ন করে রিয়াজ।

মবিন বলে—তাহলে শোনো। আরো একটা গোপন কথা তোমাকে বলেই ফেলি। কথাটা গোপনই রাখবে। নইলে সব ভেস্তে যাবে। আর রাজিয়াকেও একটু বুঝিয়ে বলবে, সে-ও যেন কথাটা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখে। দলিলখানা যেন লুকিয়ে রাখে।

—দলিল ?

—হ্যাঁ। দলিল। ঐ বাড়ির দলিল। বাড়ি তো ওর নয়। একটা ফলস রেস্ট্রি হয়েছিল। রাজিয়ার আগেই বৃদ্ধ তার ছেলে মিল্লাতকে ঐ বাড়ি কবেই রেস্ট্রি করে দিয়েছেন। সেই দলিল।

—কোথায় পেলে তুমি ?

—পেয়েছি। নবীনা আমায় দিয়েছিল। আমি রাজিয়াকে পৌঁছে দিয়েছি। অবিশ্যি মিল্লাতকেই পৌঁছে দিতে হত। এই অবস্থায় বড় মায়া হয় রিয়াজ। কষ্ট হয়। কোথায় দাঁড়াবে মেয়েটা ! দীর্ঘশ্বাস ফেলল মবিন। কিছুক্ষণ রিয়াজ চুপচাপ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর হাতের পত্রিকা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে বলল—আমি একটু বৈদ্যবাটি যাব। দু'দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। চলো ওঠা যাক।

বৈদ্যবাটি এসে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করে রিয়াজ। শুধায়—টিপছাপ কি হয়েছিল ? আনোয়ার বিকালবেলা তালগাছ থেকে ভাঁড়ে করে রস নামাচ্ছিল। কোমরে আঁকশিতে ভাঁড় ঝুলিয়ে বাঁশের গা বেয়ে নেমে এল। রিয়াজকে সালাম দিয়ে দাঁড়াল। পাতলা হেসে বলল—সেই কাগচ তো আপনাকে আমি দিব না রিয়েজ ভাই। বুনডার কপাল ভাঙবে যে ! উডা একটা লকশা করেছিনু বুড়ার সঙ্গে। সেই কাগচ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

রিয়াজ বলল—সেই কাগজের এক পাই দাম নেই, আমি একটু অন্য কারণে দেখতে চাইছিলাম। বেশ। ছিঁড়েই যখন ফেলেছ তখন আর কথা কি ! চলি।

পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াজ। বলে—তোমার বোন ঐ মোহরানার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে আনোয়ার। ঐ বাড়ির আগাম রেস্ট্রি মিল্লাতের নামে।

কথা শুনে আনোয়ার থমকে উঠল। কেমন বোকার মতন হেসে ফেলে

বলল—হায় নসীব। কিন্তু ভয়ানক চালাক ঘড়েল লোক আনোয়ার রিয়াজকে বিশ্বাস করল না। বলল—এক পাই যার দাম নাই, বেত্তান্ত যাই হোক রিয়েজ ভাই। দু'শো টাকা লাগবে। দু'খানা কাগচ দিব। একখানা টিপছাপ। একখানা সই-মারা। কাণ্ড কি! পেরথমে টিপছাপ করি, চাষাভূষা লোক, নিরেট বুদ্ধি বুঝলেন! টিপছাপডাই বুঝি। পরে রাজিয়া খিয়াল করায় হাজী টিপছাপের লোক না। একটা তামাশার ঘটনা তো! তা পরে পরেই ভয় দেখিয়ে সই করায় আর একখান তালাক নামায়। দু'খানাই আছে।

রিয়াজ দু'শো টাকা গুণে দিয়ে তালাকনামা খরিদ করে। সূর্য ডুবুডুবু বেলা। মাঠের মধ্যে বাড়ি থেকে কাগজ এনে দেয় আনোয়ার। টাকা গুণে নেয়। রিয়াজ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা তুমুল নীল অন্ধকারে দিগন্তে চেয়ে থাকে। হাতে তালাকনামা। মনে মনে বলে—হায় খুদা! এই কি তোমার মেয়েলোকের ছাড়পত্র! আর কোন জল্লাদের হাত থেকে আমি সেই ধর্মতত্ত্ব খরিদ করছি খোদা গো! তোমার আরশ (সিংহাসন) কি কেঁপে ওঠে নাকি! নাকি টলে বেড়াচ্ছে, বুঝতে পারি না। আমি কখনও তোমাকে বুঝতে পারিনি।

সন্ধ্যার আজান হয়। সহসা মনে হয়, আজান নয়, মানুষের কান্নায় পৃথিবী বিষাদে ব্যথায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। রিয়াজ দ্রুত পথ হাঁটতে থাকে। বাস ধরে শহরে ফেরে। বাড়ি না ঢুকে আকবর মৌলবীর বাড়ি ঢুকে পড়ে। মৌলবী হ্যারিকেনের আলোয় বেহেস্তের কুঞ্জি নামে একখানি কিতাব পাঠ করছিলেন। রিয়াজকে দেখে হ্যারিকেন হাতে বৈঠকখানায় এলেন। পায়ের কাছে হ্যারিকেন রেখে চেয়ারে বসলেন। সম্মুখের চেয়ারে রিয়াজ বসে পড়ল। দু'জনের পায়ের কাছে হ্যারিকেন জ্বলছে। কোন কথা না বলে রিয়াজ তালাকনামা এগিয়ে ধরল। মৌলবী নিঃশব্দে তালাকনামা পাঠ করলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—বেশ। এখন কী করতে হবে খোলসা করে বলুন!

রিয়াজ বলল—আপনি বলেছিলেন, বিয়ের পরপরই ছাড়াছাড়ি তালাক হলে পর জলচল মতন করা যায়। তারই সবুদ। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন। বাপের সঙ্গে সম্পর্কই হয়নি, তালাকও হয়েছিল। লোক-বুঝানী একটা কিসিম। তার বেশি তো নয়। আপনিও সবই বুঝেছেন। নিন ধরুন।

রিয়াজ তিনশ'টি টাকা, তিনখানা নোট আকবরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। আকবর সেটি হাতে নিয়ে চেয়ে দেখে বলেন—টাকা হালাল কিনা বুঝতে পারছি না। মছলা দেখব, তারপর হারাম হলে, না-জায়েজ বোধ হলে ফিরিয়ে দেব। হালাল হলে আরো দু'শো লাগবে। বুঝতেই পারছেন ফেকাহ্ হাদীসের কাজ,

বেশুমার খাটনি।

রিয়াজ আরো দু'শো টাকা বার করে দিয়ে বলে—রাখুন। রেখে দিন। রিয়াজ এক লাফে অন্ধকারে নেমে মিলিয়ে যায়। টাকা হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে মৌলবী হঠাৎ থরথর করে কেঁপে ওঠেন।

সাতদিন পর। মবিন লাইব্রেরিতে আসে। রিয়াজকে প্রশ্ন করে—বৈদ্যবাটি গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—আনোয়ারকে সব কথা বলে এলে ! তোমায় না দলিলের কথা গোপন রাখতে বলেছিলাম। তুমি কি চাও না রাজিয়া ঘর করুক ? বিয়ে হোক ? আব্বা বাংলাদেশ থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়াকে সঙ্গে করে আসছেন। তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। সব প্রস্তুতি শেষ। এপারে এসে বিয়ে দিয়ে ফিরে যাবেন। বোঝো কী সাংঘাতিক অবস্থা ! তবু আমি রাজিয়াকে ছাড়তে পারব না। কথা দিয়েছি। কথা বলে মবিন মাথা নিচু করল। তারপর ফের মুখ তুলে বলল—আর দেরি করা ঠিক হবে না। দু'একদিনের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলব। তুমি রাজী হও।

রিয়াজ অত্যন্ত শক্ত গলায় বলল—আমি রাজী নই !

গলার শব্দে মুখ তুলে চমকে উঠল মবিন। বিস্ময়-বিদ্ধ হয়ে বলল—রাজী নও ?

—না। একদম না। কিছুতেই না।

—কেন ?

—কারণ তুমি ওকে ভালবেসে বিয়ে করছ না। দয়া করেও নয়। বিয়ের পর দু'ছয় মাস বাদে ওকে তুমি তালাক দেবে। আই অ্যাম সিওর। তাছাড়া রাজিয়া মিন্নাতকে চায়। আমি ওদের সমর্থন করি। ওদের বিয়ে দেব আমি। আকবর মৌলবী বিয়ে পড়াতে রাজি হয়েছে।

—জানি। সব জানি।

—তুমি কি জানো রাজিয়ার সঙ্গে নিসারের তালাক হয়েছিল ? এই নাও, পড়ে দ্যাখো। তালাকনামা এগিয়ে দেয় রিয়াজ। মবিন মনোযোগ দিয়ে তালাকনামা পড়ে। উল্টে পাল্টে দেখে। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে—চমৎকার ! তারপর ?

—তারপর আর কিছু নেই। বিয়ে আমি দেবই। তোমার মতন লম্পটের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

—ইস্ ! তা বেশ তো ! দাও । খারাপ লোক আমি । কিন্তু সেই লম্পটকেই বিয়ে করতে রাজিয়া তৈরি ।

—তাই নাকি ?

—নিশ্চয় । তুমি তো আকবরকে ঘুস দিয়ে অধর্ম করাতে চেয়েছ । তার বিচার হবে । তারপর বিয়ে ।

—কী বলছ ?

—ঠিকই বলছি । জেনে রেখো আকবর ধর্মের মানুষ । ভীরু । আল্লা-অলা । মছলা বেচে রুজি জোগাড় করে । জলসা করে । মিলাদ পড়ায় । অতএব অধর্মে তার ভয় আছে । আমি তাকে বহুদিন চিনি । ওর একটা ধর্মের দল আছে । আমি সেই দলকে চাঁদা দিই ।

—বুঝলাম !

—না । তুমি কিছুই বোঝোনি । ধর্ম তুমি বোঝো না । ফালতু হাদীস আউড়াও । খোদাকে তোমার ভয় নেই । তুমি কল্পনা-বিলাসী । ইসলাম-বিরোধী । খুব নোংরা লোক তুমি । মূর্খ । বেকুবফ । বাস্তব কী জানো না । ধর্মের জোশ আর ক্ষমতা চেনো না । তোমার জামাত নেই । তুমি একা । এবং তুমি অমানুষ । না হলে কখনও মা-ছেলের বিয়ে দিতে চাইতে না । বিচার হবে । আমি মানুষ ডাকব । আকবরজীর সঙ্গে কথা হয়েছে । আমি তোমার তালাকনামা ছিঁড়ে ফেলছি । বলার সঙ্গে সঙ্গে তালাকনামা দু'ভাগ চার ভাগ, আট ভাগ যোল ভাগ হয়ে গেল । কুটি কুটি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল মবিন । তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল । তখনই একটা প্রচণ্ড চড় এসে গালে লাগল তার । মবিন চড় সামলাতে না পেরে চেয়ারসহ মেঝেয় পড়ে গেল । তারপর ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল মবিন । চড় খাওয়া গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—পাগল হয়ে গিয়েছ । রাজিয়ার মিষ্টি ভাষা আর রূপে জাদু আছে । তোমাকে গুণ করেছে । ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো এই অপমান কতখানি দুঃসহ । জবাব তুমি পাবে । তুমি তো সামান্য পিঁপড়ে । আমি ক্ষমা করলেও, সমাজ ক্ষমা করবে না । তারা তোমার মাথায় ঘোল ঢালবে বলে গেলাম । মবিন জুতোয় শব্দ তুলে লাইব্রেরির সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে চলে গেল । দু'দণ্ড যেতে না যেতেই অদ্ভুত এক বোধ রিয়াজকে গ্রাস করতে লাগল । একা । বড় একা । কেউ নেই পাশে । রিয়াজ ছেঁড়া তালাকনামার টুকরোগুলি কুড়িয়ে তুলতে লাগল । জোড়া দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুতেই মেলাতে পারে না । তার হৃদয় যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে । সব প্রত্যয় ছিন্ন হয়ে চোখের সামনে পড়ে আছে ।

পাগলের মতন ফের মেঝে থেকে তুলে নেয় কাগজের টুকরো। অদ্ভুত শূন্যতা বুকের কাছে জমে ওঠে। হাসতে হাসতে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এক ফোঁটা হাত কাঁপল না। বিবেচনা করল না। জীবন নিয়ে যেমন ছিনিমিনি ছিল তালাকনামার প্রতিটি অক্ষরে, তেমনি এক বিবাহের আয়োজন চলছে। সেই প্রহসন চোখের সামনে দেখতে হবে। কী ভাগ্য মেয়েটার! কী নসীব! জোড়া দেয় রিয়াজ। জোড়া লাগে না। একসময় সে পাগলের মতন হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে দুই চোখ তার চিকচিক করে ওঠে। মনে মনে বিড়বিড় করে—ছিঁড়ে ফেলে দিল! এক ফোঁটা মায়া হল না! এটা কি শুধুই তালাকনামা? আর কিছু নয়? এত তুচ্ছ? এতই অর্থহীন? দু'শো টাকার বদলে আমি খরিদ করেছিলাম। কী বোকা! কী বেকুফ! মূর্খ আমি? আপন মনে নিজেকে রিয়াজ মূর্খ বেকুফ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। রাজিয়া ও মিল্লাতের চোখেমুখে সে মিলনের স্পষ্ট আকৃতি লক্ষ করেছে। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারছে না অনুভব করেছে। দু'জনের কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য আকর্ষণ জাজ্জ্বল্যমান। শুধু তারা মানুষের সমর্থন চায়। জোর চায় একটুখানি। রিয়াজ সেই সাহস ও শক্তির আয়োজন করছিল। তার মনে হয়েছিল মৌলবী যদি বিয়ে পড়াতে রাজি হয় রাজিয়ার ভয় দূর হবে। যদি বোঝানো যায় নিসার হোসেন রাজিয়াকে ত্যাগ করে চলে গেছেন, যদি বোঝানো যায় নিসার বলে কোন পুরুষ রাজিয়ার জীবনে আসেননি তাহলে মিল্লাতও সাহসী হতে পারত। সামান্য তালাকনামায় সেই চির-সম্পর্কহীনতার সাক্ষ্য ছিল। চির-বিচ্ছেদের সবুদ ছিল। রিয়াজের হঠাৎ কেন যেন মনে হয়েছিল, তালাকনামা মুশকিল আসান করে দেবে। সকলকে এই সবুদ দেখিয়ে বলতে পারবে, নিসার আর রাজিয়া স্বামী-স্ত্রী নয়। ওদের যৌনসম্পর্ক ছিল না। রিয়াজ সব আগে মিল্লাত ও রাজিয়াকে সেকথা বোঝাতে পারত। মৌলবী আকবরজী সেকথা সমাজকে বুঝিয়ে দিতেন। বোঝানোর দরকার ছিল। তুচ্ছ হলেও তালাকনামা শুধু একটা তালাকনামাই ছিল না। আর সে কারণেই মবিন সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নিসার আর রাজিয়ার রহস্য-জড়িত সম্পর্ককে রহস্যে রেখে দিতে চেয়েছে। তারা স্বামী-স্ত্রী নয়, ফের স্বামী-স্ত্রীও বটে, এই দুর্বোধ্য সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে অসহায় রাজিয়ার সংস্কারগ্রস্ত মনকে। আসলে সংস্কার নয়। সমাজের ভয়। মিল্লাত রাজিয়া যে কোন অপরাধ করেনি সেকথা তাদের বুঝতে দেওয়া চলে না। মবিন কখনও সেকথা বুঝতে দিতে চায় না। রিয়াজ স্পষ্ট বুঝতে পারে মবিনের সদিচ্ছা আসলে কতদূর হীন ও

কুৎসিত। তার কণ্ঠে দয়া বা করুণার বয়ান কী নির্মম রসিকতা। নবীনার প্রতি ভালবাসার দোহাই জীবনের কী নিষ্ঠুর ছল। রিয়াজ ভাবছিল, রাজিয়াকে সে কী করে বোঝাবে, সত্যিই তার একদিন তালাক হয়েছিল। খালাস নয়। তালাকই। যা রাজিয়া কিছুতেই বুঝতে পারে না। পারছে না। রিয়াজের নিজেকে নিদারুণ অসহায় মনে হতে লাগল। ছেঁড়া টুকরো কাগজ সংগ্রহ করে হাসতে হাসতে সে ফের উড়িয়ে দিতে থাকল। সত্যিই তাকে পাগলের মতন দিশেহারা দেখাচ্ছিল। রিয়াজ নিজেকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা রিয়াজ সত্যি করে বলো তো তুমি রাজিয়া আর মিল্লাতের মাঝে যে প্রেমের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছ, তা কি মিথ্যা ? ভুল ? তা কি প্রাগৈতিহাসিক ? পুরনো ? ট্রাইবাল ? সত্যিই কি তার কোন মানে নেই ? তা কি বাস্তবিক তুচ্ছ হতে পারে ? তাকে কি তালাকনামার মতন ছিঁড়ে ফেলা যায় ? তা কি মাত্র দু'শো টাকায় পৃথিবীর কোন স্থান থেকে খরিদ করে আনা যায় ? যায় না। কিন্তু পৃথিবী সেকথা বুঝতে চাইছে না কেন ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায় রিয়াজ। হাতের শেষ টুকরোটা উড়িয়ে দেয়। এমন সময় সচকিত হয়ে লক্ষ করে নবীনা এসে দাঁড়িয়েছে। নবীনা পায়ে পায়ে রিয়াজের দিকে এগিয়ে আসে। হাতের ভ্যানিটি টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে—সালাম রিয়াজজী। আমার চিঠি পেয়েছেন ?

রিয়াজ মৃদু চমকে প্রতি-সালাম জানায় অনুচ্চ গলায়। বিস্মিত হয়। শুধায়—আপনি কবে এলেন ?

নবীনা উত্তর দেয়—আজই। এইমাত্র।

চিঠির কথায় আমল না দিয়ে রিয়াজ বলে—কেন এলেন ? রাজিয়ার বিয়ে শুনেছেন তো ? মবিন সম্মত হয়েছে। রাজিয়া আজ একেবারে নিঃস্ব। বাড়িখানা হারিয়েছে। কাঙাল হয়ে গিয়েছে। তবু মবিন সম্মত আছে। একটা সুখবর। কারণ আপনার ভালবাসার সম্মানে সে রাজিয়াকে বিয়ে করছে। আপনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন ?

নবীনা কোন জবাব করল না দেখে রিয়াজ আপন মনে হাসল। বলল—বসুন। আপনি এলেন খুব ভাল হল। কথা বলার লোক পেলাম। আপনাকে আরো একটি খবর দিতে হয়, শুনলে কী ভাববেন জানি না। তবু বলি। আমাদের বন্ধু মবিনের প্রেম করবার ক্ষমতা অদ্ভুত। রাজিয়ার ওপর বড় মায়াবশত এক রাতে রাজিয়াকে একলা পেয়ে রেপ করে ফেলেছে। নিসার যা পারেনি, মবিন তা পেরেছে। ফল খুব ভাল হয়েছে। এই ঘটনার পর রাজিয়া মবিনকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আসুন আমরা খুশি হই। আনন্দ করি।

বসুন। বসছেন না কেন?

নবীনার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কোনপ্রকারে শুধাল—কবেকার ঘটনা?

রিয়াজ বলল—১০-১২ দিন হবে। যে রাত্রে খুব ঝড়বাদলা হল। রাত্রি ৯টার দিকে ঘটনা। বোধহয় সেটা বুধবার ছিল। আমার এখানে মিল্লাত পালিয়ে এসেছিল। ওর বসন্ত হয়েছে। মিল্লাতকে দেখা করে ফিরে যায় রাজিয়া। তখনই বৃষ্টি শুরু হয়। ফিরে গিয়েই মবিনের কবলে পড়ে।

নবীনা কাঁপতে কাঁপতে সশব্দে চেয়ারে বসে পড়ে। মুখ দিয়ে ভয়ার্ত শব্দ বার হয়। বলে—আমি সেদিন ওকে তাড়িয়ে দিই। আমার কাছে সে সীতাহাটি গিয়ে...

ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল নবীনা। রিয়াজ সেই কান্না কান পেতে শুনে বলল—দলিল নিয়ে এসেছে।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, দলিল নিয়ে এসেছে!

নবীনা গোপন করে যায়। বলতে পারে না, যা সে বলতে চাইছিল। রিয়াজ বলে—একবার চলুন ওখানে যাই। মিলুকে দেখবেন না?

—হ্যাঁ। চলুন!

ওরা নিচে নেমে এসে রিকশা করে। রিকশায় চলতে চলতে রিয়াজ প্রশ্ন করে—ভাইয়ের কাছে না উঠে হঠাৎ আমার কাছে কেন?

নবীনা চোখ মুছতে মুছতে হেসে ফেলে বলে—আপনার কাছেই যে দরকার আমার। আমি একটা মোকদ্দমা করব রিয়াজজী! আপনাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—মোকদ্দমা? রিয়াজ অবাক হয়।

—হ্যাঁ। মোকদ্দমা। আমি তালাক নেব। সাদিক নিকে করেছে। আমাদের সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়েছে। আমি মুক্তি চাই। নোংরা লোক আমাকে স্ত্রী বলে দাবী করবে আমি চাই না। বলুন! সাহায্য করবেন?

রিয়াজ পাশে বসে থাকা বিষণ্ন সুন্দরী মহিলার দিকে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন কথা বলে না। ভাবে, কী সব ঘটনা ঘটে চলেছে হরদম। মানুষের দাম্পত্য কী অদ্ভুত কুটিল। যৌন-জীবনটাই কী অপূর্ব অনিশ্চিত। কিন্তু মুক্তি চাইলেই কি হয়? কোর্টের মুক্তি-পত্রই কি একজন মুসলমান মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট? মুসলমান ভারতবর্ষের কোর্টকে মনে করে হিন্দুর কোর্ট। স্বামীর মুখের খোলা তালাক, মৌখিক তালাকের চেয়ে বড় মুক্তি কে দিতে পারে? কেউ না।

মামলা করে কী হবে? সমাজ সেই ডাইভোর্সকে ইয়ার্কি মনে করে।

রিয়াজ বলল—আপনি মুক্তি পাবেন কোথা? কে দেবে? সাদিকের কাছে মুক্তি চান!

—ও আমায় তালাক দেবে না রিয়াজজী। কিছুতেই তালাক বলবে না। অথচ সারাজীবন দূরে দূরে থাকবে। একটা অসুন্দর মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে। সংসার করবে। আমার টাকায় কালো বউয়ের শাড়ি গন্ধ তেল হিমানী কিনবে। আমি কুকুরের মতন একলা পড়ে থাকব। বুড়ো হয়ে যাব। মুক্তি পাব না।

—মামলা করলেই কি সব সমস্যা ঘুচবে মনে করেন?

—না। করি না। তবু তো মনে মনে জানব লোকটাকে ত্যাগ করেছি। ও আমার কেউ না।

—তার জন্য মনের ভাবনাই যথেষ্ট যদিও। তবু মোকদ্দমা মন্দ কি! বেশ তাই হবে। কিন্তু তারপর?

—তারপর কী হবে জানি না। যে আমার ভালবাসার সম্মানে রাজিয়াকে বিয়ে করছে তাকে তো বলতে পারি না আমার ভালবাসার সম্মানে আমাকেই বিয়ে করো।

—কেন পারেন না?

নবীনা এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কোন জবাব করে না। রিয়াজ প্রশ্ন করে—সাদিক যদি আপনাকে তালাক দেয়, তাহলে কি মবিন আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে?

নবীনা বলল—না।

—কেন?

—ওর ভালবাসার ক্ষমতা যে অদ্ভুত রিয়াজজী। আপনিই বলেছেন।

রিয়াজ বলল—তবু তাকেই আপনি আজও ভালবাসেন।

নবীনা কোন উত্তর দেয় না। মনে মনে খুব আশ্চর্য হয় রিয়াজ। মনে মনেই বলে—আসলে মানুষের ভালবাসা মাত্রই অদ্ভুত। অদ্ভুত একটা মাদক। কারো কাছে হৃদয়ের সেই নেশা বড়ই শুদ্ধ। কারো কাছে কেবলই মদিরা। দু'টি ভালবাসার দুই নারীকে দেখছে রিয়াজ। কোন মিল নেই। ভালবাসার স্বাদ কি বিচিত্র। দুই ভালবাসার এই বিভিন্নতা কারুকে গল্প করে বোঝানো কঠিন। কেবল উপলব্ধি করা যায়। মবিনকে কেন যে ভালবাসে নবীনা সেকথা সে নিজেও জানে না। অথচ বুদ্ধিমান মানুষ মবিনকে কি ঘৃণা করবে না? রিয়াজ মনে মনে বলল—আমি ঘৃণা করি। বন্ধু বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়।

অথচ মিল্লাত এখনও তাকে ভালবেসে চলেছে। যে-ব্যক্তি নিসার হোসেনকে সহ্য করতে পারে না, সে-ই কিন্তু মবিনকে আদর করে। হৃদয়ের এই ধর্ম রিয়াজ বুঝতে পারে না। মিল্লাতকে বুঝতে পারে না রিয়াজ। সে এক জটিল জড়িমা।

রিয়াজ আর নবীনা রিকশা থেকে নেমে মিল্লাতের বাড়ি ঢোকে। ঢুকেই থতমত খায়। দুপুর আড়াইটা। মিল্লাত খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘরে পাখা চলছে ফুল-স্পিডে। ফ্যানের তলায় রাজিয়ার ধোয়া শাড়িকে জায়নামাজ করে মাথায় টুপির বদলে রুমাল বেঁধে মবিন নামাজ পড়ছে। রাজিয়া টেবিল চেয়ারে বসে কী একটা কাগজ কপি করছে। ওদের দুজনকে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে চাইল। স্বল্প করে হাসল। তখনই মবিন কথা বলে উঠল—আমার নামাজ ঠিক হল না রাজিয়া। পানি নিয়ে এসো। আর একবার ওজু করতে হবে।

ঘুমন্ত মিল্লাত বাদে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। আসলে যতবার সিজদা করতে গেছে, মবিন শাড়ির ভেতর থেকে রাজিয়ার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। সেকথা খোদা ছাড়া কেউ জানে না। গায়ের গন্ধই শুধু নয়, বারবার উলঙ্গ বিধ্বস্ত রাজিয়া চোখের কাছে ভেসে উঠছে। যতই সে খোদার অস্তিত্বে মনোযোগী হতে চেয়েছে, সিজদা-স্থানে খোদার ঘর মক্কার কাবাকে কল্পনা করতে চেয়েছে ততবারই উলঙ্গ বাদলা-পীড়িত রাত্রির রাজিয়া সামনে এসে গেছে। মনের শক্তি দিয়ে মবিন এই দৃশ্য ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। নামাজ হচ্ছে না। মবিনের কান্না পেয়ে যাচ্ছে। রাজিয়া বদনায় পানি এনে দিল। ওজু করে আবার নামাজে দাঁড়াল মবিন। নামাজ শেষ করে বলল—তুমি কখন নামাজ পড়বে রাজিয়া?

রাজিয়া বলল—পড়ব একটু বাদে।

মবিন বলল—একটা জায়নামাজ করবে।

রাজিয়া বলল—আছে। সেটা জল-ধোয়া করেছি। পরে এলে ওটাতেই পড়বেন।

—হ্যাঁ। চলি। বলল মবিন। বলল—নবীনা কখন এলে? একবার আমাদের বাড়ি যেও। তোমার কথা মতোই সব কাজ হচ্ছে। কেবল রিয়াজটাই খামোকা আমাকে মারল। চলি ভাই রিয়াজ। আমাদের বিয়ের দিন তুমি যেন কোথাও চলে যেও না। রাজিয়ার সঙ্গে কথা বলে একটা দিন স্থির করে রাখো। পরে এসে রাজিয়ার কাছে জেনে নেব। নাও। তুমি যে পাঁচশ টাকা আকবরজীকে দিয়েছিলে উনি সেটা ফেরত দিয়েছেন। পরে তোমার সঙ্গে উনি কথা বলবেন বলেছেন। ভুল তো মানুষই করে। ফেরেস্তার ভুল হয় না। যাক গে। চলি।

মবিন চলে গেল। টাকার প্যাকেট টেবিলে রেখে গেল। হঠাৎ হাতের কলম টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে রাজিয়া দ্রুত নবীনার কাছে ছুটে আসে। নতজানু হয়ে দণ্ডায়মান নবীনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। তারপর ব্যাকুল গলায় কেঁদে ফেলে বলে—আমায় তুমি বাঁচাও নবীনা। আমি বাঁচতে পারছি না। তোমাদের সংসার থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আমি তোমার বাপের কাছে খালাস চেয়েছিলাম। এখন তোমার ভাইয়ের কাছে চাইছি। তোমার কাছে চাইছি। তোমরা আমাকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছ! এ-বাড়ি যে আমার নয়। নইলে আমি ঐ লোককে কিছুতেই ঢুকতে দিতাম না। যার বাড়ি সে যে কিছুই বলে না। ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাল করে কথা বলতে চায় না। চোখের সামনে আসছে যাচ্ছে, বারবার বিয়ে করতে চাইছে, আস্ফালন করছে ডাক্তার, সবই তো দেখছে মিলু, তবু একটা কথা বলে না। এত অপমান সইছি কেন? বলো নবীনা! যে লোক মা আর মেয়েকে সমান ইচ্ছেয় ভোগ করে, তারপর সমাজের ভয় দেখায়, খোদা কি তার কোন বিচার করবে না? তুমিই বলো, আমাকে মিলুকে তুমি আলাদা করে দিয়েছিলে, কার ইচ্ছেয় করেছ? বল? তোমার ভালবাসায় বুঝি কোন পাপ নেই?

নবীনা বলল—পাপ তো আমাদেরই ছোট মা। আমার বাপ থেকে আমরা পাপী। আমি আমার ভাই সকলেই গুণাহগার। তোমার কষ্টের জন্য আমরাই দায়ী। তোমাকে আমরা সব দিক থেকেই বঞ্চিত করেছি মাগো! ওঠো! তুমি আর এখানে থেকো না। কিন্তু আমি কী করব? আমি যে নিজেই পাপে পুড়ছি। নিজেই বাঁচতে জানি না। পথ হারিয়েছি। তোমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই মা। আমায় মাফ করে দাও।

রিয়াজ লক্ষ করল মিল্লাতের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। চোখ খুলে চাইল সে। নবীনা ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। রাজিয়া চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। বলল—আপনি বসবেন না রিয়াজজী? বসুন!

রিয়াজ টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে টাকার প্যাকেট উঠিয়ে নেয়। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে—সমাজের লোক হতে পারলে সব পাপ ঢাকা পড়ে রাজিয়া। তোমার আমার সমাজ নেই। অতএব তুমি পালাও। থেকো না।

—কোথায় যাব বলুন! রাজিয়া শুধাল। রিয়াজ বলল—যে পালায় সে কোথায় পালায় জানে না।

মিল্লাত কারো কথা বুঝতে পারে না। বলে—রিয়াজ! একটু কাছে এসো!

রিয়াজ এগিয়ে যায়। মিল্লাত রিয়াজের হাত ধরে বলে—আগামী পরশু ভাল দিন। আমি সুস্থ হয়েছি। একজন মৌলবী ডেকে এনো দূর থেকে। রাজিয়াকে আমি বিয়ে করব। মানুষের তাবৎ ঘৃণার শক্তি আমার একার ভালবাসার চেয়ে বড় নয়। যাও। আমি প্রস্তুত!

—সত্যি বলছ! রিয়াজের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে।

নবীনা ধীরে ধীরে ভাইয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে। দুই চোখ তার বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। রাজিয়া মেঝেয় দাঁড়িয়ে ঘাড় নিচু করে থাকে। দুই চোখে জল ভরে যায়। সে ঘাড় তোলে না। একসময় সে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। তখনও তার স্নান হয়নি। মাথার উপরে জল-চালুনি খুলে যায়। জলের মিহিন শব্দ তার হৃদয়ে পুঞ্জিত হয়ে ঝরতে থাকে। এক মগ্ন শীতলতায় ডুবে যায় তার পৃথিবী! এক সময় তার শীত করতে থাকে। শরীর হিম হয়ে আসে। সহসা মনে হয় সে মরে যাচ্ছে। অথচ কোন কষ্ট হচ্ছে না। কোন যন্ত্রণা নেই। রঙিন আলোয় বাথরুম ভরে গেছে। রাজিয়া মরে গেছে যেন। তারপর সে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর অতীত জন্মের পরপারে সে চলেছে আশ্চর্য উৎসবে। তার জন্য জলের শব্দের মতন স্নিগ্ধ পৃথিবী অপেক্ষা করছে। সেখানে কোন গুনাহ্ নেই। নিসার হোসেন নেই।

॥ সতেরো ॥

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাজিয়া দেখল নবীনা আর রিয়াজ চলে গিয়েছে। নবীনা এল মবিনের বাড়ি। এসে দেখল দুজন পুরুষ আত্মীয়সহ কনে সঙ্গে করে মবিনের বাবা ঘণ্টা দুই আগে ওপার থেকে এসে পড়েছেন। বাড়িতে খুশির ঢেউ বইছে। মবিন গম্ভীর হয়ে একলা ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলের সামনে চোখ বুঁজে কী যেন শান্ত মনে চিন্তা করছে। ওর চোখেমুখে কোন উদ্বেগের চাপ থাকলেও সেই দুশ্চিন্তার ঘনতা নেই। নবীনাকে দেখে ছদ্ম কাতরতায় বলে উঠল—পারলাম না নবীনা। হেরে গেলাম।

নবীনা বলল—ভাইয়া আর রাজিয়া পরশুদিন বিয়ে করে ফেলছে মবিন। তোমার হেরে গেলে চলবে না।

কথা শুনে শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে গেল মবিনের। নবীনা বলল—যেমন করে পারো এই বিয়ে রুখে দাও মবিন। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মবিন কেমন মৃদু উত্তেজনায় দাঁত পিষে বলে—ভেবেছিলাম গায়ে হাত দেব

না। কিন্তু এখন দেখছি উপায় থাকল না। রিয়াজ খুন হবে নবীনা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় নবীনা। বলে—না। খবরদার না। অমন কথা মনেও এনো না। তাঁর কি দোষ। মুরোদ থাকলে বিয়ে করে দেখাতে, সমাজ তোমাকে মদত করত। ওরা তো তিনটি মাত্র প্রাণী।

মবিন সহসা গা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে যায়। বলে—আমি আর কিছুই পারব না নবীনা। আমায় ক্ষমা করে দিও। বলেই মবিন চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে চলে যায়। নবীনা বুঝতে পারে মবিন ঘুরে গেছে। তার ভালবাসার কোন দামই সে দেবে না। দিতে পারে না। নবীনা কারুকে কিছু না বলে মবিনের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। সীতাহাটি ফেরে। নিজেকে তখন তার আশ্চর্য শূন্য মনে হয়। মনে হয় জীবনটা একেবারে ফাঁকা। সবই কীরকম অর্থহীন। তারপরই সে স্থির করে ভাইয়ার এই বিয়েকে সে সমর্থন করবে। কেন করবে না ? করলে কী হয় ? ভাবতে ভাবতে সে ছেলেকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। দুই চোখ ঈষৎ ভিজে ওঠে।

সেই রাতে মবিন বাংলাদেশ থেকে আসা তার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি দুটো অব্দি গল্প করে কাটিয়ে দিল। কতরকম গল্প। নদীর গল্প। ইলিশ মাছের গল্প। প্রকৃতির গল্প। আরব্য নিশির গল্প। ফেরাউনের গল্প। মুজিবর রহমানের গল্প। মেয়েদের স্বাধীনতা ও বোরখার গল্প। এবং শেষে ঈডিপাসের গল্প। ঈডিপাসের চোখ উপড়ে ফেলার গল্প। ভাবী স্ত্রীকে শেষে কথায় কথায় বলল—স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর জান্নাত (স্বর্গ) জানো তো ? মেয়েটি ঘাড় গোঁজ করে মাথা নেড়ে জানালো সে সব সে ভালই জানে। মবিনের মনটা ভরে গেল। মনে হল—এমন ফ্রেশ মেয়ে সে কখনও দেখেনি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে বাকি রাত তার ঘুম এল না। কেন ঘুম এল না ? কেবলই মনে হতে লাগল রাজিয়া তাকে কি সত্যিই বিয়ে করতে চেয়েছিল ? খেয়াল হল রাজিয়া কখনও না বলেনি, আবার হ্যাঁ-ও বলেনি। মনে হত সে রাজী আছে। মনে হত রাজী নেই। কেমন চুপ করে থাকত। চুপ করে থাকত কেন ? সেই রাত্রের দুর্ঘটনার পর দু চারবার দেখা হয়েছে বড়জোর। চোখ তুলে তাকে ঠিক চেয়ে দেখত না। মাথা নিচু করে থাকত। কখনও নিতান্ত বাধ্য হয়ে ছোট জবাব করত কোন কথার। সেটা কি ঘৃণা ? তা কি আসলে কোন ভয় ? ভয়ই বটে। ঘৃণাই বটে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে হলে রিয়াজকে খুন করা ছাড়া পথ নেই। শালা পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। রিয়াজই মেয়েটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। মেয়েটাকে রক্ষা

করা গেল না। রিয়াজ তাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিল। সদিচ্ছা থাকলেই কি সব সম্ভব হয় ? হয় না। তারপর মনে হল মিল্লাত বড় নিরীহ ছেলে। অবুঝ। শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছে। অসহায় হয়ে পড়েছে। রিয়াজ তাকে যা করাতে চাইছে, সে তাই করতে বাধ্য হচ্ছে। উপায় নেই বলে মুখ বুজে আছে। কথা বলতে পারে না। অক্ষম ফাঁদে পড়া নির্বোধ পশুর মতন তার দিকে শান্ত করুণ চোখ মেলে চেয়ে থাকে। অসুখের পর আরো বেশি বোকা হয়ে গিয়েছে। বাপের অভিশাপ ছেলে বলেই ঘাড়ে করে টানতে হবে। জিভ তার ঝুলে পড়বে। কেউ দেখবে না। কেউ পাশে থাকবে না। রিয়াজ গোপনে রাজিয়াকে ভোগ করবে। মিল্লাত মুখ ফুটে সমাজের কাউকে সে কথা প্রকাশ করতে পারবে না। তার তো সমাজ থাকল না। তখন কী হবে ? যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে অন্তর খাকখয়রা হয়ে যাবে। চাপা এক অনুচ্চার বেদনা বুকে বহন করে ফিরবে মিলু। সেকথা ভাবলে মবিনের বুক ভেঙ্গে যায়। অথচ কাল বাদ পরশু বিয়ে হয়ে যাবে। একটা বেশ্যা-কল্পজীব মবিনকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করে সে। অপ্রতিরোধ্য টান দেয় অদ্ভুত মেয়েটা। ডাকে যেন। হাতছানি দেয় যেন। সকাল হয়। মবিন ভাবে মিল্লাত এখনও তার পথ চেয়ে বসে আছে। বলছে—নিয়ে যা। টেনে নিয়ে চলে যা মবিন। আমাকে বাঁচা। আমি বইতে পারব না। সামলাতে পারব না। সইতে পারব না। নিয়ে যা। ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যা। দূর করে দে।

এইসব কথা মনে মনে বানাতে লাগল মবিন। তৈরি করতে লাগল। মনে করল আজই রাজিয়াকে মিল্লাতের বাড়ি থেকে উঠিয়ে এনে বিয়ে করে ফেলা দরকার। দৃশ্যটা কল্পনা করে মবিন। সে মিল্লাতের কাছে মনে মনে পৌঁছে যায়। কল্পনায় চলে আসে। হাত ধরে রাজিয়ার। টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বারান্দা। বারান্দা থেকে সিঁড়ি। নামতে থাকে। রাজিয়া আসতে চায় না। বারবার মিল্লাতের নাম ধরে ডাকে। একটা থাম আঁকড়ে ধরে। জোর টানে হাত ছুটে যায়। সিঁড়িতে শুয়ে পড়ে। মিল্লাত সবই চেয়ে চেয়ে দেখে। কথা বলে না। বিরক্ত হয় না। বাধা দেয় না। রাজিয়ার ডাকে সাড়া দেয় না। সবই কল্পনা করে মবিন। ভাবে কল্পনা নয়। এ ঘটনা সে ঘটিয়ে দিতে পারে। ঘটানো উচিত। এটা এক মানবিক কর্তব্য। নৈতিক দায়িত্ব। সামাজিক সুকর্ম নিঃসন্দেহে। সবাই তাকে সমর্থন করবে। আকবরজী সমর্থন করবে। সাদিক সমর্থন করবে। বাহারপুর বৈদ্যবাটি সীতাহাটির মানুষ সমর্থন করবেন। আদিল বিশ্বাস, নবীনা সানন্দে দুহাত তুলে তার বীরত্বের প্রশংসা করবে। মনে মনে মবিন রিয়াজকে

মাটিতে আর্ধেক পুঁতে দেয়। তারপর পেছনে দু হাত রেখে সম্রাটের মতন দাঁড়ায়। হুকুম করে—খাইয়ে দাও। পাগলা কুত্তা দিয়ে খাইয়ে দাও। না না। কল্পনা নয়। বাস্তবেই মবিন এইসব করতে পারে। করতে পারে ভেবে সে মিল্লাতের বাড়ির দিকে কল্পনায় নয়, সত্যি সত্যিই পা বাড়িয়ে দেয়। দ্রুত ছুটে আসে। বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে আসে। তখন খুব ভোর। এসে দেখে রাজিয়া ঠাণ্ডা শরবত তৈরি করছে। দু হাতে দুটি গেলাস। শালপাতা। মিছরি। এক গেলাস থেকে অন্য গেলাসে শরবত গড়িয়ে প্রপাতের মতন নামছে। মনে হচ্ছে রাজিয়া বেহেস্তী কোন প্রপাত নিয়ে জাদুকরের মতন খেলা করছে। কোন নারীর হাতে এমন প্রপাতী খেলা দেখেনি মবিন। কী সুন্দর গড়গড় করে স্রোতের মতন ঢালু হয়ে নামছে। এক হাত উঠছে অন্য হাত নামছে। সেটা এত ছন্দময় ভাবা যায় না। এত নিখুঁত ভাবা যায় না। মনে হচ্ছে গেলাসের বাইরে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ছে না। খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মবিন। বিছানায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে আছে মিল্লাত। সেও প্রপাতের খেলা দেখছে। সামনে নারী। এক পা এক পা সামনে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। দুলে দুলে বেড়াচ্ছে। গেলাস হাতে এদিক ওদিক করছে। মিল্লাতের চোখে চাইছে। মিষ্টি করে নিঃশব্দ হাসছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মবিনকে দেখে নিয়ে এক দণ্ড গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। প্রপাত থেমে গিয়েছিল। আবার হাসি আর প্রপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। মিল্লাতও মবিনকে দেখে কেমন মৃদু আড়ষ্ট হয়। তারপর হাসে। সেই হাসি থেকে বোঝা যায় না এত ভোরে মবিনকে দেখে মিল্লাত কী ভাবছে। কতখানি অসন্তুষ্ট বোঝা যায় না। খুশি কিনা বোঝা যায় না। ঈষৎ বিরক্ত কিনা বোঝা যায় না। কিছুই বোঝা যায় না। হাসে মৃদু রেখায়। চোখ তুলে দেখে। মনে হল যেন ঘরে ঢুকতে বলছে হাসি আর চোখের ইশারায়। কিন্তু কথা বলছে না। প্রপাত চলছে। হঠাৎ মবিনের দিকে চেয়ে দেখে মিল্লাত ভয় পায়। ভয় ছিল না। ভয় এল। মবিন অনুভব করতে পারছে মিলু ভয় পাচ্ছে। কিন্তু রাজিয়া আপাতত ভয় পাচ্ছে না। কারণ সে শরবতের প্রপাত তৈরি করে চলেছে। মবিনের তখন অকস্মাৎ তেষ্টা পেয়ে যায়। প্রবল তৃষ্ণা জেগে ওঠে। গলা শুকিয়ে ওঠে। জিহ্বা শুষ্ক হয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় শরবত নয়। মদিরা। মদের ওঠানামা। মনে হয় রাজিয়া এক বেশ্যা। শাকী আর শরাবীর ভোর। মুসলমান হয়ে মবিনের মদ খেতে ইচ্ছে করে। এখান থেকে রাজিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। এরা তাকে ডাকছে না কেন ? অপমান করছে কেন ? ওরা অমন মেতে আছে কেন ? মুগ্ধ দুজন কি পৃথিবীর আর কাউকে

দেখতে পায় না ?

মিল্লাতের হাতের কাছে কোলের উপর গহনার বাক্স। ডালা খোলা। গহনাগুলি আপন মনে নাড়াচাড়া করে দেখছে। শব্দ হচ্ছে। প্রপাতের শব্দের সঙ্গে গহনার খড়খড় করা ধাতব শব্দ। ফলে অন্য এক কল্পনার রঙিন পৃথিবী। নিষিদ্ধ পৃথিবী সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলমান ধর্মবিরুদ্ধ মদ আর নারীর মাদকতা ছড়িয়ে উঠছে। কী হচ্ছে এখানে ? মবিনের গা দুলে ওঠে। তৃষ্ণা বেড়ে যায়। দেখে গেলাসটা মিল্লাতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে রাজিয়া। মিল্লাত জানালার কাছে উঠে গিয়ে সাদা জলে কুল্লি করে এল একটু। মিল্লাত গহনার নাড়াচাড়া থামিয়ে গেলাস হাতে নিচ্ছে। ঠোঁটে ওঠাচ্ছে। ওর হাত কাঁপছে। কারণ সে ভয় পাচ্ছে। রাজিয়া কেমন রহস্যময় চোখে মবিনকে দেখে। মনে হয়, এখনও সে রাজী আছে। এখনও তাকে টেনে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। পারে না। কিছুতেই পারে না মবিন। ঘরে ঢুকতে পারে না। কোন কথা বলতে পারে না। বলতে পারে না—তোমাদের কাল বিয়ে নাকি ? আমি সব শুনেছি।

কিন্তু কিছুই সে বলতে পারে না। তার গা দুলে ওঠে। চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। চোখে আগুন ফুটে বার হতে থাকে। ধক ধক করে জ্বলতে থাকে জীবন্ত মানুষ। রাজিয়ার পায়ে মবিনের লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কুকুর যেমন আহ্লাদে ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে কোথাও নেচে নেচে লেজ দুলিয়ে ছুটে গিয়ে ফিরে এসে আবার সেই স্থানে গড়িয়ে পড়ে তেমনি করে মবিনের লুটিয়ে যেতে মন চায়। পারে না। কিন্তু মুসলমান জানে, স্বামীর পায়ের তলায়, পুরুষের পায়ের তলায় নারীর জান্নাত। পুরুষ কেন লুটিয়ে পড়বে। গড়াগড়ি যাবে। হয় না। এসব বড় দুঃখের বেদনার মতিচ্ছন্নতা। মবিন কি উন্মাদ নাকি ? মবিন দরজার মুখ থেকে বারান্দায় সরে আসে। ঘরে ঢোকে না। সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে থাকে। রাজিয়া বাইরে আসে। কোন কথা বলে না। চোখে তার বিস্ময় আর ভয় জড়িয়ে যায়। বুঝতে পারে না, কেন লোকটা এসেছিল।

ফিরে চলে আসে মবিন। বাড়ি এলে হবু বউ তাকে ফুটন্ত চা এগিয়ে দেয়। শুধায়—তুমি মর্নিং ওয়াক করো বুঝি।

মবিন বলে—হ্যাঁ।

তারপর বলে—আব্বা আমার জন্য একটা বন্দুক এনেছে। দেখেছ ? কবে কীভাবে এপারে যোগাযোগ করে লাইসেন্স করিয়েছে, অবাক। আব্বার প্রচুর ক্ষমতা।

মেয়েটি বলল—আমার আব্বাই তোমার জন্য পছন্দ করে কলকাতায় এসে

কিনে দিয়ে গেছে। লাইসেন্স-ফাইসেন্স কিছু না। দু নম্বরী মাল।

—ও।

—আনব ? দেখবে ?

বন্দুক নিয়ে আসে মেয়েটি। মবিন বন্দুকের গায়ে হাত বুলোতে বুলাতে চোয়াল শক্ত করে ফেলে। সহসা ধাঁ করে ছাতে উঠে এসে আকাশে গুলি ছুঁড়ে দেয়।

এইভাবে মবিনের বিয়ের পটকা ফেটে ওঠে।

॥ আঠারো ॥

আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে নবীনা। দুই চোখ ঈষৎ ভিজে ওঠে। চেয়ে থাকতে থাকতে এক ধারা অস্পষ্ট ভয় শুরু হয়। ভাবনা শুরু হয়। রিয়াজকে খুন করার কথা বলেছিল মবিন। কথাটা কেবলই কি কথার কথা হতে পারে ? মানুষ সব পারে। মবিন বোধহয় সবই পারে। যে মানুষ সব পারে সেই মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। তথাপি নবীনার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত বিচিত্র ভাবনা খেলা করতে থাকে। সেই ভাবনার গঠন ও প্রকৃতি, তার তাপ উত্তাপ জগৎ-ছাড়া এক আশ্চর্য কাহিনী। নবীনার স্পষ্ট মনে পড়ে মবিনকে প্রথম যৌন স্বাদ দিয়েছিল যে নারী, স্ত্রী-সহবাসের গোপন অজানা যৌন বিদ্যা শিখিয়েছিল যে নারী, তার নাম নবীনা। স্ত্রী-সহবাস পুরুষের এক জৈব অভ্যাস। সেই অভ্যাসেরও দাসত্ব থাকে। নেশা আর মাদকতা থাকে। সেই নেশা আর মাদকতার পথ ধরে ভালবাসার দুয়ারে কি পৌঁছনো যায় ? নবীনা মনে করেছিল, যায় বুঝি। দেহ ছাড়া ভালবাসা কোথায়ই বা থাকে ? যৌনতা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াবে কোথায় ? 'ভালবাসি' একথা স্পষ্ট করে বলতে গেলে দেহদানের চেয়ে জোরালো ভাষা আর কী হয় ? নবীনা মবিনকে সেই কথা বলেছিল প্রথম সহবাসের সময়, বলেছিল নারীর এই দেহকে চেনালাম, এর স্বাদ কি বোঝালাম, তোমাকে, সেই কৃতজ্ঞতার বশে থেকো, সেই রহস্য ভেদ করার, দেহের তাবৎ কক্ষ কক্ষান্তর পরিচয় করানোর বিস্ময়-মুগ্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েছি, এর নাম কি ভালবাসা নয় ?

নবীনা তার এই দেহচারিতার অনুভূতিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল। গূঢ় বিচারে তার গোপন দেহ-মিলনে অন্যায়বোধ ছিল বটে, কিন্তু সেই অন্যায় করেছিল শুধু কোন যৌনতা নয়, সে ভেবেছিল, এইসব আবেশ ভালবাসারই শক্তি, একটা স্বরূপও বটে। নবীনা কি ভুল করেছিল ? মবিন একবার নবীনার

দেহ যখন সম্ভোগ করার কৃতজ্ঞতা লাভ করল, মবিনের ধর্মবিশ্বাসী দেহ আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়ার আবেদন পেশ করে চলল দিনের পর দিন। নবীনাও আশ্চর্য হচ্ছিল, তাকেও কেমন নেশায় ঘিরে ফেলেছে। সে স্থির করতে পারছিল না, এটা নেশা নাকি ভালবাসা ? সাদিকের সাথে দেহমিলনে সেই নেশা কখনও ছিল না। নবীনার মনে হয়েছিল, যে মিলনে দেহ নেশাতুর হয় না, তথায় গোলেমান, (গোলেমান—বেহেস্তী নারী বেহেস্তে গিয়ে স্বামী ছাড়াও একজন প্রবল যৌবন-দৃপ্ত পুরুষ লাভ করবে। তিনিই গোলেমান। পুরুষ পারে ৭০ জন হুরি। অপ্সরী।) নেই, তথায় ভালবাসা নেই। দেহ বারবার তাকে বুঝিয়েছিল, ভালবাসা নেই। আছে মবিনের মিলনে। নেশায়। এইভাবে গোপন অন্যায় তরঙ্গে দুটি দেহ ভেসে গেছে। তারপর ? সাদিক স্কুল চলে গেলে দিনের বেলা নির্জন দুপুরে নবীনা নিজের ঘরে হাতুড়ে ডাক্তার মবিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভয় করত। নেশায় মিশে থাকত ভয়। সেই নেশা আরো তীব্র। তা কিছুতেই রোধ করা যেত না। নবীনা ভাবে, মবিন এই গোপন অভিজ্ঞতায় কখনও কি কৃতজ্ঞ ছিল ? মবিন কি এই অভিজ্ঞতার দানকে ভালবাসা মনে করেছিল ? নবীনা তারপর উপন্যাসে পড়া ডায়ালগ বলত—তুমি এত ভিখিরি কেন ? দেহই কি সব ? নবীনা যা দেহগত উপলব্ধিতে কখনও বোঝেনি, অনুভব করেনি, তেমনি এক বানানো কথা বলত। মনে মনে জানত, দেহ ছাড়া মনই বা কতটুকু ? দেহ যা করছে, তা তো মনেরই মাতলামি। নবীনা নিজেকেই আজ প্রশ্ন করে, এই মাতলামি ছাড়া ভালবাসা কি অন্য কিছু ? সত্যিই কি অন্যতর কিছু ? সাহিত্যের বাইরে কি ভালবাসা আছে ? গ্রন্থের বাইরে ? জীবনে ? যৌনতার উর্ধ্বে কোথাও ? থাকে যদি, আমার বাপ কি সেকথা বুঝতেন ? কোন মুসলমান কি সেকথা বোঝেন ? কোন মুসলমান ? মবিন ?

মবিন কি বুঝেছিল ? কী বুঝেছিল মবিন ? দেহের দূষিত নেশা দিয়ে যে ভালবাসা শুরু হয়, কখনও কি সেই মন ভালবাসতে শেখে ? দেহ থেকে দেহান্তরে সেই মন কি ছুটে বেড়ায় উগ্র এক পাতকের মতন, তাই কি ? আসলে কি তাই ? মবিন রাজিয়ার কাছে সেইদিন ছুটে গিয়েছিল কেন ? নবীনা ভাবে, তার জন্য, সেই দুর্ঘটনার জন্য নবীনা নিজেই দায়ী। তারপর মনে হয় তার। এইভাবে সে মবিনকে নষ্ট করে দিয়েছে। যেমন রাজিয়া করেছে মিল্লাতকে। আসলে সব ভালবাসাই গোপন আর দূষিত। শুদ্ধ ভালবাসার কথা কল্পনামাত্র। তাই কি ? সমস্ত প্রকারের ভালবাসাই এক প্রকারের মাতলামি। নবীনা ভাবে, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। তারপরই মনে হয় ঠিক নেই। না। কোন কিছুই

আজ আর ঠিক নেই। সব ভুল। সব মিথ্যা। নবীনা সিদ্ধান্ত করে, দেহের মাতলামি যেদিন শেষ হয়, সেদিনই ভালবাসা শেষ হয়। অতএব ভালবাসা বলে কিছু নেই। মবিন তাকে আজ আর ভালবাসে না। কোনদিনও ভালবাসেনি। একটা উড়ুক্কু নেশার আতসবাজি যেমন দেখায়, ভালবাসা বড় জোর তাই। অর্থহীন। বানানো। মিথ্যা। কিছু নয়। কোন কিছু নয়।

দায়ী সে। মবিন যদি রিয়াজকে খুন করে, তার জন্য দায়ী সে। তারপর ভাবে নবীনা। জীবন থেকে ভালবাসা কথাটা বাদ দিতে পারলে জীবনটা কী সহজ হতে পারত। ভোগ, সম্ভোগ, এবাদত। কী সহজই না ছিল নিসার হোসেনের জিন্দেগি। খাওয়াদাওয়া, স্ত্রী-বাস আর খোদার বন্দনা। সহজ ছিল। কোন কষ্ট ছিল না। হাহাকার ছিল না। অথচ ভালবাসা নামের একটি কাল্পনিক শব্দে কী জটিল ক্ষমাহীন কষ্ট তৈরি করেছে মানুষ। আচ্ছা, এই সব কেন করেছে মানুষ ? বলুন তো, রিয়াজজী ! নবীনা হঠাৎ সচকিত। কোথায় রিয়াজজী ? আকাশে বিষণ্ণ চাঁদ, অশ্রুমাখা ধূসর জ্যোৎস্না ছাড়া কোথাও কেউ নেই। তথাপি রিয়াজজীর কাছে নবীনার দুটি তিনটি প্রশ্ন আছে। জানবার আছে।

১। রাজিয়া আর মিল্লাতের সম্পর্ক ভালবাসার সম্পর্ক কীভাবে ? কেন এই সম্পর্ককে ভালবাসা বলব ? আপনি রাজিয়ার সহায় হতে চান কেন ? (আপনার কোন কথাই ঠিক মতন শোনা হয়নি রিয়াজজী !)

২। মবিন আর নবীনার সম্পর্ক কি ভালবাসা নয় ? (এ প্রশ্ন কি আপনাকে করা যায় ?)

৩। দেহের মাতলামি কী জিনিস আপনার অভিজ্ঞতা নেই। অতএব ভালবাসা বলতে আপনি যে কাল্পনিক শব্দটি তৈরি করেন, কেন তা করেন ? (আপনাদের মতন মানুষ এইভাবে কল্পনা করেন, তাদের ধ্বংস করলে, খুন করলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হয় ?)

এই মুহূর্তে নবীনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তিনি খুন হবেন। অর্থাৎ রিয়াজ খুন হয়ে যাবেন। বারবার সেই একই কথা, 'মবিন তাঁকে মেরে ফেলবে'—মনের মধ্যে গড়িয়ে যায়, গড়াতে থাকে। সহসা আকাশের চাঁদ ভয়ে আরো ধূসর ও ঝাপসা দেখায়।

সারারাত নবীনা ঘুমাতে পারে না। বারংবার মন বলে ওঠে, লোকটি খুন হবে। কেন খুন হবে না ? সমাজের চোখে তার মতো অপরাধী আর কে আছে ? তার মতো অসহায়ই বা কে ? তার লোকবল নেই। তার পেছনে ধর্মশক্তি নেই। সে একা। একঘরে। এমন লোক খুন হলে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। তার

জন্য কাঁদবার মতন পৃথিবীর কোথাও কেউ নেই। রাজিয়া কাঁদবে। সে কান্না পৃথিবীর কেউ শুনবে না। চোরের মতন কাঁদতে হবে। বলতে পারবে না কেন সে কাঁদছে। কেন খুন হল সে কথাও কেউ বিচার করবে না। কারণ ঐ জাতের মানুষ খুন হওয়াই যেন রীতি। অতএব তিনি খুন হবেন। নবীনা কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। ভাবতে ভাবতে একসময় সে নিঃসন্দেহ হয়ে যায়, খুন অবশ্যম্ভাবী। রিয়াজের দিন ফুরিয়ে এসেছে। দূষিত ভালবাসা মরবার আগে পৃথিবীর শুদ্ধ মানুষকে মেরে দিয়ে যায়। ইতিহাসে প্রচুর ঘটনা। সেই ভালবাসা নারীর কর্দমাক্ত যোনিদেশ থেকে উত্থিত হয়ে পৃথিবীর তীব্র গাঢ় অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। নবীনার মনে হয় তার যোনিগহ্বর পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত ক্ষতচিহ্ন। দগদগে ঘা যেন বা। পৃথিবীর তাবৎ অপমান সেইখানে জমা করেছে মানুষ। ভাবতে ভাবতে নবীনার আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়। গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বার হয়—আব্বা গো।

নবীনা সারারাত জেগে থাকে। শুয়ে থাকে। কিন্তু ঘুমায় না। ঘরের প্রদীপ তাবৎ রাত দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

নবীনা কেন মিল্লাত ও রাজিয়ার গোপন বিবাহের খবর মবিনকে পৌঁছে দিল। সেকথা কেন সে গোপন রাখল না? সমস্ত দিক থেকে এক আশ্চর্য অপরাধ নবীনাকে পিষে ফেলতে থাকল। সেই মানুষ কি ঘুমাতে পারে? পরের রাতও নির্ঘুম কাটল। এবং পরের দিন ভোর পৌনে পাঁচটার গাড়িতে চেপে বসল নবীনা। শহরে পৌঁছল।

রিকশায় করে রিয়াজের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে নবীনার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, রিয়াজকে কী করে বলবে এই সব? এত ভোরে গ্রাম থেকে ছুটে এল কেন? নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তিনি? তখন কী উত্তর করবে নবীনা? নবীনার মনে হল, এমন করে ছুটে আসা সত্যিই কি অনিবার্য ছিল? নবীনা নিজেই আপন মনে উত্তর করল—তাছাড়া কী উপায়? এই অবস্থায় মন যে ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তার মনের প্রকৃত অবস্থা কি রিয়াজজী বুঝতে পারবেন? তিনি ভুল বুঝবেন না তো! অবিশ্বাস করবেন না তো? এই ধারা এক টানাপোড়েন চলতে থাকে। রিকশা এসে রিয়াজের গলির মধ্যে থামে। রিকশা থেকে নেমে নবীনা রিয়াজের দরজার কাছে চলে আসে। ভোরের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভোরে আজ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। পৃথিবীর কোথাও রাত্রে হয়ত বৃষ্টি হয়েছে। দরজা খোলা। বাইরের বারান্দার বদনা থেকে জল গড়িয়ে মুখের ব্রাশ ধুয়ে নিচ্ছে রিয়াজ। মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। তোয়ালেয় মুখ মুছে নেয়।

সিমেন্টের মেঝেয় রাখা চশমাটা ওঠায়। চোখ পড়ে। ঘাড়ে তোয়ালে ফেলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নবীনার দিকে চোখ পড়ে। এক হাতে বদনা। অন্য হাতে ব্রাশ পেস্টের টিউব, জিভ-ছোলা। গায়ে গেঞ্জি। পরনে ধুতি লুঙ্গির মতন ভাঁজ-করা। পায়ে চটি গলিয়েছে রিয়াজ। থমকে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল—আসুন। নবীনা এগিয়ে এল। বারান্দায় উঠে এল। সামনাসামনি মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল—এত ভোরে আমায় দেখে অবাক হচ্ছেন বুঝি ? সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। কেবলই আপনার কথা মনে হয়েছে। ভাবলাম, আপনার যদি কোন বিপদ হয়। আমি আপনার অনেক ক্ষতি করেছি রিয়াজজী !

বলতে বলতে নবীনার দুই চোখ ছলছল করে উঠল। রিয়াজ লক্ষ করছিল, খুব উদভ্রান্ত চেহারা। চোখেমুখে অনতিস্পষ্ট বেদনার নিবিড় চাপা আঁচড় ফুটে আছে। কেমন ঈষৎ ভীত ভাব। লক্ষ করছিল, নবীনাও বড় সুন্দরী মহিলা। চোখ দুটি বড় বড়। ঘন কালো না হলেও সোলেমানী চোখ। এক ধরনের সাদা মণি দুটি হাসিখুশি, অথচ বুদ্ধিমাখা সৌন্দর্যে নিবিড়, কিঞ্চিৎ বিষণ্ণও। রাজিয়ার চেয়ে সামান্য লম্বা মনে হয়। একটু পাতলাও। মিল্লাতের স্বাস্থ্য একটু স্থূলের দিকে। তার বোন একটু পাতলার দিকে। দুজনের আদলে মিল আছে কোথাও কোথাও। সবই আজ লক্ষ করছিল রিয়াজ। চোখ দুটি ছলছল করে ভিজে আসতে সত্যিই বড় অবাক হয়। বলে—আপনি আমার ক্ষতি করবেন কেন ? আপনার সেই সুযোগ কোথায় ? আপনি খুব ভালো মেয়ে, কারো ক্ষতি করতে পারেন, এ কথা বিশ্বাস করি না। আসুন, ভেতরে আসুন। এত ভোরে এসেছেন, আপনাকে কী খেতে দেব ? আমি ভোরে মুড়ি আর চা খাই। গরম দুধে মুড়ি ফেলে দিয়ে নেড়েচেড়ে খেয়ে নিই। মুড়ির নিজস্ব খাদ্যমূল্য একেবারেই নেই। তাই দুধ দিয়ে খাই। খাবেন ? আমার একটা স্টোভ আছে। রাতের বাসি দুধ আছে। ফুটিয়ে দিচ্ছি, আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন। বিছানাটা গুছিয়ে নিলে পর চৌকিতে আরাম করে বসবেন। আমি খুব অগোছালো মানুষ।

বলেই রিয়াজ বিছানার চাদর টেনে নেয়। ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চৌকির তলার বড় বাক্স থেকে একখানা নতুন চাদর বার করে পাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিয়াজের ব্যস্ততা লক্ষ করে নবীনা। বলে—আপনার স্টোভটা কোথায় ? আপনার রান্না কোথায় হয় ? রিয়াজ চাদর পেতে বালিশটা ঠিকঠাক করে গুছিয়ে বলে—হয় না। তারপর নবীনার চোখে চোখ রেখে ঈষৎ নিঃশব্দ হাসে। বলে—আমি হোটেলে খাই।

—আপনার টাকাপয়সা কী করেন ?

—উড়িয়ে দিই।

—কেন, বাপ মা ভাইবোন ?

—বাপ কোথায় জানি না। মা বড়লোক। মাকে দেখবার লোক ছিল। এখন তিনি নেই। মা। আসলে আমার কেউ নেই। আমি একা। ঠিক রাজিয়ার মতন আমারও কেউ নেই,আমার জীবনে বাপ মা কথাটা খুব ভুল। একেবারে ভুল কথা। আমার কেউ নেই। আমার পরিচয় আপনাকে পরে শোনাব। অবিশ্যি তা শুনেই বা কী হবে। খুব বাজে কথা। ঠাট্টার কথা। আমি খুব ছোটলোক নবীনা। আপনার ঘেন্না করবে।

বলতে বলতে রিয়াজ পাশের একটা ফালি ঘরে ঢুকে যায়। একটু পরে স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসে। নবীনাও ফালি ঘরে ঢুকে আসে। লম্বা ছোট এক ফালি রান্নাঘরের মতন। সেখানে রিয়াজ দুধ ফুটিয়ে নিচ্ছে। প্রশ্ন করে—আমার কী ক্ষতি করলেন নবীনা, বলুন শুনি !

নবীনা কোন কথা না বলে স্টোভের কাছে নিচু হয়ে বসে ন্যাকড়া ধরে দুধের ফুটন্ত বড় টিনের বাটি নামিয়ে ফেলে। শুধায়—ঐ টিনে বুঝি মুড়ি আছে ? চিনির বয়ামটা তাক থেকে দিন। টাটকা পাউরুটি খেলে তো পারেন। একটু জেলি মাখিয়ে নেবেন। দুধে ভিজিয়ে খেলেও হয়।

রিয়াজ উত্তর না করে স্বল্প হাসে। বয়াম এগিয়ে দেয়। শুধায়—আপনার ঘুম হল না। কেন ? আমার কী কথা মনে হচ্ছিল আপনার ? আমি কিন্তু খুব কষে ঘুমিয়েছি আজ। মাথাটা ছেড়ে গেছে। আজ ওদের বিয়ে। ভারি চমৎকার দিন আজ। আপনি এসে ভালই করেছেন। আপনাকে সঙ্গে করে লগ্নের কাপড়চোপড় কিনব। কেমন ?

দুধের আধেক অন্য বাটিতে ঢালে নবীনা। মুড়ি আর চিনি ফেলে একখানা চামচ দেয়। অন্য বাটিটাও সেইভাবে তৈরি করে। চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। বলে—আপনি ঐ ঘরে গিয়ে খেতে শুরু করুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

বাটি হাতে করে রিয়াজ এ ঘরে চলে আসে। চামচে তুলে মুড়ি খেতে শুরু করে। পাঁচ সাত মিনিট বাদে নবীনা গেলাসে জল, কাপে চা নিয়ে পাশের ঘরে চলে আসে। টেবিলে রাখে। শূন্য বাটি ফেরত নেয়। রান্নাঘরে রেখে অন্য কাপটা নিয়ে ফিরে আসে। চায়ে চুমুক দিয়ে চৌকিতে বসে যায়। রিয়াজ চেয়ারে বসেছে।

নবীনা বলে—আমি ওদের বিয়ের কথা মবিনকে বলে দিয়েছি। মবিন

আপনাকে খুন করতে পারে।

কথা শুনে রিয়াজ হো হো করে হেসে ফেলে। নবীনার মনের অবস্থার সবখানি সে স্পষ্ট ধরতে পারে। সবখানি নয়। তবে অনেকখানি। কারণ মানুষের মনের সবখানি কখনও ধরা যায় না।

রিয়াজ বলে—চা খাওয়া শেষ করে চলুন, একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি। এখন আমার খুন হওয়ারও সময় নেই। বহুৎ কাজ। বিয়েটা দি। তারপর খুনটুনের কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে।

—আপনি কিন্তু মবিনকে মেরেছেন।

—হ্যাঁ। একটা চড় মেরেছি বটে। মারব না?

—মবিন তালাকনামা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেকথা ঠিক।

—তবু আপনি....

—তবু আমি এই বিয়ে দেবই।

—রিয়াজজী!

—বলুন!

—আজ যদি সত্যিই কোন অঘটন ঘটে, তার জন্য কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমিই কেবল দায়ী হব।

—আপনি খুব বেশি ভাবছেন! নিজেকে দায়ী করছেন কেন? বুঝতে পারছি, আপনি খুব ভয় পেয়েছেন।

—আপনি যা কল্পনা করেন, আপনি তাই করতে চান, সেটা কি ঠিক?

—মানুষ তার নিজ কল্পনা মতন কাজ করে। আপনি নিজেও তাই করছেন। কল্পনা করলেন, আমি খুন হব। সাবধান করতে ছুটে এলেন। আপনারা কল্পনা করেছিলেন রাজিয়া আর মিল্লাত মা ছেলে, তাই ওরা মা ছেলে হয়েছে। তার বেশি তো নয়। আমি আমার কল্পনাশক্তি দিয়ে এই মিথ্যা কল্পনার প্রতিবাদ করেছি। তার বেশি কিছুই না।

—আপনি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। গুলিয়ে দিচ্ছেন।

—কী হবে কল্পনার অভিযোগ তুলে, যা করেছি, যা করতে চাইছি, বাস্তবের চেয়ে সুন্দর বলেই চাইছি। শুধু কল্পনার তো কোন মানে নেই। মবিন যা কল্পনা করে, অন্তত নিজের ক্ষেত্রে, কখনও সে তা করে না। যা কখনও কল্পনা করে না, তাই সে করে। কল্পনার শক্তি মনের। তার জীবনে মন নয়, প্রবৃত্তিই বড় কথা। ঐ প্রবৃত্তিই তালাকনামা ছিঁড়ে ফেলে।

—ঐ প্রবৃত্তিই তো খুন করতে পারে।

—পারে।

—যতক্ষণ বিয়ে না হচ্ছে, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। কথা দিন, তাই হবে।

—বেশ। তাই হবে। কিন্তু তারপর? তারপর তো চলে যাবেন। তখন আমাকে দেখবে কে?

—আপনি একটা বিয়ে করুন! আপনার জেদ ভালো জিনিস। কিন্তু তারও তো একটা সংযম লাগে। বউ সেটা দিতে পারে।

—বউরা সাধারণত আপোস শেখায়।

—ভুল কথা। আমি কি আপোসের কথা বলেছি?

—তবে সংযমের কথা উঠছে কেন?

—আপনার জেদ খুব তীব্র কি না!

—হ্যাঁ। কল্পনাও খুব দুর্মর!

হা হা করে হেসে ওঠে রিয়াজ। আপন মনে সুন্দর করে হাসে। বলে—আজ খুব আনন্দ আমার। আমি আমার কল্পনার জোরে একজনকে জিতে নিতে পেরেছি। আপনাকে সাহসী করে তুলেছি আমি। জীবনে এতবড় লাভ কিছু হয় না। আমার কাছে আসতে আপনি বাধ্য হয়েছেন!

—তবু আমার ভয় করে রিয়াজজী!

নবীনার গলা কেঁপে যায়। ওরা চা খাওয়া শেষ করে। নবীনা বলে—আপনার কল্পনাশক্তি সত্যিই দুর্মর, নইলে শত্রুও যে মিত্র হয় কী করে বুঝে পাই না। সবই কি কল্পনার জোর? আমি কে বলুন তো! বউ থাকলে বুঝিয়ে দিত, আমি মবিনের লোক। বিশ্বাস করো না। বউ বলত। কে আছে আপনার যে সেকথা বোঝাবে? শত্রুকে চেনাবে? বলুন? রিয়াজ এঁটো কাপ দুটিকে রান্নাঘরে রেখে আসে। গায়ে সার্ট চড়ায়। বলে—মবিন আপনাকে কখনও ভালবাসেনি। কল্পনা বলছেন, আপনি সেই কল্পনা করেছিলেন মাত্র। জাস্ট এ ড্রিম।

একটা চটের থলে হাতে ঝুলিয়ে কালো হয়ে আসা নবীনার মুখের দিকে চেয়ে রিয়াজ তাগিদ দেয়—চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

মবিন যে ভালবাসেনি, শুধু এই কথাটুকু এত স্পষ্ট করে বলল রিয়াজ যে নবীনার জীবনে এই প্রথম একটা অপমানবোধ জেগে উঠল আচমকা। তেমন অপমান কখনও সে অনুভব করেনি কোনদিন। কেন করেনি, সেকথা সে বুঝে

পেল না। একটা চরম সত্যকে আজ সে দেখতে পেয়ে গেল। বিশ্বাস করতে শিখল। কথাটা এত বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল কেন, তারও কোন ব্যাখ্যা নবীনা জানে না। নবীনা বলে—আপনি আমাকে এভাবে অপমান করছেন কেন? ব্যাকুল শোনায় তার কণ্ঠস্বর। রিয়াজ বলে—অপমান করিনি। কোন ব্যাপারেই আমার কল্পনাশক্তি যে খুব কাঙাল নয় সেই কথা বলেছি। আপনি এখনো মবিনকে ভালবাসেন। এবং আপনি খুব ভাল মেয়ে। যাক গে। চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাজার খুলে গেছে।

ওরা রাস্তায় নেমে আসে। রিক্সায় ওঠে। কথা বলতে শুরু করে রিয়াজ। বলে—ভালবাসার তিনটি গতি আছে। নদীর মতন। একটা নিম্নগতি, একটা মধ্যগতি, একটা উচ্চগতি। নদীর মতন তিনটি গতি ঠিক কথা। কিন্তু তার প্রবাহ উল্টোদিকে। নদী যায় নিচে। ভালবাসা ওঠে উপরে। সেইদিকেই তার বিস্তার ও গভীরতা। তাই এর নামকরণও করেছি নদীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাদা। কেমন? কথা শুনে সচকিত হয় নবীনা। ঘাড় ঘুরিয়ে খুব কাছে থেকে কল্পনার মানুষটিকে দেখতে থাকে। রিয়াজ বলে—দেহের তিনটি ভাগ। নিচের ভাগে থাকে নিম্নগতির ভালবাসা। সেই ভালবাসা নদীর পার্বত্যগতির মতন উগ্র। সেক্স থেকেই ভালবাসার উৎপত্তি। কিন্তু সেই উৎপত্তিস্থল থেকে ভালবাসাকে অনেক দূর এই বুক অবধি মধ্যগতির কল্যাণের দিকে পৌঁছতে হয়। সেখানে নদীর উভয় তীরে মানুষের সভ্যতা, বসবাস, সমাজ। তারই মাঝ দিয়ে বুকের মাটি ভিজিয়ে, পলি ফেলে ফেলে ফসল ফলিয়ে, সমাজ আর সভ্যতাকে উর্বর আর সবুজ আর সুখী করে দিয়ে ভালবাসা এগিয়ে যায়। ঠিক নদীর মতন। পলিজলের সোহাগ, সবুজের স্নিগ্ধ সমারোহ, আবেগ, ছলছলানো আদর তার সম্বল। এরই নাম মধ্যগতির ভালবাসা। মাঝারি আর সাধারণ মানুষের কল্যাণকর ভালবাসা। সেক্স আছে, কিন্তু সেক্সের সঙ্গে আরো অনেক কিছু আছে। কেমন? আমি কিন্তু আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি না। বুদ্ধি দিচ্ছি। কথা কি, আপনি ভালবাসার কথা শুনতে চেয়েছেন। প্রথম থেকেই বারবার বলছেন, রাজিয়ার ভালবাসা আসলে নিন্দনীয়। আপনার ভয় করছে। তাই না?

ঘাড় ঘুরিয়ে রিয়াজ মিষ্টি হেসে একবার নবীনাকে দেখে নেয়। বলে—তিনটি গতিই বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আবার তিনটি গতিই আলাদা। স্বরূপে স্বতন্ত্র তারা। কোথায় কীভাবে বদলে যাচ্ছে, সীমারেখা দেখানো মুশকিল। জিনিসটা অনুভব করলে পাওয়া যায়। চোখ থাকলে দেখাও যায়। তা, তারপরেও আরো একটা গতি আছে। সেখানে পৌঁছলে মহাসমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। সেটা খুব

বিপুল, ব্যাপ্ত, খুবই গভীর। মাঝারি ভালবাসায় আবেগ, স্নেহ, আদরই প্রবল। যুক্তি কম। তৃতীয় ভালবাসা যুক্তি আর মননির্ভর। আবেগ অতিশয় সূক্ষ্ম। সেক্স সেখানে দূরবর্তী, আরো পরিশীলিত, আরো কী বলব, শান্ত হয়ে আসে। রাজিয়ার ভালবাসার মধ্যভাগ নেই। পার্বত্য উৎসের পাশেই সমুদ্রের বিশালতা। তাই সমাজ তাকে সইতে চাইছে না। আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি? রাজিয়ার ভালবাসা আকস্মিক, অস্বাভাবিক, তীব্র গতিশীল এবং দুঃসহ। বেমানান। যেমন যুক্তিযুক্ত, তেমনি যুক্তিহীন। দূষিত ইচ্ছের বিদ্রোহ দিয়ে সেই ভালবাসা তৈরি হয়েছে। তা কখনও সমাজকে মজাতে পারে না। আবার কোন কোন ভালবাসার তিনটি গতিই থাকে। দেহের তিন ভাগে তিন ধরনের ভালবাসা থাকে। বুক ছাড়িয়ে মস্তিষ্কের দিকে প্রসারিত ভালবাসা একেবারে অন্য কথা।

নবীনা শুধাল—আপনি সেই ভালবাসা কখনও দেখেছেন?

—না। শুনেছি। বইতে পড়েছি।

—কখনও ভালবেসেছেন?

—না।

—কেন?

—ভালবাসাকে এইভাবে বুঝেছিলাম বলেই যেমন তেমন করে ভালবাসতে পারিনি। নইলে নিম্নগতির ভালবাসার সুযোগ সব জীবনেই থাকে। অশ্বের মতন দিশেহারা, ক্ষ্যাপা, ছুটন্ত ভালবাসা, লক্ষ্যহীন ভালবাসা পাওয়া কি যায় না? সেটা নিচেয় নামায়, উপরে তোলে না। কত গঙ্গোত্রী পৃথিবীতে শুকিয়ে গিয়েছে, হিমবাহ অতিক্রম করেনি। পাহাড়ের ফাটলে ঢুকে গেছে। গুমরে গুমরে শেষ হয়ে গিয়েছে। মবিনরা সেকথা বুঝবে না। খুব ছোটদরের সমাজে বসবাস করলে সেকথা বোঝাও যায় না।

সহসা নবীনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। কান্নার নিঃশব্দ চাপে তার দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে। অস্ফুট চাপা আর্ত মৃদু কান্না যেন কোন পাহাড়ের ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে মনে হয়। কোন একটা উৎস শুকিয়ে থেমে পড়ছে। রিয়াজ লক্ষ করে আহত আর বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারও দিশেহারা ভাব আসে। নবীনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পিঠে হাত রেখেই টেনে নেয়। নবীনা আশ্চর্য প্রকার শিউরে ওঠে। শিরশিরানো একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে টেনে নেয় সে। বুক রুদ্ধ হয়ে আসে। নিম্নগতির ভালবাসা কথাটা তার বুকে মুদ্রিত হয়ে যায়। নিজেকে তখন তার খুবই ক্ষুদ্র, নিচু, বর্বর মনে হয়। তারও কল্পনা করতে ইচ্ছে করে, পৃথিবীর কোথাও একটা খুবই উন্নত সমাজ রয়েছে। কিন্তু কোথায় রয়েছে

রিয়াজ কেন বলে দিচ্ছে না ? রিয়াজকে হঠাৎ তখন খুবই নিষ্ঠুর, দয়াহীন মনে হতে থাকে নবীনার। সেই জগতের প্রবেশদ্বার কোথায়, নবীনা সেখানে কীভাবে প্রবেশ করবে ? নবীনার অন্তস্তল পিষে পিষে যায়। কণ্ঠ ভরে আসে কান্নার চাপে। কত উপরে রিয়াজ রয়েছে, তাকে যে কিছুতেই ধরা যায় না। লোকটি পাশে বসে আছে, কিন্তু কী স্বাভাবিক ; অটল। ভাল করে সুন্দরী মেয়েদের দেহের দিকেও চেয়ে দেখে না। শুধু চোখের দিকে চেয়ে কথা বলে। কী অসম্ভব শক্তিশালী মানুষ। ফ্রেঞ্চকাট আর শিয়ার মিশেলে তৈরি দাড়ির থুতনি আর গ্রীবা কী মারাত্মক রকম তীক্ষ্ণ, চোখা, অহংকারে উদ্ধত। নবীনা মনে মনে ভাবে, 'আমাদের মতন মেয়েদের কাছে, তার কি কোন কিছুই চাওয়ার নেই ? চেয়ে দেখার কিছুই নেই ? লেখাপড়া যে কিছুই শিখিনি। কত বোকা মানুষ আমরা !'

রিক্সা থামে। নেমে পড়ে রিয়াজ। সোজা হয়ে বসে নবীনা আঁচলে চোখ মুছে নেয়। রিয়াজের দিকে ভাল করে চাইতে পারে না। নেমে পড়ে। পায়ে পায়ে রিয়াজের পিছু পিছু ঘাড় নিচু করে এগিয়ে যায়। ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। চারপাশে দোকানপাট আগরবাতির গন্ধে খুলে যাচ্ছে। ওরা একটি কাপড়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। পাশের মনোহারীর দোকান থেকে একটা চামড়ার বড় স্যুটকেস আসে। দোকানদার তালিকা অনুযায়ী বিয়ের যাবতীয় সুবাস প্রসাধন স্যুটকেসে ঢুকিয়ে দামের তালিকা তৈরি করে পাঠিয়েছে। রিয়াজ তালিকা দেখে চাকরের হাতে দাম পাঠিয়ে দিয়ে কাপড় পছন্দ করতে থাকে। বলে—আপনি নবীনা দু'খানি শাড়ি, দুটি ব্লাউজ আর যা যা লাগবে পছন্দ করে নিন। আর আপনাকে আমি এই বিয়েতে একটা শাড়ি ব্লাউজ প্রেজেন্ট করব। সেটিও আপনি পছন্দ করুন।

নবীনা বিস্ময়ে লজ্জিত হয়—আমায় কেন ?

রিয়াজ বলে—বিয়েতে এইরকম দেওয়ার রেওয়াজ আছে বোধহয়। জানি না ঠিক। আপনাকে দিচ্ছি ; সেটা খুশি হয়ে দিচ্ছি বলতে পারেন। বিয়ের দিনে নতুন কাপড় পরলে বিয়েটা বেশ রঙিন হয়ে ওঠে।

নবীনা বলে—তাহলে আমিও আপনাকে পাজামা পাঞ্জাবি দেব। নেবেন তো ?

রিয়াজ বলে—নিশ্চয়।

নবীনা ভীষণ খুশি হয়। দোকানদারও খুশি হয়। কেনাকাটার পর ওরা দোকান থেকে নেমে আসে। রিক্সায় বাক্স ওঠানো হয়। তখনই মবিন, মবিনের বাবা, আকবর মৌলবী কাপড়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। মবিন নবীনার

পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে—ভাইয়ের বিয়ে দিচ্ছ তাহলে ? আমাদের নেমন্তন্ন না করলেও আমরা কিন্তু যাব। মজ্জব করব।

রিয়াজ কথাটা শুনতে পায়। বলে—তুমি তো করলে না, তাই মিল্লাতকে করতে হচ্ছে।

মবিন বলল—মিল্লাতের এঁটো জিনিস আমায় ছুঁড়ে দিচ্ছিলে, তখন বুঝিনি। তোমায় তো বলেই ছিলাম করব। কিন্তু....

রিয়াজ সহসা উত্তেজিত হয়ে মবিনের ঘাড় খামচে ধরে—মুখ সামলে কথা বলো মবিন, ভদ্র হও। নইলে......

—নইলে কী করবে শুনি ? মারবে ?

—মারলেও তো তোমার লজ্জা হয় না। আজ মারব না। ক্ষমা করে দেব। কারণ আজ বিয়ে।

—এটা কী হচ্ছে বাবাজীবন রিয়াজ। মবিনের বাবা হাত ধরে ছেলের ঘাড় থেকে রিয়াজের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলেন—আমার ছেলেটাকে পাপের সাথী নাইবা করলে আব্বাজী, যা করছ নিজেই করো। ডেকো না। সব শুনেছি আকবরজীর মুখে। তুমি কোন মায়ের পয়দা কি না সন্দেহ হয়। যাও। চলে যাও। এই দোজখী মেয়েটাকেও জুটিয়েছ বেশ। তুমি তো আমাদের কউমের লোক নও। নাস্তিক।

বলেই তিনি ছেলের হাত ধরে মৌলবীকে নিয়ে দোকানে ঢুকে পড়েন। নবীনা বলে—চলুন রিয়াজজী। বেলা হয়েছে।

রিয়াজের চোখমুখ দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে থাকে। রিক্সায় চেপে রিয়াজ বলে—আমি কেমন মায়ের পয়দা শুনবেন ? আমার দুটি বাপ। মা একটি। একটা বাপ জন্ম দিয়েছে। আর একটি বাপ ভাত দিয়েছে। কেমন ? কেন এমন হল ? শুনুন তাহলে। রিয়াজ বলতে থাকে। গাঁয়ের নাম বলকপুর। ছোট গাঁ। সেই গাঁয়ে এক আধা-শিক্ষিত গেরস্ত বাস করত। সম্পন্ন অবস্থা। জোতজমি আছে। চাকর-কিষেণ গণ্ডাখানেক। পুকুর খামার বাগান সব আছে। একটা বন্দুক আছে। পাকা বাড়ি। বড় দালান। লোকটির নাম আলিজান মণ্ডল। বউয়ের নাম আদিনা মণ্ডল। ঠিক আছে ? তো সেই আলিজান মণ্ডল প্রায় দিন ভাতের থালায় আদিনার চুল পেত খাওয়ার সময়। গা ঘিনঘিন করত। বমি বমি করত। আদিনা বোধহয় একটু আলুথালু মেয়ে। তাছাড়া চাকরবাকর কিষেণ নিয়ে বিরাট গেরস্তালি সামাল দিতে গিয়ে অমন একটু আলুথালু হওয়া বেমানান বলব না। মাথা থেকে কখন চুল খসে পড়ে বেচারি বুঝবে কী করে। শিশির

পড়া আর মাথার চুল পড়ার শব্দ শোনা যায় না। সেই কারণে মাথার চুল খসে পড়লে আদিনা বুঝতে পারত না।

নবীনা বলল—আজ কিন্তু মারামারি হয়ে যেত। আপনি ঐভাবে হঠাৎ করে ক্ষেপে উঠলেন কেন ? মবিন কেমন রুখে উঠল দেখলেন ? আমার ভয় করে, খুব ভয় করে। সাদিক ওর দলের লোক। আকবর মৌলবী ওর লোক। মারামারি বাধলে আপনার পাশে কে দাঁড়াত। গুণ্ডা বদমাশ সব মবিনের বশ। কেন ওকে ঐভাবে মারতে ওঠেন ? আপনার কে আছে ? আমাদের দেখে মবিনের চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। ওরাও লগ্ন কিনতে বেরিয়েছে বোধহয়।

রিয়াজ বলতে লাগল—দাদীমা একটা ধাঁধা বলতেন। শুনবেন ?

খাওয়ার আগে বলে কী ?
খাওয়ার শেষে বলে কী ?
নিঃশব্দে পড়ে কী ?

খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ। খাওয়ার পর আল্‌হামদোলিল্লাহ। আর নিঃশব্দে পড়ে শিশির। আমি বলতাম, দাদীমা ! তুমি বলেছিলে আমার মায়ের মাথার চুল নিঃশব্দে খসে পড়ত ! সে কারণে বাপ মাকে তালাক দিয়েছিল। আলিজান আদিনাকে তালাক দিয়েছিল।

চোখ-মুখ মুহূর্তে পাকিয়ে ওঠে রিয়াজের। নবীনা লক্ষ করে বেচারি আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে, পৃথিবীর কোন কথা তার কানে প্রবেশ করছে না। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা যেন কিছুই নয়। একটু বাদে রিক্সা থেকে নেমে পড়ে রিয়াজ। ঘরের চাবিটা নবীনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—বাড়ি গিয়ে দরজা খুলে মাল নামিয়ে নেবেন।

রিক্সাঅলাকে বলে—স্যুটকেস নামিয়ে দিও। আর এই নাও টাকা।

নবীনা শুধায়—আপনি কোথায় যাবেন ?

হাতের থলিটা দেখিয়ে রিয়াজ বলল—বাজার করে নিয়ে যাই, নৈলে কী খাবেন ! আজ আপনাকে রান্না করতে হবে। হাঁড়িপাতিল সব আছে। ভয় নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমি বাটনা বাটতে পারি।

বলেই রিয়াজ হনহনিয়ে উত্তর দিকের বাজারে ঢুকে গেল।

রিক্সাঅলা লগ্নের স্যুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। পনের-বিশ মিনিট পর রিয়াজ ফিরল। বলল—আপনাকে খুব রুখু-শুখু দেখাচ্ছে। ভাল করে স্নান করবেন। খাবেন। একটা ভালমতন ঘুম দেবেন। স্যুটকেসটা কখন পৌঁছব ? সন্ধ্যায় যখন যাব সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে, কী বলেন ? আরে বাপ, আসল

কাজটাই তো বাকি, মৌলবী ডাকতে যেতে হবে। দুধিচকে বাড়ি। ডালভাঙা পথ। পাকা সড়ক নেই। হটরমটর রাস্তা। সুধা সাইকেল স্টোর থেকে সাইকেল ভাড়া করব। সব বলে রেখেছি। আচ্ছা, আপনি গান গাইতে পারেন ? বিয়ের গান ?

না। মাথা নাড়তে নাড়তে নবীনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। হাতের থলেটা মেঝেয় নামাতে রিয়াজ বলে—আজ বড় চমৎকার দিন। বড় সুখের দিন। আনন্দের দিন। আজ খুব খাওয়াদাওয়া হবে। গান হবে।

—আমি যে গান গাইতে পারি না। নবীনা বলল।

—তাহলে আপনি শুনবেন ! আমি গাইব। আমার গান শুনলে আপনার খুব হাসি পাবে। মুসলমানের গান গাওয়া হারাম। ছবি আঁকা হারাম। যত সূক্ষ্ম ভাবনা, যত গভীর সৌন্দর্য সবই হারাম। মেয়েমানুষের খুব সূক্ষ্ম চুল অজান্তে মাথা থেকে খসে পড়া হারাম। আমি তাই পৃথিবীর কাছে আজ খুব সূক্ষ্ম, খুব গভীর আর খুবই প্রসিদ্ধ একটা পাপ করব। লোককে দেখিয়ে বলব, এই এদের, মিলু আর রাজিয়ার বিয়ে দিয়েছি আমি। দেখুন, কেমন চুলের মতন সূক্ষ্ম ধারালো প্রায় অদৃশ্য একটা পাপ করে ফেলেছি। মা ভৈঃ ! আপনি মাংসটা কুটে দিন। আজ বেশ খাওয়াদাওয়া হবে।

নবীনা থমথমে মুখে রিয়াজের হাত থেকে মেঝেয় নামিয়ে রাখা থলেটা তুলে নেয়। রিয়াজ ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা বড় টিনের থালা এনে বলে—এতে রাখুন ! কিছু পটল আর আলু এনেছি। মাংসে ফেলে দেবেন। হলুদ জিরে পাঁচসম্বরা সব এনেছি। গরমমশলা এনেছি। লঙ্কা এনেছি। পেঁয়াজ তেল। সব এনেছি। চাল এনেছি। সাবধানে রাঁদ্‌বেন, যেন মাথার চুল খসে না পড়ে।

নবীনা কোমর সটান করে খুব স্পষ্ট করে রিয়াজের চোখে চাইল। বলল—চুল পড়ার সুবাদে আমায় যদি সাদিক তালাক দিত রিয়াজজী ! কিন্তু আমার চুল না পাকলে খসবে না যে ! কী করব আমি, বলুন ! বলুন না !

নবীনার গলা ককিয়ে ওঠে। চোখ চিকচিক করে ওঠে। রিয়াজের মুখচোখ কেমন শুষ্ক আর বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বলে—আপনি মামলা করবেন ? করুন। আমি উকিল দেখে দেব।

নবীনা ধরা গলায় বলল—তা যে হয় না রিয়াজজী। হয় না ! কিছুতেই হয় না। মুসলমান কোর্টের কথা মান্য করে না। কোন বিচ্ছেদ কোন মিলন মেয়েরা পারে না। বলুন, আমি কী করব ? বলুন, কোন্ প্রসিদ্ধ পাপ করলে আমার মুক্তি

হবে ? বলুন না ! বলতে বলতে নবীনা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। একটু পর রান্নাঘরে ঢুকে থমকে যায় রিয়াজ। মাংসের থালা সামনে পড়ে আছে। পিঁড়িতে বসে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে কিঞ্চিৎ কুঁজো হয়ে নবীনা। কাঁদছে। হাত দিয়ে মাংসের টুকরোগুলো একটু একটু ছুঁয়ে দেখে থালায় এদিক-ওদিক সরিয়ে রাখছে। অর্থাৎ সে কী করছে জানে না। হঠাৎ পেছন ফিরে শুধাল—আপনার মা তালাক হওয়ার পর কী করলেন ?

—বিয়ে করলেন, বাড়ির চাকর মুজতবাকে। বাপ সেই বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর আমার প্রকৃত বাপ মুজতবা মাকে নিয়ে আলিজানের গেরস্তি ছেড়ে চলে গেল। কথা হল তিন মাস পর আদিনার ফের তালাক হবে। আলিজান তখন পুনর্বিবাহ করবে। মুজতবা কথা রাখেনি। এক বছর পর মুজতবা খুন হয়। মা আলিজানের সংসারে কোলে এক মাসের বাচ্চা রিয়াজকে নিয়ে ফিরে আসে। আমার মা তখন নাকি খুব শুকিয়ে গিয়েছিল। আলিজানের ঔরসে আমার আগেই যারা আদিনার গর্ভে জন্মেছিল, তারা তাদের মাকে ফিরে পেল। আমার জন্মের পরও দু'বার মা তার গর্ভ আলিজানের ঔরসে পূর্ণ করেছে। আমি একটি দুর্ঘটনা। পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম পাপ। আমি আলিজানের কেউ নই। পৃথিবীর কেউ নই। আমাকে আলিজানের গেরস্তি সহ্য করেনি। আমি তো কলঙ্ক। জারজের চেয়ে জারজ। আমাকে আলিজান এক কাঠা মাটি দেয়নি। অবিশ্যি খেতে পরতে দিত। কখনও ছেলে বলে আদর করেনি। মুজতবা মরে গেল। খুন হল। সবাই জানে কে তাকে খুন করিয়েছিল। মরবার জন্য সাড়ে তিন হাত জমিও আমি পাইনি। মুজতবা ছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। আলিজানের ফারায়েজ আমাকে রাজিয়ার মতোই নিঃস্ব করেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাংস ধোয়ার মাটির গামলাটা নবীনার সামনে এগিয়ে দিয়ে রিয়াজ বলল—আমার গল্প একটি সূক্ষ্ম চুলের গল্প। রাজিয়ার মাথায় কত চুল। আপনারও। ঘন। কালো। উদ্দাম। ভয় করে। ছেলেবেলা থেকেই গোছালো ঘন চুলের মেয়েদের দেখলেই কষ্ট হয়। মনে হয় এত চুল একটা না একটা খসে পড়তেই পারে। পারে না ? আচ্ছা, আপনি কত রকম চুল বাঁধতে পারেন ? অপ্সরা খোঁপা, ইন্দ্রধনু খোঁপা এইসব পারেন ? আমার মা চুল বাঁধতে পারত না। খুব গরিবের মেয়ে ছিল তো।

—আপনার মা নেই বুঝি ?

—গত বছর মা মরে গেছে। মরবার আগে মায়ের মাথার চুল সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাংস তুলে গামলার জলে ফেলতে লাগল রিয়াজ। সহসা নবীনা

সচেতন হয়ে উঠল। বলল—আপনি ও-ঘরে গিয়ে চুপ করে বসুন। আমি সব করছি। যান। চুপ করে বসুন গিয়ে।

রিয়াজ ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। এ-ঘরে চলে আসে। বিছানায় গড়িয়ে যায়। চশমাটা নামিয়ে রাখে। চোখ বোঁজে।

রান্না করতে করতে নবীনার কানে ভাসতে থাকে :

খাওয়ার আগে বলে কী?
খাওয়ার পর বলে কী?
নিঃশব্দে পড়ে কী?

চুল না শিশির?

॥ উনিশ ॥

গত রাতে হয়ত শিশির পড়েছিল আকাশ থেকে কিংবা রেণু-বৃষ্টি। গত রাত ছিল প্রবল হাওয়ার রাত। হু-হু করে ঝাপটে ঝাপটে বয় সেই মন-কেমন-করা দীর্ঘতম হাওয়া। মনে হয় এই হাওয়া অবধিবিহীন বইতে থাকবে। শেষ হবে না। আকাশে ছিল বিধুর চাঁদ। ছেঁড়া মেঘ চাঁদের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহে যাচ্ছিল। সেইদিকে চেয়ে ছিল মিল্লাত। বাইরে বারান্দায় বসেছিল। ইদানিং কখনও এমন করে বসে না। বারান্দায় খানিকটা গ্রিল-ঘেরা জায়গা আছে। বসে শুয়ে থাকা যায়। গরমের সময় ঘরের পাখা বন্ধ হয়ে গেলে এখানে এসে শুয়ে থাকা যায়। চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখা যায়। গ্রিলের সঙ্গে তালা-লাগানোর ব্যবস্থা আছে। বইপত্তর ভেতরে পড়ে রইল, তালা দিয়ে কোথাও চলে যাওয়া যায়। জায়গাটা গরমের সময় মিল্লাতের খুব প্রিয়। ঘরে পাখা আর আলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে মৃদু জ্যোৎস্না কালো হয়ে আসছে ক্রমশ, নিবে আসছে বটে, কিন্তু প্রচুর হাওয়ার মাতলামি চলছে।

ঘরে মোম জ্বালিয়েছে রাজিয়া। দরজা কপাট জানালা সব খুলে দিয়েছে। উত্তাল হাওয়ারা নেচে নেচে ঢুকে পড়ছে ঘরে। বিছানায় এসে লাফিয়ে পড়ছে। ক্যালেণ্ডার নিয়ে পাখির ডানার মতন ঝাপটে খেলা করছে। খাটে চোখ খুলে শুয়ে আছে রাজিয়া। টেবিলে খাড়া মোম বাতাসের ধাক্কায় মাঝে মাঝে নিবু নিবু হয়। কাত হয়ে শুয়ে রাজিয়া সেই নিবু নিবু হওয়া, হেলে কেঁপে যাওয়া, স্থির হওয়া দেখছে। কাল তার বিয়ে। ভাবলেই শরীর কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চোখের কোণে ক্ষীণ রেখায় জল নামে। একদিন সেই কবে নিসার হোসেন

এলেন ভোরবেলা বদনা হাতে করে বিয়ে করতে। ভাইদের সঙ্গে করে চলে গেলেন রেজিস্টারি অফিস এই বাড়ির দলিল করতে। দিনমান কেটে গেল। রাত্রে ফিরে এলেন। তারপর রাতারাতি কলমা পড়ে জোর-জবরদস্তি বিয়ে হয়ে গেল। বিশ্বাস হয় না বিয়ে হয়েছিল। বিশ্বাস হয় না কী করে এজিন' ('এজিন'—বিবাহের সম্মতি। এই এজিনের অধিকার নারীর অধিকার') দিয়েছিল রাজিয়া। এজিন মানে মৌখিক স্বীকৃতি। বৃদ্ধ নিসারকে স্বামীরূপে স্বীকার করি। তিনি আমার ইহলোক পরলোকের স্বামী। তিনি আমার সর্বস্ব। সেই এজিন দিয়েছিল রাজিয়া। বিশ্বাস হয় না।

এই বাড়ি ছিল বিয়ের যৌতুক। নারীকে পুরুষের। এই ঘর ছিল বিয়ের উপহার। কী পরিহাস! দেনমোহর আর কৌতুক জীবনে এই শব্দ দুটির পার্থক্য আছে কি? রাজিয়া ভাবে, সত্যিকার বিয়ের স্পষ্ট উপলব্ধি তার নেই। সেদিন বিয়ে কাকে বলে জানতেই পারেনি। আজ বুঝতে পারছে বিয়ে কি সাংঘাতিক রোমাঞ্চ! কী সাংঘাতিক উল্লাস! রক্তে রক্তে দুলছে কী নিবিড় আনন্দ। তার বর বাইরে অন্ধকারে কী ভাবছে কে জানে! তার কী মনে হচ্ছে কে জানে! এখন বড় লজ্জা করছে তার। বিয়ের আগে মেয়েদের যেমন লজ্জা করে। আজ রাজিয়া গায়ে হলুদ করেছে।

মিল্লাতকে হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে। মিল্লাত আপত্তি করছিল। রাজিয়া শোনেনি। শুনবে কেন? মিল্লাতের গায়ে হলুদ মাখাচ্ছিল নিজে হাতে। মাখাতে মাখাতে রাজিয়ার শরীর কেমন কামনার লোভে শিরশির করছিল। মিল্লাত যদি চেয়ে দেখত তার চোখে দেখত কী নিবিড় মমতা আর কামনার অনুভূতি উদ্গত হচ্ছে।

এখন মনে হয়, মিলু যদি বাইরে থেকে ছুটে এসে তাকে নিবিড় করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে পিষে ফেলে, তাহলে রাজিয়ার গা থেকে চন্দনের গন্ধ উঠবে। মিল্লাত কি সেকথা জানে? বিয়ের একটা আলাদা নিজস্ব গন্ধ আছে। সেই গন্ধে ঘরটা এখন ভরে গিয়েছে। গন্ধটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবী সেই গন্ধের পরিচয় কখনও জানবে না। সেই গন্ধ জীবনের সবখানে গোপন করে নিজের জন্য আমৃত্যু রেখে দেবে রাজিয়া। বাইরের লোকটি কি সহসা ডাকাতের মতো উঠে আসতে পারে? তারও গায়ে কি বিয়ের গন্ধ লেগে আছে? ঝড়জলের রাতে মবিন এসেছিল। এই দেহ অপবিত্র করে গেছে। বুকের শুদ্ধবোধ নষ্ট করে গেছে। ফুলের মতন নরম বেগবান স্বপ্নকে থেঁতলে দিয়ে গেছে। এসো মিল্লাত, আমাকে তুমি পবিত্র করো। শুদ্ধ করে দাও। মনে মনে রাজিয়া সেই কথা

উচ্চারণ করে। বাইরের লোকটি একসময় রাজিয়ার কাছে উঠে চলে আসে। শায়িত রাজিয়ার কাছে বসে। লোকটির চোখ চেয়ে দেখে রাজিয়া। তাই তো! যা ভেবেছিল তাই। লোকটি তাকে স্পর্শ করে। ধীরে ধীরে চুম্বনের জন্য মুখ নামায়। রাজিয়া চমকে ওঠে। চমকে উঠে বসে। বলে—না। এখন নয়। আজ নয়। কাল সব দেব। সব পাবে তুমি।

—কেন নয়? আজ কেন নয়? এসো, তোমার সব অবরোধ ভেঙে দি। তোমার দেহে সংস্কার জড়িয়ে আছে। রক্তে ভয় ঢুকে আছে। এসো তোমাকে নির্ভয় করি। মুক্তি দিই। এসো না? মিল্লাত রাজিয়াকে আকর্ষণ করে। রাজিয়া বলে—না। আজ নয়। কাল। কাল সব দেব। সব পাবে। আজ একটু ধৈর্য ধরো। একটা রাত। একটা মাত্র দিন। নিজেকে ছোট করো না।

—আশ্চর্য! মিল্লাত আশ্চর্য হয়। সেকথা মুখেও বলে। বলে—জানো তোমাকে আমি জোর করতে পারি! পারি না?

—পারো। নিশ্চয় পারো। তুমি তো পুরুষ। তবু বলছি আজ নয়।

—কেন নয়?

—না।

—কেন?

—জানি না কেন। তবু নয়। যাও। বাইরে যাও।

—তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না।

—ইস্!

—হ্যাঁ। যাব না আমি। কেন যাব? আমি কোন অন্যায় করছি না।

—করছ। বিয়ের আগে এইসব ঠিক না!

—তাই নাকি?

—নিশ্চয়! তুমি তো মবিন নও মিলু! তুমি যে অনেক বড়।

—আমাকে কিন্তু তুমি খুব ছেলেমানুষ বানিয়ে ফেলেছ। যা বলবে, তাই শুনতে হবে। কেন?

—আমি চাই না তুমি এতটুকু ছোট হও।

—এতে ছোট হওয়ার কী আছে?

—আছে। তুমি বুঝবে না। আমাকে ছেড়ে দাও! গম্ভীর শোনায় রাজিয়ার কণ্ঠস্বর।

—না। ছাড়ব না।

—ছাড়তেই হবে। ছাড়ো! সব এক। সব পুরুষই এক। বড় ছোট সবাই।

যাও। চলে যাও। নইলে তোমাকে আমি বেঁধে রেখে আসব।

—বেঁধে রেখে আসবে? কোথায়? কেন?

মিল্লাত ভয়ানক অবাক হয়ে যায়। রাজিয়া গা ছাড়িয়ে নিয়ে বালিশের তলা থেকে মাথার ফিতে বার করে। তারপর সেটা দিয়ে মিল্লাতের একখানা হাত বেঁধে ফেলে। বলে—ওঠো! চলো। বাইরে চলো! চলো না বলছি! নামবে না?

ব্যাপার দেখে মিল্লাত প্রথমে বিস্ময়াহত, পরে কেমন বিমর্ষ হয়। কড়াগলায় 'না' বলে ওঠে। তখন রাজিয়া জোর করে ফিতে ধরে টেনে ওকে বাইরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। ককিয়ে ওঠে—তুমি না গেলে আমি বিষ খাব। আমার ঘুমের বড়ি আছে। মুহূর্তে মিল্লাতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে—ঘুমের বড়ি? বিষ? তুমি বুঝি আমারো কেউ নও? আমাকেও বুঝি বিশ্বাস করো না তুমি? কোথায় ঘুমের বড়ি, দেখাও আগে। তারপর যাব।

রাজিয়া বালিশের তলায় হাত চালিয়ে কৌটো বার করে। বলে—নাও। বিশ্বাস করছ না তো!

কৌটো দেখে, বড়ি দেখে, মিল্লাত সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—চলো। কোথায় বাঁধবে চলো।

বাইরে গ্রিলের মধ্যে ঢুকিয়ে গ্রিলের সঙ্গে ফিতে দিয়ে মিল্লাতকে বাঁধে রাজিয়া। বলে—আজ সারারাত এখানে থাকবে। দুষ্টুমি করবে না।

মিল্লাত ঈষৎ হাসির সুরে বলে—জাস্ট্ কী বলব, লাইক আ ডগ। তাই না? মানুষ কিন্তু আমি। একটা বালিশ দিও। আজ সারারাত নক্ষত্র দেখে কাটাতে হবে। চাঁদ দেখে মাঝে মাঝে কুকুরও কাঁদে। কেন কাঁদে? না, কুকুরও একপ্রকারের মানুষ। যা শালা, কী বলছি? দ্যাখো আব্বা, তোমার জন্যে আজ আমি কুকুর হয়ে গেলাম। লোকে বলবে, বাপ কা বেটা। হাঃ হাঃ হাঃ! যাও রিজিয়া, ছোটবউ, শুয়ে পড়ো!

কেমন আশ্চর্য অভিমান হয় রাজিয়ার। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় লাফিয়ে এসে বালিশ আঁকড়ে শুয়ে কান্না রোধ করে। মিল্লাতকে বালিশও দেয় না। বাইরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশে পাতলা মেঘ। ডুবে আসা চাঁদ। অন্ধকার। রাজিয়া কখন ঘুমিয়ে যায়। হঠাৎ কখন আবার ঘুম ভেঙে যায়। ধসমস করে উঠে বসে। মনে পড়ে মিল্লাত বালিশ চেয়েছিল।

মোমটা পুড়তে পুড়তে ফুরিয়ে যাচ্ছে। রাজিয়া বিছানা থেকে নামে। আরো একটি মোম ধরিয়ে বালিশ নিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসে। আকাশে মেঘ ডেকে

ওঠে। পাতলা বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়া অনেক পড়ে গিয়েছে। আকাশ মেঘের জটলায় ভয়ানক কালো। মোমের আলোয় দেখতে পায় হাত-পা গুটিয়ে অসহায় কয়েদীর মতন মিল্লাত শুয়ে আছে। গ্রিলে হাত বাঁধা। ঐ অবস্থায় মিল্লাতকে দেখে গ্রিলের তালা খোলে রাজিয়া। কেমন কান্না পেয়ে যায়। মাথার কাছে নতজানু হয়ে এক হাঁটু একটু উপরে তুলে এক হাতে মোম ধরে, অন্য হাতে বালিশ মাথার তলে ঠেলে দিতে গিয়ে টের পায় সমস্ত চুল ভিজে গিয়েছে। গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকে—মিলু! ওঠো! শুনছ? অ্যাই! শোন না? মিলু? উঠে পড়ো। ঘরে শোবে চলো। অ্যাই?

মিল্লাতের ঘুম ভাঙে। শুধায়—রাত কত? রাজিয়া জবাব দেয়—অনেক। যাবে না?

—কেন?

—বারে! বৃষ্টি পড়ছে যে!

—পড়ুক!

—আবার অসুখ করবে তোমার!

—করুক!

—রাগ করেছ?

—মোটেই না।

—তবে উঠছ না কেন?

—নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি যাব না। আমিও ঘুমের বড়ি খেতে পারি। বিষ খেতে পারি। সবই কেমন আল্‌গা আল্‌গা।

—মানে?

—এই যে ভালবাসা! বিশ্বাস! সবই। জীবনটাই।

—আমায় ক্ষমা করে দাও মিলু!

—না।

—ক্ষমা করবে না? ভুল হয়েছে! কখনও এমন হবে না।

—তবু আমি যাব না।

—কেন?

—না।

—যা বলবে তাই হবে। চলো।

মিল্লাত এবার উঠে বসে রাজিয়ার কম্পিত মোমালোক শুষ্ক মুখের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করে। বলে—ফুলবউ। এটাও জবরদস্তি, ফুলবউ। জানি তুমি মন থেকে

চাইছ না। তুমি যা চাও না, আমি তা জোর করতে পারি ? কালই তো আমার বিয়ে, তাই না ? তুমি চলে যাও। বৃষ্টি হবে না। আমায় একটা চাদর দিও।

—চলো। ওঠো!

—কেন ?

—যেতে হবে তোমাকে। তোমাকে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে দেব না। ওঠো বলছি! আবার শুয়ে পড়লে কেন ?

—যাব না বলছি। ব্যস!

—এই ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় বুঝি ?

—আগেরটাও ছেলেমানুষি, এখনও সেই ছেলেমানুষি! যা করি ছেলেমানুষি! তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। বলো, তুমি রাগ করোনি। বলো, আমাকে তুমি বিশ্বাস করেছো! বিশ্বাস করো, আমি মবিন নই। আমি খারাপ নই ফুলবউ। আমি আমার বাপের মতন নই।

—এভাবে বলছ কেন ?

—ঠিক তুমি বুঝবে না, আমি কী বলতে চাইছি! মাথাটা হঠাৎ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি যেন নিজের ঘরেই চুরি করতে যাচ্ছিলাম। অন্তত নিজের কাছে ব্যাপারটা খুব খারাপ।

—আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি। যা খুশি করো!

বলেই রাজিয়া উঠে দাঁড়ায়। মিল্লাত ভীষণ আহত হয়। বুঝতে পারে, রাজিয়া বিরক্ত হয়েছে। তখন নিজের প্রগল্‌ভতায় নিজেই খুব লজ্জিত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে সে। ভাবে, মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করছে না। ঘটনা খুব অশ্লীল ঘটে গেল। এটা মিল্লাত চায়নি। তাকে ঠিক ঘরে যাওয়ার জন্য খুব আন্তরিকভাবে পীড়াপীড়ি করছে না রাজিয়া। কোনপ্রকার সামঞ্জস্য মাত্র। উপর উপর খুশি করা। নইলে 'যা খুশি করো' বলে চলে যেত না। আসলে বিশ্বাস করছে না। মেয়েরা পুরুষদের বিশ্বাস করে না। কুকুর মনে করে। ধর্ষণের পর কোন মেয়েই কোন পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারে কি ? পারে না। ভাবতে ভাবতে বালিশ নিয়ে আচমকা উঠতে যায় মিল্লাত। হাতে বাঁধন আছে খেয়াল থাকে না। হাতে টান পড়ায় টাল সামলাতে না পেরে গ্রিলে আছড়ে পড়ার মতন হয়। কপাল ঠুকে যায়। গ্রিলের থরথরানি শব্দ হয়। ইস্‌! মুখে একটা আর্ত শব্দ করে মিল্লাত। ঘর থেকে রাজিয়া শুনতে পায়। মিল্লাত টান দিয়ে বুঝতে পারে, ফিতে বেশ শক্ত। আরো জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ঘরে এসে ঢোকে। মোমবাতিটা টেবিল থেকে তুলে এনে রাজিয়ার হাতে দিয়ে বলে—দ্যাখো তো! কপালটা

কেটে গেল কি না ! রাজিয়া দেখে কপালটা একটুখানি ফুলে উঠছে। বুঝতে পারে, আরো ফুলে উঠবে। বাতিটা খাটের পায়ার মাথায় বসায়। তারপর তীব্র বেদনা আর সুতীব্র কামনার মিশেল হয় বুকের মধ্যে। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। পায়ের কাছে নতজানু মিলুকে (খাটে দু'পা ঝুলিয়ে বসে আছে রাজিয়া), মিলুর মাথাটাকে বুকের কাছে দু'হাতে জড়িয়ে টেনে নেয়। গলায় বুকে ঘনিষ্ঠ করে চেপে ধরে। দুই চোখে অদ্ভুত আশ্লেষ লিপ্সার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। অদ্ভুত নিষ্পিষ্ট বেদনা বুককে প্লাবিত করে পাক দিয়ে দিয়ে ওঠে। সমস্ত সংস্কার শরীর থেকে ছিঁড়ে যেতে থাকে। প্রতিটি রক্তকণিকা কানাকানি করে ছড়িয়ে ছুটে বেড়ায় ধমনীতে। মবিনের তীব্র যৌন-প্রহারের ঘৃণিত দেহখানি শুদ্ধ হতে থাকে। গলায় চাপা বিহ্বল শরীর কোন ভাষা না পেয়ে কেবলই আদুরে স্বাদ ছড়িয়ে দেয়। উদ্‌গত হয় আকুল ব্যাকুল করা স্বপ্নের কেন্দ্রগুলি, যা শারীরিক। সব ফুটে ওঠে। খুলে যায়। পাগলের মতন রাজিয়া মিল্লাতের গলায় চুম্বন করতে থাকে। চুম্বনের শব্দে যন্ত্রণা মিশে গিয়ে কেমন অদ্ভুত অলৌকিক হয়ে ওঠে ঘরখানি। আসলে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যন্ত্রণার উপশম হয়। হতে থাকে। গলা থেকে মুখ তুলে রাজিয়া কপালের ফুলে ওঠা স্থানে ঠোঁট চেপে ধরে। উষ্ণ ব্যথিত দুই ঠোঁট মিল্লাতের যন্ত্রণায় কোমল এক স্পর্শ বুলিয়ে চলে। মিল্লাতের মাথার চুল দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে রাজিয়া। খামচে ধরেছে। মিল্লাত তার হাত দু'খানি বিছানার উপর রাজিয়ার দুই পাশ দিয়ে প্রসারিত করে ফেলে রেখেছে। যে হাওয়া পড়ে এসেছিল, ফের সেই হাওয়া দমকে গমকে ঘরের মধ্যে আছড়ে ঢুকে আসে। লাফিয়ে নেচে উথালপাথাল করে ছুটে আসে। আকাশ ঝিকিমিকি। চাপা মৃদু আর্তনাদ হয়। পাতলা বৃষ্টি হয়। হাওয়া প্রবল হয়ে ওঠে। আবেশে রাজিয়ার দুই চোখ বন্ধ হয়। দুই চোখ খুলে থাকে মিল্লাত। রাজিয়া কপাল থেকে ঠোঁট তুলে মিল্লাতের গালে গাল চেপে ধরে। চোখ খোলে। সহসা এ কি ! দেখে দরজার কাছে কে ও ? কালো ভয়াল প্রাণীটা কে ? এত প্রকাণ্ড কালো লোমশ বিড়াল কখনও সে দেখেনি। কখন নিঃশব্দে এসেছে। বুনো। বর্বর। ভয়ঙ্কর। বীভৎস ! কী খুঁজছে অমন করে ? কী চায় ও ? কেন এল ? ভয়ে রাজিয়া চিৎকার করে ওঠে। দুঃস্বপ্নে ভয় পেলে যেমন করে মানুষ। কী হল ? কী হয়েছে ? অমন করছ কেন ? মিল্লাত রাজিয়ার বুক থেকে ঘাড় তুলে নেয়। দু'চোখে জিজ্ঞাসা তার। ব্যাকুল প্রশ্ন। রাজিয়া খুব জোরে মিল্লাতকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। মুখ দিয়ে আকুল অস্ফুট না না করে ওঠে সে। কেবলই না

বলে। আরো ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে ধরে। কে যেন মিন্নাতকে ছিনিয়ে নেবে মনে করে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝাপটায়। ছটফট করে ঝাপটাতে থাকে। কালো বিড়াল অন্ধকারে ফিরে যায়।

॥ বিশ ॥

রিয়াজ খেতে বসে। পলিথিনের পাটি পেতে দিয়েছে নবীনা। নবীনা স্নান করেছে। নতুন ব্লাউজ শাড়ি পরেছে। তাছাড়া স্নানের পর মেয়েরা যতটুকু যা মুখে গন্ধ মাখে, করেছে নবীনা। ফর্সা মুখের উপর উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে ভীষণ লাল টকটকে গোল বড় টিপ। স্বল্প ভেজা চুলের মধ্যে যাকে বলে কেশদাম, এলানো সেই কেশান্ধকারে লুকিয়ে আছে মোহিনী সুবাস। গতকালের পুরনো তেলের গন্ধ। আসলে চুলের গন্ধ। কোন পারফিউমের গন্ধ কখনই পারফিউমের গন্ধ শুধু নয়। মেয়েদের শরীর অনুপাতে সেই গন্ধ নারী দেহে মিশে এক-একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সেই বিচারে নবীনার নিজস্ব সুঘ্রাণ আছে। সেটি রিয়াজের নাকে এসে ঢুকছে। খাবারের থালায়, ভাতে, মাংসের ঝোলে সেই গন্ধ ভাসছে। এক ধরনের শীতল গন্ধ। বিজ্ঞানের চোখে পাউডার বা ক্রিমের বা তেলের মিশ্রিত গন্ধ। সবটাই দেহের আধারে স্ফুট। ফলে কবির চোখে দেহের গন্ধ। রিয়াজ সেই দেহের গন্ধ পাচ্ছিল। নবীর গায়ের নিজস্ব গন্ধ ছিল। উন্মত্তেরও থাকে। বারবার নবীনাকে চেয়ে দেখতে অতএব ইচ্ছে করছিল রিয়াজের। অথচ রিয়াজ হ্যংলার মতন চেয়ে দেখতে পারে না। খাবারের থালায় চোখ নামিয়ে রাখে। সামনে পিড়িতে বসে গভীর আগ্রহে নবীনা রিয়াজের ভাত খাওয়া দেখছে। ভাত মাখা, মুখে তোলা, খাওয়ার মধ্যে কোন তৃপ্তি আছে কি না ইত্যাদি। শুধাল—রান্না কেমন হয়েছে?

রিয়াজ বলল—ভাল। তারপর বলল—মা আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে দিত। মা সব সময় আমাকে নিয়ে বিড়ম্বিত ছিল। সে বোধহয় নিজেও মনে করতে পারত না আমি তার সত্যিকার ছেলে। কেমন একটা অপরাধীর ভাব ছিল মায়ের। বুঝলেন, আমি কখনও ভাল করে খেতে পারিনি। কখনও কোথাও ভাল কিছু খেতে পেলে মায়ের কথা মনে পড়ে। কেন পড়ে বুঝতে পারি না। আপনি মাঝে মাঝে এসে এইভাবে আমাকে রান্না করে খাওয়াবেন? আপনি চলে আসবেন। দ্বিধা করবেন না।

—আসব।

—ঠিক। আপনি এলে খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হবে। তাই না ? রিয়াজ মাথা দুলিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে খেয়ে যায়। হঠাৎ নবীনা আশ্চর্য এক প্রশ্ন করে বসে—আচ্ছা রিয়াজজী, আমার মতন মেয়েকে নিয়ে আপনার কোন ভাবনা হয় না ? জন্ম থেকেই আপনি সমাজের কাছে অপরাধী। আমারও কি অপরাধ কম ? ভাবি, কেন যে জন্মেছিলাম ? গতরাতে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়েছিল। মাঝে মাঝে সত্যিই বলছি, মরে যেতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, যারা আত্মহত্যা করে, তারা কি খুব নিষ্ঠুর ? দেখুন, আমার একটা বাচ্চা আছে তো, মরে গেলে সবাই নিন্দে করবে। ছেলেবেলা থেকেই আমার খুব নিন্দের ভয়, অথচ নিন্দে-মন্দই কপালে জুটেছে, কেউ কখনও আমার প্রশংসা করেনি।

—আমি করব। আমি আপনার প্রশংসা করব। অজস্র প্রশংসা করব। রান্নার প্রশংসা করব। যদি চান রূপেরও সুখ্যাতি করব। এমন কি আপনার দুর্ভাগ্যের প্রশংসা করব। নিশ্চয় করব।

—কেন ?

রিয়াজ হকচকিয়ে যায়। টানা মন্ত্র পড়ার মতন সে বলে যাচ্ছিল। মনে হল, তাই তো ! কেন সে করবে ? কী ব্যাপার ? কেন সে প্রশংসা করবে খেয়ালই করেনি। মুহূর্তে সেই অসহায়তা তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। নবীনা ফের শুধাল—কেন, বলুন !

রিয়াজ আমতা আমতা করে—না। মানে প্রশংসা কেন করব ? ইয়ে, সেটা তো আপনার পাওনা বলেই করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের অস্তিত্ব প্রশংসার নয়। নিন্দারই। তাই আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রশংসা করব। কেউ নেই আমাদের। তাই বলে আমরা ছোট একটা খুব নিচু সংকীর্ণ সমাজের প্রশংসার কাঙাল নই। আমার প্রশংসায় যদি আপনার মন ভরে ওঠে, তবে আমি প্রতিদিন আপনার প্রশংসা করতে পারি।

—তাই বুঝি !

—নিশ্চয়।

এবার মাথা নিচু করে খুব দ্রুত খেতে থাকে রিয়াজ। একটু পর শুধায়—আপনি কখন খাবেন ?

—খাব।

—অতিথি থাকল পড়ে আমি দিব্যি কেমন খেয়ে যাচ্ছি।

—আমি অতিথি নই। আমি বন্ধু।

—বটে !

—নই বুঝি ?

—নিশ্চয়ই।

—তবু আপনার সংশয় আছে মনে হচ্ছে!

—কেন ?

—সত্যি বলব ?

—একশবার বলবেন। কেন নয় ?

রিয়াজ আপন মনে খেয়ে যেতে থাকে। শুধায়—বলুন! বলছেন না কেন ?

—বলি। আর দুটো ভাত দিই ?

ভাত দেয় নবীনা। অল্প করে। কারণ বেশি করে একসঙ্গে ভাত দিলে বেশি খাওয়ানো যায় না। রিয়াজ ভাবে, ভাত কি হাঁড়িতে নেই ? শুধায়—ভাত আছে তো ?

—আছে। আরো দেব। আগে খেয়ে নিন!

—আর নয়। এই শেষ। আচ্ছা, কথাটা কোথায় ছাড়লেন ?

—সংশয়।

—হ্যাঁ। সংশয়। কেন ?

—বলব ?

—দ্বিধা কিসের! বলুন না! আমি বাঘ-ভালুক নই। বলে ফেলুন। আরে যার জন্মেরই ঠিক নেই, সে একটা মানুষ নাকি ?

—আপনি বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। জন্ম কি আপনাকে দুঃখ দেয় ?

—দেয়। ঘেন্না হয়। আমি অশুচি। লোকে সেই চোখেই দেখেছে। মা বিড়ম্বিত ছিল। মায়ের বড় লজ্জা ছিল নবীনা! যাক গে! বলুন আপনার কথা। সংশয় কেন ?

—কারণ বড় মানুষ যাঁরা, তাঁদের দয়া বেশি। ভালবাসা কম। কারণ করুণা দয়া এইসব প্রায় সর্বত্রগামী সহজ। ভালবাসা নয়। বইতে পড়েছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ভালবাসা ছাড়া তো বন্ধুত্ব হয় না।

—কিন্তু বড় মানুষটা কে ?

—আপনি!

রিয়াজ চোখ তুলে চমকাল। তারপর কেমন করে হেসে ফেলল। বলল—আরে দুর্। কিসে আর কিসে! তামা আর সীসে! কোথায় বড় মানুষ আর কোথায় রিয়াজ। একটা পাপী লোক!

—না। কখ্‌খনো না। গলায় জোর দিয়ে বলে ওঠে নবীনা।

—নই ? প্রশ্ন করে রিয়াজ।

—না। কিছুতেই না।

রিয়াজ আবার ম্লান করে হাসে। একটু থেমে থাকে। গম্ভীর গলায় বলে, বন্ধুত্ব বড় দুর্লভ বস্তু নবীনা।

—জানি।

—হজরত নবী ছিলেন আল্লার বন্ধু। এটা একটা খুব বড় ধরনের কনসেপশন, আইডিয়া। ঈশা ছিলেন খোদার পুত্র। কিন্তু নবী ছিলেন দোস্ত। মুসলমান ভাইয়েরা ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। তাহলে বলুন, আপনি আমারই মতন রাজিয়ার বিয়েকে, মিলুর বিয়েকে সমর্থন করেন ? কোন একটা বিষয়ে দু'জনের সমান আবেগ, পরিমাণগত প্রায় একই উচ্ছ্বাস কিংবা আবেগ তরঙ্গের দুই চূড়ার প্রায় অবিকল শীর্ষ সমতা ছাড়া বন্ধুত্ব সার্থক হয় না। গড়েও ওঠে না। টেকেও না।...

নবীনার সমস্ত উজ্জ্বল মুখ মুহূর্তে কালো হয়। ভাত তুলে দিতে গিয়ে হাত কাঁপে। থালায় ভাত নামিয়ে দিয়ে দেখে ভাতের কাঁড়ার গায়ে একটা লম্বা চুল জড়িয়ে গিয়েছে। বিয়ের সমর্থন যে মুখকে কালো করেছিল, চুল সেই মুখকে রক্তশূন্য করে দেয়। থালাখানা সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকে টেনে নেয় নবীনা। প্রায় চিৎকার করে ওঠে, না!

অবরুদ্ধ গলা কেমন আর্তনাদ করে ওঠে। রিয়াজ স্তম্ভিত। নবীনা বলে, কখনও এমন হয় না রিয়াজজী। কোনদিন হয়নি। বিশ্বাস করুন। আপনি উঠুন। খেতে হবে না। রিয়াজ অগত্যা কী করবে ভেবে না পেয়ে উঠেই পড়ে। হাত ধুয়ে ফেলে। হাত মুছে ফেলে। পাশের ঘরে চলে যায়। চিন্তা করে। চুল পড়ল কেন। চুল নিশ্চয় চালের মধ্যে ছিল। কিংবা কীভাবে পড়ল। নবীনা বড় ভালবেসে খেতে দিয়েছিল। বড় আনন্দ পেয়েছিল সে। কিন্তু কোথা থেকে চুল উড়ে এল। ভারি তুচ্ছ একটা চুল। অথচ কী সাংঘাতিক অভদ্র। মানুষের জীবনের ট্রাজেডির মতন গোপনচারী, অদৃশ্য, আকস্মিক। সমস্ত মুখ মেয়েটির নিবে গিয়েছিল। বড়ই মায়া হচ্ছে রিয়াজের। নবীনা কথা বলে সুন্দর। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। সেই ভোরে ছুটে এসেছে গ্রাম থেকে। করুণা প্রায় সর্বত্রগামী, কারণ সেটা সহজ। সহজে পৌঁছনো যায়। ভালবাসা দুরূহ, সহজে পৌঁছনো যায় না। চমৎকার কথা। বলেছে সুন্দর। কোথায় পড়েছে নবীনা ? বই পড়ে বোঝা যাচ্ছে। অথচ এইসবের দামই বা কে দেয় ? সাদিক দেবে ? মবিন দিল

কি ? সাদিক মৌখিক তালাক না দিলে নবীনা কোথাও বিয়েও করতে পারবে না। সমাজ এক মস্ত ব্যাপার। মুসলমানের নিজস্ব সমাজ। কোর্টের ধার ধারে না। তালাক তার নিজস্ব রীতি। নিজস্ব অর্থ মৌলানা মৌলবীর স্বীকৃত নিয়ম। মুখের তালাকই তালাক। সেই কথা মুসলমান বুঝেছে। তাকে আর কিছুতেই অন্য কথা বোঝানো যায় না। বুঝতে দেওয়া হয় না। সাদিক তালাক দেবে না। এখন তাহলে কী হবে ? তাকে কীভাবে করুণা করা যায় ? দয়া করা যায় ? যায় না। অতএব দয়া সর্বত্রগামী নয়। সে তো পরস্ত্রী। পরস্ত্রীকে বিয়ে করা না-জায়েজ (অবৈধ)। হারাম। রিয়াজ দ্রুত ড্রয়ার খোলে। বাংলা নতুন ডাইরিখানা হাতের কাছেই পায়। নতুনই শমীম ডাক্তার দিয়েছে। প্রথম পাতায় একটা তালিকা লিখেছে রিয়াজ। তালিকাটি নিম্নরূপ।

মোহারেমাত বা অবৈধ নারী (যাদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ)

১। মাতা, মাতামহী, পিতামহী, যত ঊর্ধ্বতমা হউক। ২। কন্যা, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, যত নিম্নবর্তিনী হউক। ৩। ভাগ্নী (সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বি-পৈত্রিক)। ৪। ফুফী, পিতার ফুফী, দাদার ফুফী, সহোদরা হউক বা বৈমাত্রেয়। ৫। খালা, পিতার খালা, দাদার খালা,সহোদরা হউক বা বৈমাত্রেয়। ৬। শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী, দাদী শাশুড়ী, ইত্যাদি। ৭। সহবাসকৃত স্ত্রীর কন্যা, দৌহিত্রী ইত্যাদি। ৮। দুগ্ধ মাতা, নানী, শাশুড়ী, ভাগিনী, ননদিনী, কন্যা, পৌত্রী। ৯। পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রবধূ। ১০। অবৈধ সহবাসের স্ত্রীর মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, পৌত্রী। ১১। কামপরবশ হইয়া যে-স্ত্রীর গোপন অঙ্গে দৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, দৌহিত্রী। ১২। বিধর্মী, অংশবাদিনী, ধর্মত্যাগিনী। ১৩। ভাগ্নেয়ী, ভাইঝি। ১৪। পরস্ত্রী। (হইতে : খোৎবাতে এব্রে নাবাতা)। অপর নাম ৬০ খোৎবা।

রিয়াজ ১৪নং অবৈধ নারীর দিকে চায়। পরস্ত্রীকে নবীর যুগে কি বিয়ে করত মানুষ ? জোর করে ? ঘটনা কী ছিল ? নবীর আইনে সেই বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। সমাজ কতদূর এগিয়ে এসেছে। কত উন্নত হয়েছে মুসলমান। নবীনার বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এত ভাল উদাহরণ হাতের কাছে মজুত, রিয়াজ এতদিন ভাল মতন চিন্তা করতে পারেনি। ১৪নং নারীকে সে একটি গোল লালবৃত্ত দিয়ে ঘিরে ফেলে। ভাবে, দয়া বা করুণা বা মমতা তো সর্বত্রগামী নয়। এই গোল বৃত্তকে ভেদ করতে পারে না। যেখানে করুণা থেমে যায়, অচল, অবরুদ্ধ হয়ে যায়, ভালবাসা সেই চক্রব্যূহে প্রবেশ করে। যেমন করেছে রাজিয়ার জীবনে। রিয়াজ মনে মনে বলে, আমি তোমাকে বন্ধুত্ব দেব নবীনা।

কষ্ট পেও না। কিন্তু আমি যে ভালবাসার কথা তেমন করে সাজিয়ে বলতে পারি না। তুমি প্লিজ, আমার মুখ চেয়ে বুঝে নিও। এই দ্যাখো, আমি লিখছি, নবীনা পরস্ত্রী। তাকে বিবাহ করা হারাম। এই দ্যাখো, লাল গোল বৃত্ত এঁকে দিলাম। এই আমার ক্রোধের প্রকাশ। তুমি বুঝতে পারবে তো। আমি হয়ত কোর্ট মানি। সমাজ কিছুতেই মানি না। মৌখিক তালাকের ছাড়পত্রের মুখাপেক্ষী আমি নই। কথাটা তোমাকে বলব একদিন। আমি একাই আমার সমাজ। আমার কল্পনার চেয়ে বড় কিছু, প্রিয় কিছু নেই নবীনা। তুমি কি বুঝবে সেকথা ?

নবীনার খুব দ্রুত খাওয়া শেষ হয়ে যায়। এত দ্রুত কী করে খাওয়া শেষ হয় ? রিয়াজ অবাক হয়। ডাইরী বন্ধ করে। পিছন ফিরে দেখে নবীনা দাঁড়িয়ে। মুখ কেমন থমথমে। চোখে চাপা বেদনা। বিষণ্ণ অপমান, কিঞ্চিৎ অপরাধ মেশানো।

—কী লিখছেন ? প্রশ্ন করে নবীনা আরো এগিয়ে এসে চৌকির এক প্রান্তে বসে চুপচাপ। চৌকি থেকে টেবিল চেয়ারের দূরত্ব তিন হাতের বেশি নয়। ঘরখানি আয়তাকার। দক্ষিণে দরজা। পূর্বে জানালার নিচে চেয়ার টেবিল। চেয়ারে বসলে দরজার দিকে মুখ করতে হবে। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে দরজার মুখে চৌকি। তারপর ডান হাতের কাছে পুবের জানালা। সেখানে টেবিল। জানালা ছাড়িয়েই দেয়ালে দক্ষিণে একটু গেলেই বইয়ের সেলফ। কিছু বই আছে তাতে। দেয়ালটি পুবের দেয়াল। তারপর দক্ষিণের দেওয়ালেও একটি জানালা। জানালার কাছে আলনায় জামা কাপড়। সেখানেই পুব আর পশ্চিম দেয়ালে ঝুলন্ত লম্বা করে দড়ি টাঙানো। তাতে ভেজা গামছা ঝুলছে। পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগ বরাবর দরজা। সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে ফালি-ঘর।

সেই দরজা, সেই নবীনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরে পশ্চিম দেওয়ালে দরজার একপাশে একখানা তারিখের বড় ক্যালেণ্ডার। ঘরে আর কোন আসবাবপাতি নেই। শুধু চৌকির তলায় ট্রাঙ্ক আছে। তাতে রিয়াজের জামাকাপড় আছে। আর পশ্চিম দেওয়ালের তাকে আছে সাবান পেস্ট ব্রাশ নারকোল তেলের কৌটো ইত্যাদি। রিয়াজের মুখ দরজার দিকে। নবীনার চোখ জানালায়। জানালা সামনাসামনি নয়। একটু দূরে, অন্তত এক হাত দূরে। ডাইরীখানা, লাল ডট পেন, টেবিলে রেখে দিয়েছে রিয়াজ। এমনভাবে রাখল যেন সে কোন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেনি। চোখে মুখে তেমনি একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইল। কেন চাইল ? না সে প্রকৃতই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা

ব্যাপার ডাইরীতে লিখেছে। নবীনার নামটি অবধি লিখে ফেলেছে। খুব উত্তেজনার মাথায় লালকালিতে একটি বৃত্ত রচনা করেছে। সে যে মনে মনে কেমন রেগে উঠেছিল কাউকে তা বলা যায় না। কারণ সেকথা কেউ বুঝবে না। তাছাড়া রিয়াজ যা একটু আগে মনে মনে চিন্তা করছিল বা যেভাবে মনে মনে চড়াগলায় কথা বলছিল, সেটা নাটকে বলে মানুষ। জনান্তিকে কথা বলা। প্রত্যেক মানুষই জনান্তিকে কথা বলে। বড় ছোট সবাই। কারণ জীবন বড় নাটকীয়। রিয়াজ নিজেও জানে সে কিছুতেই নারী-দুঃখ সইতে পারে না। মা তাকে বিড়ম্বিত বিচলিত করে রেখে গেছে। মনে চাপা আছে তার আশ্চর্য চাঞ্চল্য। বাইরে খুব দৃঢ় হলেও ভেতরে সে অত্যন্ত দামাল। মারকুট্টে একটা ভাব সর্বদা তাকে চাপা উত্তেজনায় অস্থির রাখে।

আজ অব্দি মেয়েদের ব্যাপারে তার কোন বাড়তি ও বিশেষ আগ্রহ কোন নারীর বেলা প্রদর্শনের চাহিদা তৈরি হয়নি। একটু আধটু কারুকে ভাল লাগলেও গ্রন্থের চেয়ে সেই নারীকে কেন্দ্র করে চিন্তা করার অতিরিক্ত অবকাশ তার ব্যক্তিত্বের পক্ষে ঝুল মনে হয়েছে। বেমানান বহর যেন বা। সেটা একটা কাঁচা কাজ মনে হয়েছে। অথচ সে প্রেমকে খাটো চোখে দেখে না। তবে মননের চর্চা করতে করতে যা কিছু জটিল, যত দুরূহ, সেখানেই তার আকর্ষণ অনুভব করেছে সে। মানুষ বা নারীর বেলাতেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। আজ সেকথা আরো স্পষ্ট হয়। রাজিয়া ও মিল্লাতের প্রেম জটিল বলেই সুন্দর, বেশি টানে। নবীনা জটিল না হলে সে মনোযোগী হত না। মানুষ আসলে তার বিচারের এক একটি জটিল অঙ্ক। মানুষটির গঠনে কোন ভুল না থাকলে তার উত্তর সম্ভব, সমাধান সম্ভব। রিয়াজ একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। অতএব সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে নবীনাকে বিয়ে করবে। সাদিক ছাড়বে না। রিয়াজও না-ছোড়। কিন্তু কথাটা নবীনাকে মুখে ফুটে বলা ভারি শক্ত। তার এতটা বাধো বাধো হচ্ছে কেন বুঝে পায় না। মানে, আসলে সে কি প্রেম করছে নাকি ? ছেলেমেয়েরা যেমন করে ? ছোট ছোট প্রেম। ছোট কথা। ছোট ব্যথা। ছোট দুঃখ। রবীন্দ্রনাথের গল্প যেমন। শেষ হয়ে হইল না শেষ, সেইরকম ? কী আশ্চর্য একটা সামান্য চুল নিয়ে মানুষের জীবনে কী অদ্ভুত সব ঘটনা হয়! লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ঘটনা তাই ঘটে গিয়েছে। মুখটা কী থমথমে! কী বিষাদ! কী তীব্র আকুলতা! কতই না খারাপ করছে মন! সব কিছু যেন তার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। নবীনার। রিয়াজ নবীনাকে বারবার চেয়ে দেখে। মনে পড়ে এই চুল মায়ের জীবনকে সত্যিই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু নবীনার জীবন ব্যর্থ হতে পারে না। ভাবে

রিয়াজ। চিন্তা করে। এবং চিন্তা করে কী সে লিখছিল, সেটা বলা দরকার।

রিয়াজ কিন্তু জবাব না করে চেয়ার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে চলে যায়। হাঁড়ির ঢাকনা তুলে দেখে অনেক ভাত। কিছুই খায়নি মেয়েটা। রিয়াজের সত্যিই অত্যন্ত খারাপ লাগে। সব কেমন এঁটো আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ-ঘরে এসে জানতে চায়—আপনি খাননি? নবীনা অন্যমনস্কের মতন মাথা নেড়ে জানায় সে খেয়েছে। রিয়াজ ভাবে, মেয়েদের মনটা ভারি অদ্ভুত! কিসে কাঁদে, কিসে দুঃখ পায় বোঝা যায় না। কেন রাগ করে তারাও বোঝে না। রিয়াজ বলে, খেয়েছেন তার প্রমাণ তো কোথাও দেখলাম না।

নবীনা হেসে ফেলে, পেট চিরে দেখাতে হবে বুঝি? খেয়েছি বলছি তো!

কতটুকু খেয়েছেন?

হাত প্রসারিত করে নবীনা হাসতে হাসতে দেখায়, এই এত্ত খেয়েছি, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

না। আপনি এত কম খেলেন, চুল পড়েছিল বলে বোধহয়।

নবীনা কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে থেকে বলল, আমি ওর বেশি খাই না। বেশি খেতে পারি না।

কেন?

বা রে লজ্জা করবে না! বলেই নবীনা খিলখিল করে হেসে ওঠে। রিয়াজ ফের চেয়ারে বসে বিস্মিত হয়, আহত হয়। বলে, ভাগ্যই খারাপ। বুঝলেন! আমার আসলে চুলের গল্প তো! কিছুতেই ছাড়ে না। ওটা ট্রাজেডি!

নবীনা সহসা নিজেকে অন্যদিকে, দরজার দিকে ঘুরিয়ে ফেলে। বিমুখ হয়। তারপর ওর শরীর কান্নায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। রিয়াজ হতভম্বের মতন চেয়ার ছেড়ে নবীনার কাছে আসে। চিন্তিত গলায় শুধায়, কী হল? কী হয়েছে বলুন! অমন করছেন কেন?

নবীনা আরো কেঁপে ওঠে। রিয়াজ বলে, সামান্য চুল! আপনি দিলেন না তখন, আমি ভাতগুলো খেয়ে নিতাম। এতে এত কান্নার কী আছে। আপনি ছেলেমানুষ নন। বাচ্চা মেয়ের মতন কাঁদতে শুরু করলেন। আরে বাবা, আপনার দোষ তো কিছু নেই!

কে বলেছে আমার দোষ নেই! কেন অমন হবে, বলুন! কেন হল, বলুন না!

ধরা, ভাঙা, কান্না-পিষ্ট, রুদ্ধ, কম্পিত কণ্ঠস্বর নবীনার। ভীষণ অবোধ, অবুঝ হয়ে গিয়েছে। কোন কথা সে শুনতে চায় না, কাঁদতে চায়। রিয়াজ আরো

হতভম্ব হয়ে বলে, হতে পারে। কেন হবে না। চুল তো চোখে দেখা যায় না।

—যায়। কেন আমি দেখতে পাইনি ?

নবীনা যেন হাহাকার করে ওঠে। রিয়াজ ভাবতে চেষ্টা করে, মা কি সেদিন এইধারা হাহাকার করে উঠেছিল। কেমন করে কেঁদেছিল মা ? নবীনা যেমন কাঁদছে ?

রিয়াজ বলে, সাদিকের পাতে চুল পড়ে না বলে আপনি দুঃখ করছিলেন। আজ তবে অমন করছেন কেন ? কী হয়েছে আপনার ? আমাকে কি বলা যায় না ?

—না। রিয়াজজী ! না। বলা যায় না যে। আপনি বুঝবেন না। কেউ বুঝবে না। সব কেমন হয়ে গেল।

বলতে বলতে নবীনা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিছানায় মাথা নিচু করে সিজদার মতন লুটিয়ে যায়। রিয়াজ নির্বাক। নবীনাকে শিশুর মতন কেঁদে যেতে দেখে। মনে হয়, মেয়েরা কোথাও না কোথাও ভীষণ রকম অপরিণত, কখন শিশু তা ত্যাগ করে না। বহু যত্নে নিজেদের অসহায় করে রাখে। তাই বলে অমন করে কাঁদতে হবে ? রিয়াজ কিছুতেই নবীনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এ-যেন অঙ্কের উত্তর জেনে ফেলে অঙ্ক কষতে গিয়ে অঙ্ক ভুল করা। মনে হয় সহজ। কিন্তু জীবন তখন অঙ্কের বাইরে চলে গিয়েছে। রিয়াজ চুলের মধ্যে ভুল কোথায় বুঝতে পারে না।

নবীনা কাঁদছে, অথচ কান্নার গূঢ় কারণ চেনা যায় না, কিন্তু তাকে বড় নিরাশ্রয় মনে হয়। তাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করে রিয়াজের। পারে না। ভাষা পায় না। কী বলবে, কেমন করে বলবে, বুঝে পায় না। ফলে সে টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। চেয়ারে বসে নিরুপায় রিয়াজ লাল ডটপেন নাড়াচাড়া করে। ডাইরির পাতা ওল্টায়। বন্ধ করে। শেষে টেবিলের ড্রয়ার টেনে শব্দ করে ফেলে। সেই শব্দে নবীনা মৃদু চমকে কান্না থামায়। সিজদা থেকে শরীর খাড়া করে তোলে। আঁচলে চোখ মোছে। আস্তে আস্তে কান্নার দেহী গমক স্তিমিত হয়ে থেমে আসে। এত ইমোশ্যনাল মেয়ে রিয়াজ আগে দেখেনি। নবীনাকে তার এই মুহূর্তে ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু সেকথা বলা যায় না। ড্রয়ার খুলে সে পেন আর ডাইরি রেখে দেয়। তারপর উঠে গিয়ে নবীনার দেওয়া নতুন জামাকাপড় পরতে শুরু করে। নবীনা আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে রিয়াজকে দেখে। ওর কান্না থেমে গিয়েছে। চোখ আর ঝাপসা নয়, রিয়াজ যে বেরুচ্ছে বুঝতে পারে। রিয়াজ আয়নায় নিজেকে দেখে। নিজে নিজেই বলে, বাঃ।

তখন নবীনার ঠোঁটে ঈষৎ হাসি রেখায়িত হয়। তারই দেওয়া পোশাক পরল রিয়াজ। খুশি হয়েছে। নবীনা জানতে চায়, কখন ফিরবেন?

—পথ অনেকখানি। ফিরতে কিছু দেরি হবে। আপনি কি বাক্স নিয়ে (লগ্নের স্যুটকেস) ও- বাড়ি চলে যাবেন? সন্ধ্যা হবে। মৌলবীকে সঙ্গে করে ফিরব, গোকুল মৌলবী খুব ঢিলে সাইকেল চালায়। তাছাড়া লোকটা ক্ষ্যাপা। যাই যাই করেই পাঁচ দণ্ড লেকচার শুনাবে। অন্যদের বলিনি। গোকুলই সাহসী। ভেবেচিন্তে একটা ক্ষ্যাপা পাগলকেই রাজী করাতে পেরেছি। সব শুনে ও কী বললে শুনবেন? বললে…

রিয়াজ কথা বন্ধ করে এক মিনিটের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে চুলে দাড়িতে চিরুনি চালিয়ে নেয়। পকেটে পেন গুঁজতে গিয়ে ডাইরিখানা সঙ্গে নেবে কিনা স্থির করতে পারে না। পরে, কী ভেবে না নিয়েই ড্রয়ার বন্ধ করে দেয়। বলে, সাঁওতালরা এই ধারা বিয়ে হামেশাই করে রিয়াজজী। সেইডা ওদের চল। কিন্তু মুসলমান করে না। নবী সেইডা হারাম করে গিয়েছেন। কিন্তু আপনার বেত্তান্ত অন্যধারা। সেইডা একটা ফ্যাচাং হয়ে গিয়েছে। কথা শুনে মনডা বড়ই ভিজে যায় গো! ছেলের বউকে নিকে বসায় যে মুরুব্বি, তার গায়ের গোস্তে পোকা হয় বুঝলেন! দু' হপ্তা আগে মাধালীপুরে এই ঘটনা হয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঘেন্নাডা খুব কম। পরে শুনেছি সেই ছেলের হাত ধরে নয়া বহু রাতারাতি বর্ডার পার। হবেই। বুড়া এখন হাদীস কুরান তুলে গাল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেইখেনে তামাশা লেগে গিয়েছে। কিন্তু আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, গণ্যমান্য বুলে ভয় করছেন। আপনার ইডা তামাশা নয়, একটা গুরুতর ঘটনা। সবই বুঝছি। আসবেন।

থামল রিয়াজ। তারপর বলল, সাইকেলটা ভাড়া করতে হবে। যেতে হবে। ফিরতে হবে। ততক্ষণ…

নবীনা বলল, আমি একাই থাকব। অপেক্ষা করব। আমার ভয় করবে, কিন্তু রাজিয়ার ভয় তো আমার নেই। বাহারপুর বৈদ্যবাটি আমার গায়ে হাত দেবে না। মবিনও আর আসবে না। আপনি বেলাবেলি চলে যান। সাবধানে যাবেন। আমার কিন্তু সত্যিই ভয় করবে রিয়াজজী। তাড়াতাড়ি ফিরবেন।

রিয়াজ হেসে ফেলে বলল, এই যে বললেন ভয় করবে না?

—না। সেটা অন্য ভয়। আজ ওদের বিয়ে তো। বিয়ে না হওয়া অব্দি কেমন ভয় ভয় করছে। কত কি যে ভাবনা হচ্ছে। কী হবে, না জানি কেমন হবে। হাজার হলেও আমি তো বোন। মিলুকে আশীর্বাদ করার কেউ নেই।

—ও।

গম্ভীর গলা রিয়াজের। ঘাড়ে কাপড়ের ব্যাগটা ঝুলিয়ে বলল, তাহলে চলি। রিয়াজ ঘর ছেড়ে পথে নেমে গেল। তখনই হঠাৎ নিজেকে শূন্য মনে হল নবীনার। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। রান্না ঘরে গিয়ে থালা বাসনগুলো ধুয়ে ফেলল। ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিল। তারপর কী করবে বুঝে পেল না। এ-ঘরে এসে সেলফ্-এ বই খুঁজল। পড়তে চেষ্টা করল। পারল না। বই সেল্ফ-এ তুলে রাখল। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে গেল। পারল না। উঠল। আবার পায়চারি করতে লাগল। বিছানায় বসল। উঠল। হঠাৎ টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে ফেলল। ডাইরিখানা হাতে নিল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখে পড়ল তালিকা। ১৪ নং নারীকে ঘিরে থাকা বৃত্ত। লাল গোল বৃত্ত। নিচে নোট। নবীনা পরস্ত্রী। তাকে বিয়ে করা হারাম। নবীনা বুঝতে পারল। পৃথিবী থেকে সে **সম্পূর্ণ** পর হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বাইরে চলে গিয়েছে। একটা অদ্ভুত বৃত্তের শেকলে, একটা বন্দীশালায় সে আটক। সেখানে কেউ নেই। তার বড় অভিমান হতে লাগল। মনে হল সেই বৃত্ত থেকে সে কিছুতেই বাইরে আসতে পারবে না। নবীনার অসম্ভব কল্পনাশক্তি বেড়ে গেল। মনে করল, সে একটি দ্বীপে বন্দী হয়েছে। চারপাশে সমুদ্র। গোল একটি দ্বীপে সে একা বাস করে। সেখানে পৃথিবীর ছায়া পড়ে না। কোন জাহাজ নোঙর করে না। একা থাকে সে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাবতে তার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়। আল্লা কোন ফেরেস্তাও তার জন্য পাঠায় না। কেউ আসে না। এবং নবীনা মনে করতে পারে না, এই দ্বীপে কেন সে বন্দী হল। তবে মানুষ তাকে ঘেন্না করে ফেলে গেছে। সেই মানুষের দলে বোধহয় রিয়াজও ছিলেন। নবীনার মনে হয়, তিনি ছিলেন হয়ত। ঠিক বোঝা যায় না ছিলেন কিনা! কেউ বলে দেয় না, তিনি ছিলেন কিনা। তারপর কী হবে? নবীনার কী হবে? কী করে সে পৃথিবীতে পৌঁছবে? নবীনা কিন্তু কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না, তার পৌঁছনোর উপায় কী? কোন পরস্ত্রী কেন এভাবে বন্দী হয়? সে কেন পৃথিবীর কাছে অচ্ছ্যুৎ হয়ে গেল! মবিন কেন তাকে দূষিত করে!

রিয়াজ কেন ভালবাসতে পারে না? বাপ কেন অমন করে তাদের অসহায় করে দেয়? কেন রাজিয়াকে ঠাট্টার মোহরানা দিয়ে পরিহাস করে? মিল্লাত কেন রাজিয়াকে ভালবাসল? রিয়াজ কেন ওদের সমর্থন করল! জীবনটা এরকম হল কেন? নবীনার সন্তানের কী হবে? কোথায় কী করবে? সেও কি নিসার মবিন রিয়াজ বা মিল্লাতের মতন পাপ করবে? এই পৃথিবীর অবসান কবে

হবে ? এই সমাজ কি এইরকমই থাকবে ? এমন নিসার মবিন মিল্লাত আর রিয়াজ জন্মাবে ! মরবে ! এমন নবীনা রাজিয়া কি এইভাবে পৃথিবীর কাছে পর হয়ে যাবে ? বন্দী হবে ? একা হবে ? রিয়াজ কেমন সমাজের কথা ভাবে ? কী তার কল্পনা ? কল্পনার ঘরে সে-ও তো বন্দী বলে মনে হয়। সেখানে একা থাকতে তার ভাল লাগে ?

নবীনা ভাবে, তাকে কেউ নিল না। সে কারো হল না। পৃথিবী তাকে কতদূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কী হবে ? নবীনা কী করবে ? তার দুঃখ কি অদৃশ্য চুলের মতন ? অসতর্ক শব্দহীন ?

এত প্রশ্নের পর নবীনার হৃদয় ক্লান্ত হয়। বুকে চিনচিনে ব্যথা হয়। কে যে খামচায়। কিসে যেন হৃৎপিণ্ড সাঁড়াশীর মতন চেপে ধরে। চোখ অন্ধকার হয়। মাথা ঘোরে। নবীনার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বার হয় না। দেহের ভিতরে কীসব হয়ে যাচ্ছে নবীনা বুঝতে পারে না।

॥ একুশ ॥

গোকুলের বাড়ি পৌঁছয় রিয়াজ। তখন সন্ধ্যার সূচনা। কেমন ঘোর হয়ে আসছে সব। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে। মানুষের সমাজ আরো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। ডাকল, গোকুলজী !

জবাব এল না। আকাশে মেঘ জমছে। আবার ডাকল। মৌলবী সাহেব। আমি এসেছি।

তখনও ছোট বাড়িটা নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ বাদে একটা বাচ্চামতন মেয়ে বেরিয়ে আসে। ঘরের দরজার আড়ালে ঘরনী এসে দাঁড়ায়। বাচ্চাটা জানায়, আব্বাজী নাই।

ঘরনী বলে, বিকালে আকবর মোল্‌বী টেনে লিয়ে গেল। কুতায় নাকি জলসা। জিয়াফত।

—কিন্তু আমি আসব তিনি জানতেন। কথা দিয়েছিলেন।

রিয়াজ ভেঙে পড়ে। ভয়ানক ক্রোধে তার গলা কেঁপে যায়। আর কোন কথাই তার মুখে উচ্চারণ হতে চায় না। ঘরনী বলে, আমাকে কিছু বুলে যায়নি।

—কখন ফিরবেন ?

—বুলেনি। তেনার মর্জি।

—ভীষণ অন্যায় করলেন। এর কোন ক্ষমা হয় না।

—কী কাজ ছিল আপনার ?

—বিয়ে।

—অন্য মোল্‌বী ডেকে পড়িয়ে ল্যান, দেহাজে কত মোল্‌বী।

—কিন্তু অন্যরা তো পাগল নয়।

—জী। উনার ছিট আছে। কথা ভুলে যায়।

—না। উনি ভোলেননি। আমাকে ধোকা দিয়েছেন। আগে বললেই তো পারতেন, পারবেন না।

—জী।

বাচ্চা মেয়েটা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। ঘরনী শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। আকাশে মেঘ আরো কালো হয়। হাওয়া ওঠে। রিয়াজ সাইকেল গড়াতে গড়াতে রাস্তায় নেমে আসে। হাওয়া বাড়ে। সন্ধ্যা ঘন হয়। বৃষ্টি পড়ে মোটা মোটা। সাইকেল চড়ে রিয়াজ দ্রুত ছুটতে থাকে। হাওয়া বাড়ে। মেঘ ঘন হয়। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়তে থাকে। অন্ধকার হয়ে আসে। পথ পিছল হতে থাকে। চাকা পিছলে যেতে চায়। বৃষ্টি ক্রমশ ছুঁচলো, তেজী, বলীয়ান হয়। হাওয়া ঝাপটা দেয়। বৃষ্টি চড়বড় করে ওঠে। ঝাঁপিয়ে আসে হাওয়া। চাকা পিছলে যায়। রিয়াজ আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কোমরে ভয়ানক আঘাত পায়। সাইকেলে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে যায় রিয়াজ। পারে না। সাইকেল গড়াতে চায় না। হাওয়া আটকে দিচ্ছে। চাকায় কাদা জড়াচ্ছে। উত্তেজনায় ক্রোধে অসহায়তায় রিয়াজ পাগল হয়ে যায়। মবিনের কণ্ঠস্বর সহসা যেন বাতাসের ভেতর থেকে হাহা করে হেসে ওঠে। নিসার হোসেন চিৎকারে উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। খালাস নাই। খালাস দিব না মুই। না রে নাঃ ! হা হা হা ! শুনতে পায় রিয়াজ। রিয়াজ একা বাতাস বৃষ্টি পিছল পথ অন্ধকার পার হতে চায়। মনে পড়ে একা নবীনা ভয় পাচ্ছে। কেউ নেই তার। তার কাছে পৌঁছনো এই মুহূর্তেই জরুরি। জরুরি অন্য কোন মৌলবী খুঁজে বার করা। একা একটি লোক ভয়ানক যুদ্ধ করতে থাকে। পথ পিছল। ঝড়। বৃষ্টি। অন্ধকার।- লোকটি বুঝতে পারে, তার কোথাও ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ ডাকে। ঝাপটায় ঝাপটায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তবু সে থামে না। রিয়াজ ঘেমে ওঠে। হাত ধরে যায়। পায়ে কোমরে ব্যথা। পা চলতে চায় না। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে গিয়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সহসা সে পাগলের মতন সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে থাকে। কাদার ন্যাড় চাকায় চেপে বসছে। চলছে না। রিয়াজ ভাবে, রাজিয়া

আর মিল্লাত তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কী করছে ওরা? কী কথা ভাবছে? ওদের মনের মধ্যে কেমন চাপ হচ্ছে। ওরা আশা করে আছে। বারবার সিঁড়ির দিকে চাইছে। একটু কোন শব্দ হলেই ভাবছে, এই বুঝি রিয়াজ এল। আসলে সেটা হাওয়া ছাড়া কিছু নয়। জীবনের এত বড় ব্যঙ্গ কি ঐ হাওয়ার ছলনায় মিশে নেই? মিল্লাত কি বুঝতে পারছে, এই মাঠ, এই অন্ধকার পথ, বৃষ্টি, হাওয়া রিয়াজকে কেমন করে ঘিরে ফেলেছে। তারা কি ভাবতেও পারছে, গোকুল মৌলবী পালিয়ে গিয়েছে? আকবর মৌলবী এসেছিল। এই খবর কী করে পৌঁছতে হবে ভেবে রিয়াজ আর চলতে পারে না। কিন্তু রিয়াজ তখনও এগিয়ে চলে। প্রকাণ্ড মাঠ। জনবসতিহীন বিশাল প্রান্তর। বৃষ্টির মধ্যে এক ফোঁটা পোকার মতন ক্ষুদ্র মানুষ। তবু মানুষ তো। থামে না।

হাওয়া থামে। বৃষ্টি থামে। শহরে পৌঁছয় রিয়াজ। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় নিচে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখে। আটটা বেজে গিয়েছে। সাইকেল জমা দেয়। সমস্ত জামাকাপড় জলে কাদায় লিপ্ত। চুল এলোমেলো। মিহি হাওয়া বইছে। শান্ত শহর। শহরের গাছ হাওয়ায় কেঁপে ওঠে মৃদু। বৃষ্টি ফোঁটা ঝরায়। রিয়াজের গায়ে সেই ফোঁটা ঝরে পড়ে। রিয়াজ দ্রুত হেঁটে চলে। বাড়িতে ঢুকে দেখে ঘরে নবীনা চৌকিতে শায়িত। বুকের তলায় বালিশ। খানিকটা উপুড় মতন। একটা হাত বালিশের উপর দিয়ে নিচের দিকে চৌকি ছাড়িয়ে বাইরে ঝুলছে। অন্য হাতটি কোলের কাছে জড়ো। নবীনার চোখ বন্ধ। শরীরের ঊর্ধ্বভাগ চৌকি ছাড়িয়ে বাইরে পড়ে যেতে চাইছে। সেই অবস্থায় স্থির হয়ে আছে নবীনা। উপুড়ও নয়, কাতও নয়। আবার উপুড়ও বটে কাতও বটে। এমন করে আছে কেন সে? পিঠের কাছে ডাইরি। জামা ছাড়তে গিয়ে থেমে যায় রিয়াজ। ঘরে বিদ্যুৎ আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। নবীনা অমন করে শুয়ে আছে কেন? কাছে এসে ডাক দেয়। উত্তর নেই। গায়ে হাত দিতেই নবীনাকে অত্যন্ত ভারি মনে হয়। একটু ধাক্কা দেয়। নড়ে না। আরো একটু জোরে ধাক্কা দেয়। সামান্য নড়ে। বেশ জোরে ধাক্কা দিতেই নবীনা চিত হয়ে যায়। রিয়াজ ভয়ে এক পা পেছনে সরে আসে। আবার এগোয়। চিত নবীনাকে গায়ে হাত দিয়ে ফের কাত করে। ক্রমশ সহসা মস্তিষ্কে খেলে ওঠে, নেই। চলে গিয়েছে।

রিয়াজ নবীনার উপর ঝুঁকে নামে। একখানা হাত ধরে নাড়ী দেখে। নেই। পালিয়েছে। বাঃ। চমৎকার। অতএব রিয়াজ উঠে দাঁড়ায়। ওর মস্তিষ্ক আশ্চর্য রকম জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বেশ। ভাল কথা। আবার ঝুঁকে পড়ে রিয়াজ। বলে, তুমি এমনি করে হেরে গেলে নবীনা? আমার কোন কথাই শুনতে চাইলে

না ? আমার শেষ জিত যে তুমি, বুঝতেও পারলে না ? হঠাৎ খেয়াল হল। নবীনা এখন কিছুই শুনছে না। বিস্ময়-স্তব্ধ নির্বাক রিয়াজ বন্ধু ডাক্তার শমীমকে ডাকবে কিনা ভাবে। ওর বাড়ির কাছে এসে কী মনে করে ডাকে না। মনে মনে বলে, আমি তোমায় কিন্তু নবীনা, গলা টিপে হত্যা করিনি। দ্যাখো, আমার হাতে কোন দাগ নেই। বলেই রিয়াজ একটি বৃষ্টি-ভেজা রিক্সায় উঠে বসে। মিল্লাতের বাড়িতে কোন শব্দ নেই। কেমন নিথর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে রিয়াজ। দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে আসে। নাকে ধূপবাতির গন্ধ পায়। বিয়ের গন্ধ পায়। খাট সুসজ্জিত। ফুল ছড়ানো। একেবারে ফুল-শয্যার রাত্রি। খাটের পাশাপাশি দুটি বালিশের একটিতে মাথা রেখে চিত হয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে মিল্লাত। রাত্রি নটার কাছে। ঘরে কেউ নেই। অন্য বালিশটির কাছে গয়নাগুলি সুরক্ষিত। দলিল। আর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ডখানি। রাজিয়া নেই। একখানা চিঠি লিখে রেখে রাজিয়া চলে গেছে।

প্রিয় রিয়াজজী,

সব রইল। কোন কিছুই নিইনি। আমি যাবার আগে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি চলে যাচ্ছি মিলু বুঝতে পারল না। মিলু ভারি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। ওকে জাগাবেন না। আমি আসার পর থেকে ও ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। এবার আপনার কথা বলি। মৌলবী পান নি। কতদূর গিয়েছিলেন ? সে কি পৃথিবীর বাইরে কোথাও ? মিলু বহুদূর থেকে মৌলবী আনতে বলেছিল। সেই দূর কতদূর রিয়াজজী ? সালাম রইল।

ইতি আপনাদের ফুলবউ।

অথচ মিল্লাতকে ডাকতে পারল না রিয়াজ। ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। ঘর ছেড়ে বাইরে এল। বাইরে চলে এল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে, তারপর রাস্তায়। হাঁটতে লাগল। ভাবল, কত কাজ। নবীনা একলা পড়ে আছে। ওর কবর দিতে হবে। আদিল বিশ্বাসকে চিঠি লিখতে হবে। হাত-চিঠি। লোক পাঠাতে হবে। নবীনার ছেলেটার কী হবে ? কত কাজ।

রাজিয়াকে কি খুঁজে দেখব নাকি ? কোথায় খুঁজব ? (বাহারপুরের সাদিক, বৈদ্যবাটির আনোয়ার, শহরের আকবর মৌলবী ইত্যাদিরা রাজিয়াকে বাঁচতে দেবে না)। রিয়াজ ভাবল, কত কাজ। তারপরই হঠাৎ তার মনে হল, সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কোথাও সে মস্ত ভুল করেছিল। বোঝেনি। পৃথিবীতে কিছু কল্পনা থাকে যা কল্পনার মধ্যেই সুন্দর। মানুষের সেই ব্যক্তিগত বিশ্ব কেউ দেখতে পায় না। তা একার। তা একান্ত। তা একটি পৃথিবী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তা

একটি দুর্গ। তারই বাসিন্দা রাজিয়া মিল্লাত ও নবীনা। সেটি একটি স্বপ্নের ইতিহাস। স্বপ্নেরই যুদ্ধ। ভাবছিল রিয়াজ। পৃথিবী থেকে উড়ে গিয়ে একটি হাদীস কোরাণ বোঝায় মবিনদের মেধা ও প্রতিভাপূর্ণ বোমারু জাহাজ নিঃশব্দে সেখানে বোমা নিক্ষেপ করে ফিরে এল। আর নবীও বুঝি এক অলীক স্বপ্ন! আর তারপর··· সেই কল্পনা, সেই দ্বীপ ও দুর্গ সমুদ্রের অন্ধকারে ডুবে গেল। সেটি আবার একদিন রিয়াজের মনে ভেসে উঠবে। কারণ রাজিয়াকে ফের খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সম্ভব নবীনাকেও। রিয়াজ বিশ্বাস করে, সুন্দর ও সত্য মৃত্যুহীন। তা ব্যক্তিগত বিশ্বে বেঁচে থাকেই। মরে না। মুসলমানের মাটি আর বিটির লড়াই পৃথিবীকে দূষিত করতে থাকে। কোরাণ আর হাদীসকে ক্লান্ত করতে থাকে। বিধ্বংসী বোমারু জাহাজ উড়তে থাকে। বৃষ্টি হয়। ঝড় হয়। অন্ধকার পথ পিছল হয়। বাজ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। স্বপ্নের মানুষ ভুল জেহাদ করেও আবার ভুল বিদ্রোহের দিকে ছুটে যায়। থামে না। যেমন থামে না রিয়াজ।

চলতে চলতে রিয়াজের অকস্মাৎ মনে হয়, মবিন তাকে বিয়ের নেমন্তন্ন করবে। বড় ধূমধাম হবে। পৃথিবীতে এইসব উৎসব চলতে থাকবে। নিসারের উৎসব, বিবাহ।

খালাস।

তালাক।

ইত্যাদি।

মবিনের রোমাঞ্চ।

ধর্ষণ।

নবীনার মৃত্যু।

রাজিয়ার নিরুদ্দেশ।

এ-সবই পৃথিবীতে ঘটবে। আর হয়ত খুব অলক্ষ্যেই সেই স্বপ্নের দ্বীপ ভেসে উঠতে থাকবে। থাকবেই।

রিয়াজ এগিয়ে চলল। ছুটতে লাগল। দৌড়তে শুরু করল। কবরে শোয়ানোর আগে নবীনার গালে আল্‌তো করে একটি সশ্রদ্ধ চুম্বন সে এঁকে দিতে চায়। বড়ই দেরি হয়ে যাচ্ছে।